শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ

জীমূতবাহন রায়

ডক্টর জীমূতবাহন রায় (১৯২৫) বি.এসসি., এম.এ (ইংরাজী/বাংলা), পি. এইচ. ডি., ডিপ্. লিব। ১৯৬৩-১৯৭৭ বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনস্থ কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগদ্বয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থালয়ী ছিলেন। ১৯৭৭-১৯৭৮ বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের তিনি উপ-গ্রন্থালয়ী ছিলেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ড. রায়ের প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত 'তিনকড়ি দত্ত স্মৃতি'-পদক লাভ করেন।

ড. রায়ের 'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' ও 'গ্রন্থালয়' বই দুটি গ্রন্থালয় বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সমাদৃত হয়েছে।

ড. জীমূতবাহন রায় ১৯৭৮ সালে অপরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন।

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

২৮.৫৮

শ্রী রা

364629

শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ

জীমূতবাহন রায়

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রাবণ ১৩৯১ : জুলাই ১৯৮৪

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

সুব্রত চক্রবর্তী
সম্পাদক । বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি । শান্তিনিকেতন
মুদ্রক । বৈদ্যনাথ পাল । শ্রীরাজলক্ষ্মী প্রেস । বোলপুর । বীরভূম

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ ৫
ভূমিকা ৭
সংকেতপঞ্জী ১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উৎস ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত ১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী ২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংগঠনে শ্রীনিবাসাচার্যের ভূমিকা ২১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আচার্যের প্রভাব ২২৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের শাখা ও প্রশাখা বর্ণন ২৩৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীনিবাসাচার্যের দান ৩০১
উপসংহার ৩৫৮
গ্রন্থপঞ্জী ৩৬১

মুখবন্ধ

ডক্টর জীমূতবাহন রায় আমার ছাত্র ও সহকর্মী। ১৯৭০ সালে তিনি আমাকে জানান যে, আমার তত্ত্বাবধানে কোনো একটি বিষয় নিয়ে তিনি পি. এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করতে ইচ্ছুক। আমি তাঁকে শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করার পরামর্শ দিই। তিনি সম্মত হন এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫—এই পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই বইটি লেখেন -যা থিসিস হিসাবে পেশ করে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এই গ্রন্থে তিনি তথ্যসংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। অধিকাংশ বিষয়েই তিনি শেষ কথা বলতে সমর্থ হয়েছেন, এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদেব গবেষণা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তবু, তিনি পরবর্তী গবেষকদের জন্য এই মূল্যবান গ্রন্থটি রেখে গেলেন—এই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক এবং বিশ্বভারতীর গবেষণা প্রকাশন বিভাগের অন্যান্য কর্মীরা এ বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

শান্তিনিকেতন। জুলাই ১৯৮৪ সুখময় মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবজাগরণ দেখা দেয়। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সমাজ ধর্ম ও সাহিত্যে যে নূতন জীবনের সূত্রপাত হয় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য হলেন অন্যতম। আচার্যের জীবিতাবস্থাতেই তাঁকে চৈতন্যদেবের অংশসম্ভূত বলে স্বীকার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও যে তিনি এই সম্মান থেকে বিচ্যুত হন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে রচিত তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে। চৈতন্যদেবের জীবনীকে অবলম্বন করে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত। শ্রীনিবাসাচার্য হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাঁকে অবলম্বন করে সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অক্ষুন্ন ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে জীবনী সাহিত্যের গোড়াপত্তন হলেও তৎকালীন জীবনীকারগণ এঁদের জীবনের ঘটনাবলীর তারিখ সম্বন্ধে কোনোও নির্দেশ রেখে যান নি। ফলে বিংশ শতাব্দীতে এঁদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্যদেবের জীবনীর উপকরণ থেকে তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্ণয় করা হলেও পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উপকরণ থেকে একাজ সম্ভব হয় নি। বরং বর্তমান যুগে তাঁর জীবনের কাল নির্ণয় করতে বিপরীত বিবরণের ফলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনই নয়, চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ইতিহাস এত অস্পষ্ট এবং কিংবদন্তীপূর্ণ যে সে-যুগের ইতিহাস উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য হোলো তৎকালীন হস্তলিখিত পুথিগুলি। গ্রন্থকার রচিত মূলপুথি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয়, সেজন্য মূলের প্রতিলিপির ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেটি হোলো একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথির পাঠভেদ। মূলরচনাকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ না করায় এবং লিপিকার-প্রমাদে একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথিতে অনেক পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এছাড়া আছে সংযোজন ও বিয়োজন। লিপিকাররা যে মূল রচনা

সংযোজন ও বিয়োজন করে থাকেন বিভিন্ন পুথির পাঠভেদের বিচার বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুথিতে প্রাপ্ত বিখ্যাত কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এর পরও অনেকে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশকবৃন্দ পরিশ্রম করে বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেও সম্পাদনার কাজে বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করা হয় নি। মূল রচনা কী ছিল সেটিকে আবিষ্কার করা এবং সেটিকে অবিকৃত রেখে পাঠান্তরগুলিকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা তাঁরা করেন নি। বরং অপ্রমাণিত এবং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকেও মূল রচনার মধ্যে ধরে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেমবিলাসের পাঠভেদের সমস্যা নিয়ে ড. বিমানবিহারী মজুমদার ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে জানা যায় কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহের কাছে প্রেমবিলাসের যে পুথি আছে সেটি ষোলো-বিলাসে সম্পূর্ণ। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রথমবার এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় অষ্টাদশ-বিলাস পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি আরও দুটি বিলাস যোগ করেন। তারও পরে যশোদালাল তালুকদার সাড়ে চব্বিশ-বিলাসযুক্ত এক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

প্রেমবিলাসের বিভিন্ন পুথির অপর বৈশিষ্ট্য হোলো বিলাস বা পরিচ্ছেদ বিভাগ। একটি পুথির একটি বিলাস যেখানে শেষ হয়েছে অন্য পুথির বিলাস সেখানে শেষ না হয়ে অন্যত্র শেষ হয়েছে। ফলে একই বিষয়বস্তু দুটি পুথিতে থাকা সত্ত্বেও দুটির বিলাসসংখ্যা দুরকম হয়েছে। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি ষোড়শ-বিলাসে যেখানে সম্পূর্ণ, তালুকদারের সংস্করণ অষ্টাদশ-বিলাসে সেই স্থানেই শেষ হয়েছে।

প্রেমবিলাসের এত পাঠভেদের একমাত্র কারণ বিভিন্ন পুথির লিপিকারদের ইচ্ছাকৃত-সংযোগ বিয়োগ। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে অবশ্য বিয়োগের চেয়ে সংযোগটাই বেশী। ফলে আনুমানিক ষোড়শ-বিলাসে সমাপ্ত গ্রন্থ পরবর্তীকালে সাড়ে চব্বিশ-বিলাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রেমবিলাসের এই পাঠভেদ থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রকাশক মূল রচনাকে আবিষ্কার করে তার উপর নির্ভর করতে চেষ্টা করেন নি এবং যেখানে যতটা বেশী পাওয়া গিয়েছে সেই অংশটুকুও

মূলের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন। তালুকদার সংস্করণের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে প্রকাশক আটটি পুথি থেকে এই বিলাসগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি যথাক্রমে সতেরো, কুড়ি, কুড়ি, কুড়ি, বাইশ, বাইশ, সাড়ে চব্বিশ ও সাড়ে চব্বিশ-বিলাসে সম্পূর্ণ। মনে হয় প্রকাশক গ্রন্থটি প্রকাশের সময় শেষোক্ত পুথি দুটির উপর বেশী নির্ভর করেছেন। পাদটীকায় পাঠান্তরের সামান্য উল্লেখ থাকলেও এই পুথিগুলিতেও বিলাস বিন্যাসের পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তিনি সেগুলো উল্লেখ করেন নি।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির বিভিন্ন সংস্করণ ও বিশ্বভারতীতে প্রাপ্ত পুথিগুলির পাঠভেদ আমরা যথাসম্ভব মিলিয়ে দেখেছি। নরোত্তমবিলাসের প্রকাশিত দুটি সংস্করণের মধ্যে আমরা প্রচুর পাঠভেদ লক্ষ্য করেছি। রাখালদাস কবিরত্ন সম্পাদিত নরোত্তমবিলাস দ্বাদশ-বিলাসে সম্পূর্ণ, কিন্তু রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ-বিলাসে সম্পূর্ণ। এছাড়া দ্বিতীয় গ্রন্থের রচনার অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি শ্লোক কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা আছে যেগুলি মূল রচনায় থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বিদ্যারত্ন প্রকাশিত গ্রন্থটিকে অধিক প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যুক্তিসংগত। কিন্তু প্রকাশকের ভূমিকায় দেখা গেল যে, যে পুথির ওপর প্রকাশক নির্ভর করেছিলেন তার লিপিকার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ত্রয়োদশ বিলাসে নরোত্তমবিলাসের রচয়িতার জীবনী সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করা আছে সেটি কখনোই গ্রন্থকার স্বয়ং করেন নি। এটি লিপিকারের সংযোজন বলে মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এছাড়া যে দুষ্প্রাপ্য শ্লোকগুলি গ্রন্থমধ্যে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে সেগুলোও বোধ হয় লিপিকারের কাজ। তিনি ভক্তিরত্নাকর থেকে শ্লোকগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থের মধ্যে এমন সুনিপুণভাবে বসিয়েছেন যে এগুলো গ্রন্থকারের মূল রচনার অংশ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মনে হয় কবিরত্ন প্রকাশিত গ্রন্থটি বোধ হয় মূলানুগ হবে। তবে প্রাচীন আরও কয়েকটি পুথির সঙ্গে না মিলিয়ে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসংগত নয়।

এপর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর সমস্যাদি বিচারে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন সমাজপ্রধানদের জীবনী কিংবা সমাজের ইতিহাস রচনার আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত এসব গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন আছে। এসব গ্রন্থের মূল রচনা কী ছিল সেটি আবিষ্কার করাও গবেষণার বিষয়। আপাতত প্রাচীনতম পুথিকে অবলম্বন করে অন্যান্য পুথি ও প্রকাশিত গ্রন্থের

পাঠান্তর উল্লেখ করাই প্রাথমিক কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে ড. বিমান বিহারী মজুমদার ও শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কথা বলা যেতে পারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সকল বিখ্যাত ও অখ্যাত গ্রন্থের এরকম সংস্করণের প্রয়োজন আছে।

এরপরের বড়ো কাজ হোলো এইসব গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ। ইতিহাসের অনেক সত্য এসব গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু কিংবদন্তি ও অসতর্ক বর্ণনার জন্য এগুলি নানা গ্রন্থে এমনভাবে গোপন হয়ে আছে যে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাকে আবিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গ্রন্থে কি বলা হয়েছে সেগুলি একত্রে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসংগত। এই প্রসঙ্গে স্বরূপ দামোদরের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে তিনি চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্পদিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। ড. সুশীলকুমার দে, রঘুনাথ দাস রচিত মুক্তাচরিতের একটি শ্লোকের বণনা থেকে অনুমান করেছিলেন যে স্বরূপের শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীর একটি মন্তব্য থেকে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানকালের ব্যবধান সম্বন্ধেও আলোচ্য নিবন্ধে নানা সূত্রের বিবরণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন পাওয়া যাবে।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে যে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটি হোলো তথ্যের অপ্রতুলতা। নরহরি সরকার ঠাকুর, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং এঁদের সমসাময়িক কয়েকজন খ্যাতনামা চৈতন্য-পরিকর সম্বন্ধেও যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে যথেষ্ট বলা চলে না। এঁদের সম্বন্ধে যদিও বা কিছু পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তীকালের জাহ্নবাদেবী ও বীরভদ্র সম্বন্ধে তাও নেই। এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একমাত্র ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। বৈষ্ণব ইতিহাসের বিখ্যাত কয়েকটি মহোৎসব—এমন-কি, খেতরীর মহোৎসবের বিবরণ এই একটি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ইতিহাস সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনায় কিংবদন্তীর প্রাধান্যও কিছু কম নেই। প্রাচীন পুথি সন্ধানের কাজ অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে যেগুলির সাহায্যে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদি কতটা নির্ভরযোগ্য তা বিচার করা যেতে পারবে।

অপ্রকাশিত পুথিতেও শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পুলিনবিহারী দাস বৃন্দাবন কথায় আচার্যের জীবনী প্রসঙ্গে যে পুথির উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য নিবন্ধে দেখা গেল তার বর্ণনার ওপর নির্ভর করা যায়। এই পুথিতে অচার্যের জন্ম ও তিরোধানের যে সময় বলা হয়েছে তা আমাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। জগবন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে পদকারদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের জন্ম, দীক্ষা ও তিরোধানকাল উল্লেখ করেছেন। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে আমাদের আনুমাণিককালের সঙ্গে ভদ্র মহাশয় বর্ণিত দীক্ষা গ্রহণের কালের সংগতি আছে। মনে হয় তিনি এমন কোনো পুথি থেকে এই কালগুলি পেয়েছিলেন যাকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর সূত্রের উল্লেখ না করায় এটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে রইল। এসব পুথিগুলির প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি কথা স্মরণ রাখ প্রয়োজন। কোনো পুথিতে কাল উল্লেখ থাকলেই যে সেটিকে গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বভারতীতে প্রাপ্ত একটি পুথিতে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জন্ম, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ ও তিরোধানের তারিখ পাওয়া যায়। বিচারে দেখা গিয়েছে এই তথ্যগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই প্রকাশের পূর্বে দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে পুথির বক্তব্য নির্ভরযোগ্য কি না।

আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে যে কথা বারবার মনে হয়েছে সেটি হোলো বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক আলোচনা এবং পদকারদের পরিচয় সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা। বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আচার্যের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পদকারদের পরিচয় এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নি। বিশেষত একই নামে নানাযুগে নানা পদকারের পদ আলোচনা ও গবেষণার কাজে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মনে হয় পদের ভাব, ভাষা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে এঁদের পৃথক অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। সেসঙ্গে প্রয়োজন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুথিসংগ্রহ ও সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করা। উভয় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যৌথভাবে একাজে অগ্রসর হলে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব

ইতিহাস, বিশেষত শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের ঘটনাবলীর কালনির্ণয়ের কাজে ব্রতী হই। তাঁর যত্নে এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সাহায্যের ফলে এই নিবন্ধ রচনা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ভূদেব চৌধুরী নিবন্ধটি যত্ন সহকারে আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন এবং তাঁর অমূল্য উপদেশদানে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আলোচ্য নিবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত ও বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুধীন চক্রবর্তী। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সংস্কৃত রচনাগুলির বাংলা অনুবাদ করার কাজে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ এবং অধ্যাপক শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এই সুযোগে আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঐতিহাসিক ড. অশোককুমার মজুমদার নানা ভাবে উপদেশ দান করে এবং পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ দেখে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দান করে আমার কাজের সহায়তা করেছেন। বিশেষত বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জীমূতবাহন রায়

শান্তিনিকেতন
১৯৭৫

সংকেত পঞ্জী

অ. ব.	অনুরাগবল্লী
আ. শা.	আর্য্য শাস্ত্র (পত্রিকা)
ক.	কর্ণানন্দ
গু. লে. সূ.	শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশ সূচক :
গো. দা. প.	গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ
গৌ প. ত.	গৌরপদ তরঙ্গিণী
গৌ বৈ. জী.	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন
চৈ চ.	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
চৈ চ. উ.	চৈতন্য চরিতের উপাদান
চৈ. চ. ভূ.	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এর ভূমিকা
বৈ. প.	চৈতন্য পরিকর
চৈ. ভা.	চৈতন্য ভাগবত
চৈ, ম.	চৈতন্যমঙ্গল
চৈ. যু গৌ. বৈ.	চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব
ন. বি.	নরোত্তম বিলাস
প. ক. ত.	পদকল্পতরু
পু. প.	পুঁথি পরিচয়
প্রা. বা. সা. কা.	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম
প্রে. বি.	প্রেম বিলাস
বা. সা. অব.	বাঙালীর সংস্কৃত অবদান
বা. সা. ই.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বৃ. ছ. গো.	বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী
বৈ. নি.	বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ
ভ. র.	ভক্তি রত্নাকর
ম. যু. বা. সা. ত. কা.	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
র. ক. ব.	রসকল্পবল্লী

শ্রীনি. গ্র.	শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা
শ্রীরা. ক্র.	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ
ষো. শ. প. সা.	ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য
সা. প. প: ১৩০৬ ৩য় সং	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৬
E. H. V. F.	Early History of Vaishnava Faith & Movement in Bengal
H. B L.	History of Vrajabuli Literature
H. C. I. P.	History and Culture of Indian People
O. H.	Our Heritage
V. L. M. B.	Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal

শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উৎস

‘ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে’ …ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই । ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির সার্থকতা লক্ষ্য করা যায় । বুদ্ধদেব, যীশুখৃস্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ মহাপুরুষরা প্রত্যেকেই এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, যখন ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে দেশ অতি সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে । কালের আবর্তে ধীরে ধীরে সমাজ-জীবনে যে দুঃখদুর্দশার ও নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে, তার হাত থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্যই বোধ হয় যুগে যুগে এঁদের আবির্ভাব হয় ।

অন্যান্য মহাপুরুষদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের একটি বিরাট পার্থক্য হলো এই যে তাঁরা নিজেরা যে উপদেশ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁদের শিষ্যবৃন্দ সেগুলি একত্রিত করেছিলেন এবং প্রয়োজনানুরূপ সেগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন মাত্র । কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনই ছিল তাঁর বাণী । একমাত্র শিক্ষাষ্টক ছাড়া ধর্মাচরণ সম্বন্ধে তাঁব উপদেশ অন্যত্র দুর্লভ । জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী এবং কিভাবে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উপদেশ দেন নি । ফলে তাঁর পরিকরবৃন্দ তাঁর উপলব্ধিকে নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাঁদেব শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ায় তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তী কালে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল । এ সময়ে বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীরা বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের যে ভাষ্যগুলি রচনা করেছিলেন পরবর্তী জীবনে সেগুলির সাহায্যেই তাঁদের মধ্যে আবার সংহতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল ।

চৈতন্যদেবের জীবনবাণীকে তাঁর পরিকরবৃন্দ নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করে প্রচারে অগ্রসর হওয়ায় তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে সংহতির অভাবের সৃষ্টি হয়েছিল । বৃন্দাবনে রচিত গ্রন্থগুলি এদেশে প্রচারিত হওয়ার পূর্বে নবীন বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁরা শাস্ত্র, দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক দর্শনের অভাব অনুভব করেছিলেন । এঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন অন্যতম । প্রথম জীবনে

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তিনি সংবাদ রাখতেন না, সেজন্য তিনি নীলাচলে গিয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার উদ্দেশ্যে। এরপর কি ভাবে তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে এলেন, তাঁদের সহায়তায় গোস্বামীদের গ্রন্থরাজির সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কিভাবেই বা এই গ্রন্থাদির ওপর ভিত্তি করে এদেশে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করলেন তা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উপকরণ তাঁর বন্দনা ও কয়েকটি জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্দনাগুলি তাঁর শিষ্যবৃন্দের রচিত। জীবনীগুলি পরবর্তীকালের রচনা।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক রচিত বন্দনাগুলির মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ এবং কর্ণপুর কবিরাজের রচনা তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বন্দনাগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

আলোচ্য বন্দনাগুলির মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজের শ্লোকাষ্টকে[১] তাঁর জীবনীর উপাদান কিছু পাওয়া যায় না। এই আটটি শ্লোকে তিনি আচার্যের* চেহারার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

নৃসিংহ কবিরাজ রচিত নবপদ্যের উল্লেখ কয়েকটি গ্রন্থে পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ রচনাটি এযাবৎ পাওয়া যায় নি। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই রচনার দুটি শ্লোক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্‌ধৃত করেছেন।[২] কর্ণানন্দে নবশ্লোক[৩] বলে যে শ্লোকগুলিতে শ্রীনিবাসাচার্যের বন্দনা পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে ভক্তিরত্নাকরে ধৃত এবং নৃসিংহ কবিরাজের রচনা বলে উল্লিখিত শ্লোক দুটিও পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলি হরিদাস দাস বাবাজী কলানিধি চট্টরাজ বিরচিত বলে উল্লেখ করেছেন[৪]। ফলে এই শ্লোকগুলির মধ্যে নৃসিংহ কবিরাজ বিরচিত পূর্বোক্ত দুটি শ্লোক ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি শ্লোক প্রকৃতপক্ষে কার রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা যায়। হরিদাস দাস বাবাজী কোনও একটি প্রাচীন পুথি থেকে রচনাটি উদ্ধার করেছেন বলে

---

* এই গ্রন্থের সর্বত্র আচার্য শব্দের দ্বারা শ্রীনিবাসাচার্যকেই বোঝানো হয়েছে।

[১] শ্রীনি. গ্র. পৃ. ২৩-২৫ [২] ভ. র. ৩।৭৮ ও ৪।২৩০ [৩] ক. – পৃ. ১০৬-৭

[৪] শ্রীনি. গ্র. - পৃ. ২০-২১

পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে কর্ণানন্দের পাঠভেদেরও উল্লেখ আছে। মনে হয় এই পুথিতে রচনাটি কলানিধি চট্টরাজ কর্তৃক রচিত বলে উল্লেখ করা ছিল বলে দাস বাবাজী এটি তাঁর রচনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

নৃসিংহ কবিরাজ রচিত নবপদ্যের সন্ধান এ যাবৎ না পাওয়া যাওয়ায় এই বচনা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। ভক্তিরত্নাকরে উদ্‌ধৃত শ্লোক দুটি এই রচনার মধ্যে ক্রমানুযায়ী এমনভাবে ধৃত আছে যাতে এই নয়টি শ্লোক নৃসিংহ কবিরাজের রচনা বলে মনে হয়। আবার এমনও হতে পারে শ্রীনিবাসাচার্যের অন্যতম শিষ্য কলানিধি চট্টরাজ প্রকৃত পক্ষে সাতটি শ্লোক রচনা করেছেন এবং তিনি নৃসিংহ কবিরাজের শ্লোক দুটিকে তাঁর রচিত সাতটি শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু এক কবি সমসাময়িক ও পরিচিত অপর কবির রচনার অংশ নিজের রচনায় ব্যবহার করবেন—একথা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রচনাটি নৃসিংহ কবিরাজের বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসংগত। তবে রচনাটি নৃসিংহ কবিরাজেরই হোক কিংবা কলানিধিরই হোক, আচার্যের জীবনীর উপকরণ হিসেবে এই রচনার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়, কারণ এঁরা দুজনেই আচার্যের শিষ্য ছিলেন।

কর্ণপুর কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক[৫] মোট একানব্বইটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। আচার্য-বন্দনার এই শ্লোকগুলি তাঁর জীবনীর বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। পরবর্তীকালে রচিত আচার্যের জীবনীগ্রন্থগুলিতে এই রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কর্ণপুর কবিরাজ বিখ্যাত অষ্ট কবিরাজের অন্যতম এবং আচার্যের শিষ্যদের একজন। কাজেই তাঁর রচনার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। হরিদাস দাস বাবাজী এই মূল্যবান গ্রন্থখানিকে প্রথম আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন এবং ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মুখ্যতঃ শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী অবলম্বনে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নরহরি চক্রবর্তী রচিত শ্রীনিবাসচরিত্র নামক গ্রন্থটির নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থটির কোনো পুথি

---

[৫] শ্রীনি. গ্র. - পৃ. ২৫-৪০

এযাবৎ পাওয়া যায় নি। নরোত্তমবিলাস মুখ্যতঃ নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে রচিত হলেও আচার্যের জীবনীর কিছু উপকরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থগুলি ছাড়া ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি 'শ্রীনিবাসের জন্মকথা' বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুথির কথা উল্লেখ করেছেন৬। এই পুথিটি আসলে প্রেমবিলাসের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার অনুলিপি মাত্র। এই প্রথম বিলাসও সম্পূর্ণ নকল করা হয় নি বলে সূচীকার মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ কোথাও পান নি। সজন্য তিনি এই পুথিটির নূতন নামকরণ করে থাকবেন।

অনুরাগবল্লী ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের সামান্য আগে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থকার মনোহর দাস আচার্যের প্রশিষ্যের শিষ্য। গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছে ১৬৯৭ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ আচার্যের দেহত্যাগের প্রায় আশী বৎসর পর। মনোহরদাস এই গ্রন্থের কতকাংশ কর্ণপুর কবিরাজের গুণলেশসূচক থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। অবশিষ্টাংশ তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। তাঁর গুরু রামশরণ চট্টরাজ একাধারে আচার্যের শিষ্যপুত্র এবং আচার্যেব শ্যালক রামচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য। কাজেই রামশবণের নিকট হতে তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকলে সেগুলি একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তবে এই গ্রন্থে বর্ণিত কতকগুলি ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় মঞ্জরীতে বর্ণিত আচার্যের অপরাধ ভঞ্জনেব কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে হয় ইতিমধ্যে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আচার্যের জীবনী রচিত না হওয়ায় নানা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। আলোচ্য ঘটনাটি এরূপ একটি কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে রচিত।

উল্লিখিত ঘটনা ছাড়া আচার্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে সব তথ্য পবিবেশিত হয়েছে সেগুলোর যাথার্থ্যও মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ আচার্যের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণের কথা বলা যেতে পারে। অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে যে আচার্যের প্রথম পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর বংশরক্ষার্থে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র

---

৬. চৈ. প - পৃ. ৭৩৭

গতিগোবিন্দের জন্ম হয়। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তী রচিত নরোত্তমবিলাসে দেখা যায় খেতরী গমনের পথে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র একবার যাজিগ্রামে উপস্থিত হলে তিনি আচার্যের তিন পুত্রকে আশীর্বাদ করেন। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যায় নরহরি ইতিহাস-সচেতন ছিলেন এবং বহু যত্নে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। নরহরি অনুরাগবল্লীর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে মনোহর দাসের এই বক্তব্যের কথা জানবার পরেও তিনি যখন তাঁর গ্রন্থে একটি বিরুদ্ধ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তখন উভয়ের বক্তব্য ভালোভাবে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন।

শ্রীনিবাসাচার্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পাওয়া যায় নরহরি চক্রবর্তী রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে। নরহরির অপর নাম ছিল ঘনশ্যাম। তাঁর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য।[৭] নরহরি ভক্তিরত্নাকরে গ্রন্থ রচনার কাল উল্লেখ করেন নি।

নরহরির জীবনকাল সম্বন্ধেও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৭০৪ খৃস্টাব্দে ভাগবতের টীকা রচনা শেষ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৮] নরহরির পিতা জগন্নাথ তাঁর শিষ্য ছিলেন। কাজেই নরহরি বিশ্বনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক। ভক্তিরত্নাকরে দু জায়গায় অনুরাগবল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] এসব থেকে অনুমান করা যায় ভক্তিরত্নাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নি। নরহরির জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার রেঞাপুর বা রেঙাগ্রাম বলে হরিদাস দাস বাবাজী জানিয়েছেন।[১০] কোনো প্রামাণিক সূত্র থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন —তা অবশ্য তিনি লেখেন নি।

ভক্তিরত্নাকরের বৈশিষ্ট্য হলো এর বিষয়-ব্যাপকতায়। শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ইতিহাসের বহু তথ্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ইতিহাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির তথ্যাদির সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের তথ্যাদি একত্র করলে ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে।

---

[৭] ভ. র. উপসংহার। ৪৮ [৮] ম. যু. বা. সা. ত. কা. পৃ. ১১২

[৯] ভ. র. ৪।৩৩০-৩৬ ও ১৩।২৮২ [১০] গৌ. বৈ. জী. পৃ. ৯৯

ভক্তিরত্নাকরের অপর বৈশিষ্ট্য হলো প্রামাণিকতা। গ্রন্থকার নানা ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্‌ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ফলে এই গ্রন্থে শুধু তৎকালীন ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যই নয়—সেইসঙ্গে এমন অনেক প্রামাণিক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি আজ লুপ্ত। উদাহরণ স্বরূপ গোবিন্দদাসের সঙ্গীতমাধবের কথা বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে সঙ্গীতমাধবের অনেক শ্লোক উদ্‌ধৃত করায় অন্ততঃ সেগুলি আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

ভক্তিরত্নাকরের ইতিহাস-সচেতনতার বড়ো প্রমাণ হলো এই গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য ও অন্যান্য বৈষ্ণব নেতার কাছে লেখা শ্রীজীব গোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামীর পাঁচটি পত্রের পূর্ণ উদ্‌ধৃতি। তৎকালীন ইতিহাসের কোনো প্রামাণ্য দলিল আজকাল সুলভ নয়। ফলে খানিকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই পত্রগুলি বেশ কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

পদাবলী-সাহিত্যেও যে গ্রন্থকারের কতখানি দখল ছিল তার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে পঁচিশজন পদকারের প্রায় আশীটি পদ উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। এগুলি প্রায় সবই চৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত তাঁর সমসাময়িক পদকারদের রচনা। এসব পদ থেকে তাঁর জীবনের অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ইতিহাস-সচেতনতার এটিও একটি বড়ো প্রমাণ।

ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তীর ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয় থাকলেও তাঁর পরিবেশিত শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর সকল তথ্যকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা যেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আচার্যের নীলাচল গমন ও গৌড় ভ্রমণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিবরণের কথা বলা যেতে পারে। এই বিবরণ দুটিতে এই গ্রন্থে যে অস্পষ্টতা আছে তার মূলে হয়তো অনুরাগবল্লীর পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান। কিন্তু নরহরি এসম্বন্ধে যত্ন সহকারে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা না করায় অনেক জটিলতা রয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুপুরে কোন্ সময়ে গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় বলা হয়েছে নীলাচল যাওয়ার

পথে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল।[১১] এ ঘটনা নরহরি-বর্ণিত বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পথে হয় নি। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে পরবর্তী কোনও কালে গৌড় থেকে নীলাচলে যাওয়ার পথে হয়েছিল।[১২] আচার্যের জীবনী বিচার করার সময় দেখা গিয়েছে ড. মজুমদারের সিদ্ধান্ত ঠিক। এক্ষেত্রেও নরহরি চক্রবর্তী সাবধানতার সঙ্গে তাঁর জীবনী বিচার না করার ফলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এসব কারণে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত ঘটনাবলীকে সযত্নে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উৎস হিসাবে নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে তাঁর অপর গ্রন্থ নরোত্তমবিলাসের নাম করা যেতে পারে। এই গ্রন্থটি শ্রীনিবাসাচার্যের অন্যতম সুহৃৎ নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে রচিত। বাংলা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে এঁরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছেন। কাজেই একজনের জীবনের ঘটনার সঙ্গে অপরজনও নানা ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সে কারণে এই গ্রন্থে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী আলোচনা কালে আচার্যের জীবনের কিছু প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি হলেও এই গ্রন্থে বিবৃত ঘটনাবলী আচার্যের জীবনীর উৎস হিসেবে উপেক্ষণীয় নয়, কারণ ভক্তিরত্নাকরে যে সব ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেকগুলো এখানে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। সেজন্য এই গ্রন্থকে ভক্তিরত্নাকরের পরিপূরক বলা চলে। এছাড়া এই গ্রন্থে আচার্য সম্বন্ধে এমন অনেক নূতন তথ্য আছে যা ভক্তিরত্নাকরে নেই। সেজন্য আচার্যের জীবনী আলোচনা কালে এই গ্রন্থের সাহায্যের প্রয়োজন।

অন্যান্য যে সব গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উপাদান পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে প্রেমবিলাস অন্যতম। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাস তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী তাঁর দীক্ষাগুরু এবং নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র তাঁর শিক্ষাগুরু।[১৩] দীক্ষার পূর্বে তাঁর নাম ছিল বলরাম দাস। গ্রন্থসমাপ্তি সম্বন্ধে নাতিপ্রামাণিক চতুর্বিংশতি বিলাসে বলা হয়েছে যে ১৫২২ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খৃস্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছে। এই উক্তি সত্য হলে স্বীকার করতে হবে গ্রন্থখানি আচার্যের

---

[১১] [illegible]. লে. সূ. শ্লোক. ৮৭ [১২] যো. শ. প. সা.-পৃ. ১১৪ [১৩] প্রে. বি. ২০ বি

সমসাময়িক রচনা। কিন্তু অনেক ভ্রান্ত বিবরণের জন্য, বিশেষতঃ শেষ ছয়টি বিলাসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে এই গ্রন্থের বিবরণ বিশ্লেষণ করে তার অসংগতি আমরা দেখাব। তৎসত্ত্বেও আমরা এই গ্রন্থপ্রদত্ত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিশ্লেষণ এখানে করে দেখাচ্ছি যে এই গ্রন্থটি আদৌ নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে গণ্য হতে পারে না।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের প্রথম দিককার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময়ে তাঁর নীলাচল গমন। সমসাময়িক নৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপুর কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তী পর্যন্ত সকলেই এই ঘটনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে দেখা যাবে যে তিনি পরবর্তী কালে আবার নীলাচল গিয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে। প্রেমবিলাসে প্রথম ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তিনি সেবারই প্রথম নীলাচল গেলেন। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যে তথ্য সঠিকভাবে পরিবেশিত হলো সেটি আচার্যের সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থে সঠিকভাবে উল্লেখ করা হলো না— এটা বিস্ময়ের কথা।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবৎকালে কাটোয়ায়, শ্রীখণ্ডে ও খেতরীতে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এই মহোৎসবগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ এই উৎসবগুলির মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছিল। এই মহোৎসবগুলিতে শ্রীনিবাসাচার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণ সর্বাংশে সত্য হোক বা না হোক ঐসব উৎসব যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্যের সমসাময়িককালে রচিত প্রেমবিলাসে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না থাকা বিস্ময়কর। গ্রন্থকার নিজেকে আচার্যের সমসাময়িক ও জাহ্নবী দেবীর শিষ্য বলে দাবী করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর এই মহোৎসবগুলিতে যোগদান করার কথা। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রথম দুটি মহোৎসবের উল্লেখ নেই এবং খেতরীর মহোৎসবের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাকে কোনো ক্রমেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে স্বীকার করা যায় না।

অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকর—এই গ্রন্থ দুটিতে লেখা আছে যে খেতরীর উৎসবের পর জাহ্নবী দেবী প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু প্রেমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে আচার্যের বাল্যকালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশকে জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।[১৪] নানা কারণে এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত সে সময়ে নিত্যানন্দ বর্তমান ছিলেন। তখন এই গোষ্ঠীতে জাহ্নবী দেবীর প্রাধান্যের প্রশ্ন ওঠে না। নিত্যানন্দ বর্তমানে তিনি শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন একথাও স্বীকার করা কঠিন। কাজেই নিত্যানন্দ বর্তমানে জাহ্নবী দেবী তাঁর নিজস্ব শিষ্য নিয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না।

এছাড়া আরও কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি প্রেমবিলাসে আছে যা সমসাময়িক কোনো গ্রন্থে থাকা সম্ভব নয়। এগুলির মধ্যে নরহরি সরকার ও বীরভদ্রের সম্পর্কের কথা অন্যতম। নরহরি সরকার বয়সে ও মর্যাদায় বীরভদ্রের চেয়ে অনেক বড়ো। সেই হিসেবে সরকার ঠাকুর বীরভদ্রের মান্য। কিন্তু প্রেমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে বীরভদ্র সরকার ঠাকুরকে নানা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনিও বীরভদ্রের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকছেন।[১৫] এ ব্যাপার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এবং এর উল্লেখ থাকায় প্রেমবিলাসের প্রামাণিকতার দাবী বিশেষভাবে ব্যহত হচ্ছে।

প্রেমবিলাসের যে ইতিহাসবিরোধী বর্ণনা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হলো গ্রন্থ অপহরণের সংবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মহত্যা। এটি যে অবাস্তব কাহিনী সে কথা ড. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করেছেন।[১৬] প্রেমবিলাস ১৬০১ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শক ১৫৮১ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে প্রেমবিলাসে দাবী করা হয়েছে।[১৭] প্রেমবিলাসের এই দাবীও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকালবাচক শ্লোকে যে মাস, বার ও তিথির উল্লেখ আছে তার যোগাযোগ ১৫০৩ শক ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ঘটে নি। ঘটেছে ১৬১১ এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে।[১৮] এছাড়া চরিতামৃতে উল্লিখিত শ্রীজীব

---

[১৪] প্রে. বি. ১৬শ বি.। [১৫] প্রে. বি. ৪র্থ বি.। [১৬] চৈ. চ. উ. পৃ. ৩১২।

[১৭] প্রে. বি ২৪শ বি.। [১৮] ম যু বা. সা. ত. কা. পৃ ১৯৬।

গোস্বামীর গোপালচম্পূর রচনাকাল ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ। প্রেমবিলাসে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ থেকেও প্রমাণ হয় যে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬০১ হওয়া সম্ভব নয়।

রূপ ও সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যা লেখা হয়েছে তা যে সর্বৈব ভুল সে কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনায় দেখিয়েছি। কোনও সমসাময়িক লোকের পক্ষে এরকম ভুল করা সম্ভব নয়।

প্রেমবিলাসকে আচার্যের সমসাময়িক গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে না পারার অপর কারণ হলো ভক্তিরত্নাকরে এই গ্রন্থের অনুল্লেখ। নরহরি চক্রবর্তী তাঁর তৎকালীন প্রায় সকল প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য আহরণ করেছেন এবং সেগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আচার্য-জীবনী অবলম্বনে তাঁর গ্রন্থের অল্প কিছুকাল আগে রচিত অনুরাগবল্লীরও তিনি উল্লেখ করেছেন। আচার্যের সমসাময়িক কালে প্রেমবিলাস রচিত হয়ে থাকলে তার ওপরেও তাঁর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ভক্তিরত্নাকরে এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয় হয় ভক্তিরত্নাকর রচনার সময় এই গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না, না হয় সে সময়েই এই গ্রন্থ এত প্রক্ষিপ্ত উপাদানে ভরে গিয়েছিল যে তিনি গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি।

সবশেষে গ্রন্থকারের পরিচয় সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। তিনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন সেগুলো ইতিহাসসম্মত বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তিনি প্রথমবার জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন দর্শন করে যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন নরহরি সরকারের কাছে ‘বালক’ শ্রীনিবাসকে দেখেছিলেন।[১৯] শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল ১৫১৯।২০ খৃস্টাব্দের পূর্বে নয় এবং জাহ্নবী দেবীও খেতরীর উৎসবের পূর্বে বৃন্দাবন যান নি বলে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। সে সময়ে গ্রন্থকার জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়ে থাকলে ফিরে এসে শ্রীনিবাসাচার্যকে ‘বালক’ অবস্থায় দেখার কথা নয়।

---

[১৯] প্রে. বি. ১৬শ বি.।

আগেই আমরা বলেছি যে—গ্রন্থকার কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের উৎসবগুলির বিবরণ দেন নি। খেতরীর উৎসবের যে সামান্য বিবরণ দিয়েছেন তাকেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কিংবা সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির রচনা স্বীকার করা যায় না।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে দেখতে পাব যে প্রেমবিলাসের বিবরণের সঙ্গে সুপরিচিত ঐতিহাসিক তথ্যের অনেক স্থানে বিরোধ লক্ষিত হয়। এই কারণে প্রেমবিলাসকে প্রামাণিক সূত্র বলে গ্রহণ করা কঠিন।

যদুনন্দন দাস বিরচিত কর্ণানন্দে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর যতটুকু পাওয়া যায় তা' পূর্বোক্ত সকল গ্রন্থে আছে। তবে কর্ণানন্দের বিশেষ মূল্য হলো আচার্যের শাখাবর্ণনে। আচার্যের শিষ্য প্রশিষ্যের এত বিস্তৃত বর্ণনা অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

কর্ণানন্দে রচয়িতা নিজেকে আচার্যকন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্যাসে আচার্যের উপশাখা বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি হেমলতার শিষ্যতালিকার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে দেখা যায় বৈদ্যকুলোদ্ভব যদুনন্দন মালিহাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং হেমলতা দেবী নিকটবর্তী গ্রাম বুধইপাড়ায় বাস করতেন। কর্ণানন্দ হেমলতা দেবীর উৎসাহে রচিত, এমনকি গ্রন্থের নামকরণও তিনি করেছিলেন বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০]

কর্ণানন্দের গ্রন্থসমাপ্তির যে কাল দেওয়া হয়েছে তা' থেকে দেখা যায় যে ১৬০৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়েছে। নানা কারণে এসম্বন্ধে সন্দেহ হয়। প্রথমত গ্রন্থটি এত প্রাচীন হলে অনুরাগবল্লী, বিশেষত ভক্তিরত্নাকরে এসম্বন্ধে উল্লেখ থাকত। কিন্তু এই দুটির একটিতেও কর্ণানন্দের উল্লেখ নেই।

কর্ণানন্দে প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের সপ্তম নির্যাসে প্রেমবিলাসের গ্রন্থ-অপহরণের কাহিনীতে রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে যে সংশয়

---

[২০] ক. পৃ. ১১৯।

উপস্থিত হয়েছিল তার মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ নির্যাসেও প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাসের যে সব বিবরণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের কয়েকটি কর্ণানন্দে গৃহীত হয়েছে। এই অবস্থায় কর্ণানন্দকেও অপ্রামাণিক বলে মনে হয়।

কর্ণানন্দের চতুর্থ নির্যাসে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ আছে, এমনকি, এই গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতিও আছে। চরিতামৃত ১৬১২ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নি। তারপর তার প্রতিলিপি এদেশে প্রচারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে মূলতঃ এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই নির্যাসটি রচিত হয়েছে। সেই হিসাবেও কর্ণানন্দ রচনার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী অবলম্বনে প্রেমামৃত নামে অপর একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রচয়িতা গুরুচরণ দাস আচার্যের দ্বিতীয় পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য বলে নিজেকে দাবী করেছেন। এই গ্রন্থের দুই স্থানে তিনি লিখেছেন যে নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসের "সূত্র মত লয়ে" তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২১] কাজেই এটি যে প্রেমবিলাসের পরবর্তী সময়ের রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

প্রেমামৃত মুদ্রিত হয় নি। মুর্শিদাবাদের শশিভূষণ ঠাকুরের নিকট প্রাপ্ত একটি পুথির ওপর নির্ভর করে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এসম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র।[২২] কাজেই এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা কতখানি তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর উপাদান যে সব গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখা গেল যে কর্ণপূর কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকর ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের বিশেষ কোন মূল্য নেই। হরিদাস দাস বাবাজী সংকলিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালার কলানিধি চট্টরাজ রচিত আদেশাষ্টকম্‌-এ স্বপ্নাদেশগুলি বাদ দিলে জীবনীর উপকরণ সামান্য থাকে। এর উল্লেখযোগ্য

---

[২১] চৈ. চ উ পৃ. ৪৮০-১। [২২] সা. প প. ১৩০৬, ৩য় সংখ্যা,. পৃ. ২৬৩।

অংশটুকু ভক্তিরত্নাকরে নৃসিংহ কবিরাজের নবপদ্যের শ্লোক বলে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রেমবিলাসের বিবরণগুলি যুক্তিসম্মত এবং ইতিহাসসম্মত নয় বলে তার ওপর নির্ভর করা কঠিন। কর্ণানন্দ পরবর্তীকালের রচনা বলে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। এর নির্ভরযোগ্য অংশগুলো অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই আচার্যের জীবনীর তথ্যের জন্য প্রথমোক্ত চারটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর আচার্যের জীবনের বহু পরে রচিত বলে এইসব গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদিকে যত্নপূর্বক বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব কারণে আচার্যের জীবনী রচনায় আমাদের মূলতঃ এই গ্রন্থগুলিতে পরিবেশিত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। প্রেমবিলাসকে ঐতিহাসিকরা এযাবৎ একটি প্রাচীন গ্রন্থ বলে স্বীকার করে আসছেন। সেজন্য আলোচ্য গ্রন্থগুলি কর্তৃক পরিবেশিত ঘটনাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর এসব ঘটনা সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যে বিবরণ দেওয়া আছে তারও বিচার আমরা করেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতামত

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর আকর গ্রন্থগুলির আলোচনাকালে দেখা গেল ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে তাঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে আধুনিককালে বিংশ শতাব্দীর আগে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। এসময়ে ইসলাম ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্য খৃস্টান সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। এই নূতন সংস্কৃতির চাকচিক্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজ আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁরা সেদিকে বেশী ঝুঁকে পড়েন। ফলে দেশীয় সংস্কৃতিচর্চা অনেকখানি ব্যাহত হয়। তার ফলে এযুগের গবেষকদের শ্রীনিবাসাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করার আগ্রহ জাগ্রত হয় নি। অবশ্য শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিকদের একাংশ দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পদাবলী সাহিত্যের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে আবার দেশীয় সংস্কৃতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণব মহান্তদের সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়। তাঁর এই সংকলন গ্রন্থ গৌরপদতরঙ্গিণী ১৯০২ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য সহ বিভিন্ন পদকার এবং চৈতন্য-পরিকরদের জীবনী সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।[১]

গৌরপদতরঙ্গিণীতে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে ভদ্র মহাশয় কাল নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেন নি। ঘটনার বিবরণের জন্য তিনি যে বিশেষভাবে প্রেমবিলাসের ওপর নির্ভর করেছেন তা এই গ্রন্থের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে নির্ণয় করা যায়। তবে প্রেমবিলাসই তাঁর জীবনী

---

১. গৌ. প. ত. – পৃ. ৭০।

আলোচনার একমাত্র উৎস ছিল না। আচার্যের জন্মসময় এবং তাঁর বৃন্দাবন গমনের তারিখ উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় তিনি ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি ঘটনার বিবরণও তিনি ভক্তিরত্নাকর থেকে সংগ্রহ করেছেন।

রায় বাহাদুর ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই বক্তৃতামালা "The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal" নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসের কালক্রম নির্ণয়ের চেষ্টা বোধহয় এই প্রথম। সেদিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। এছাড়া পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিকের উপর সেন মহাশয়ের আলোচনার প্রভাব দেখা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেকখানি।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত কর্ণপূর কবিরাজের শ্লোকটিকে তিনি জাল বলে অগ্রাহ্য করেছেন।[২] কর্ণপূর কবিরাজকে কবিকর্ণপূর বলে অভিহিত করায় মনে হয় সেকালে আচার্যশিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় ডঃ সেন আচার্যশিষ্যকে চৈতন্য-পরিকর কবিকর্ণপূরের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে ডঃ সেনের দ্বিতীয় ভ্রমাত্মক পদক্ষেপ হলো প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে ভক্তিরত্নাকরের চেয়ে প্রেমবিলাসের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। প্রেমবিলাসের রচনাকাল থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যেহেতু গ্রন্থকার আচার্যের সমসাময়িক ছিলেন সেজন্য এই গ্রন্থের বক্তব্য অধিক গ্রহণযোগ্য। প্রেমবিলাসের প্রথম বিলাস আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩] প্রেমবিলাসে অবশ্য এরকম প্রত্যক্ষ উক্তি কোথাও নেই।

---

২. V. L. M. B. - পৃ. ৮৫। ৩ ঐ. - পৃ. ৮৬।

শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে ড. সেনের তৃতীয় ভ্রমাত্মক পদক্ষেপ হলো আচার্যের বৃন্দাবন গমনের সময় নির্ণয় । ড. সেনের মতে আচার্য বৃন্দাবন গিয়েছিলেন ১৫৯০ খৃস্টাব্দে । সুতরাং, তাঁর মতে, শ্রীনিবাস (এখানে আসার অব্যবহিত পূর্বে) ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে নীলাচল গমন করতে পারেন না ।[৪]

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ড. সেনের এই সিদ্ধান্তে আসার মূল কারণ হলো গোবিন্দজীর মন্দিরের নির্মাণকালের ওপর নির্ভর করা । এই মন্দিরে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বলে ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে । সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে তার কিছুকাল আগে সনাতন দেহত্যাগ করেছেন । মন্দিরের গায়ে এব নির্মাণকাল সম্বন্ধে যে লিপি খোদিত আছে তাতে দেখা যায় যে মন্দিবটি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে । কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ড সেন তাব কিছুকালের মধ্যে সনাতনের দেহত্যাগ এবং তার অল্পকালের মধ্যে আচার্যের বৃন্দাবনে উপস্থিতির হিসাব করে এই কাল নির্ণয় করেছেন ।

রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মহাবাজ মানসিংহ গোবিন্দজীর এই মন্দির ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করে দেন—এই কথা ডঃ সেন আহরণ করেছেন গ্রাউস-এর History of Mathura থেকে ।[৫] ড. নরেশচন্দ্র জানা নানা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে কোন লিপিতে একথা উল্লিখিত নেই যে রূপ ও সনাতনের তত্ত্বাবধানে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল ।[৬] গ্রাউস যে তৎকালীন কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর কবে তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তার কিছু কিছু প্রমাণও তিনি তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন ।[৭] কাজেই গ্রাউসের গ্রন্থের উপর ভিত্তি কবে সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে ড. সেনকে ভক্তিবত্নাকরের প্রামাণ্য উদ্ধৃতিকেও অগ্রাহ্য করতে হয়েছে ।

কাল নির্ণয়ের পর ড. সেন শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন । তাঁর বিবৃত ঘটনাবলীর মধ্যেও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় । শ্রীনিবাসাচার্যের পিতা তাঁকে নবদ্বীপ বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভৃতি স্থান দেখিয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন ।[৮] আচার্যের কোন জীবনীগ্রন্থে এরকম বিবরণ নেই ।

---

[৪] ঐ - পৃ. ৮৬ ।
[৫] ঐ. - পৃ ৭৩ ।
[৬] বৃ. চ. গো. - পৃ ৮৭ ।
[৭] ঐ. - পৃ. ৬৬ ।
[৮] V. L M. B. - পৃ. ৮৭ ।

ডঃ সেন শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীখণ্ডে গঙ্গার ধারে এক ছটাক চালের ওপর নির্ভর করা এবং চৈতন্যদেবের গৃহভৃত্য ঈশানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] এই উক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন গমনের পথের যে বিবরণ ডঃ সেন দিয়েছেন সেটি সম্পূর্ণ প্রেমবিলাস থেকে গৃহীত। এই বিবরণের ক্ষেত্রে প্রেমবিলাসের চেয়ে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ যে অধিক নির্ভরযোগ্য, তা আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে দেখা যাবে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বৃন্দাবন থেকে বিদায় দেবার সময় শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—'I may not live again to see you, lads. I have finished my duty of teaching and must now wait for death only.'[১০] আচার্যের কোনও জীবনীগ্রন্থে শ্রীজীবের এরকম উক্তি পাওয়া যায় নি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ডঃ সেন শ্রীজীবকে অতি বৃদ্ধ কল্পনা করে নিয়েছেন। কিন্তু বয়স হিসাব করলে দেখা যায় যে শ্রীজীব ১৫১০ থেকে ১৫১৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল ১৫১৯ খৃস্টাব্দ বলে সকলের অনুমান।[১২-১৩] এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এঁরা প্রায় সমবয়সী ছিলেন। কাজেই শ্রীনিবাসাচার্য ও তাঁর সঙ্গীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীজীব বৃদ্ধ হতে পারেন না। এছাড়া গুণলেশসূচকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আচার্য যখন বৃন্দাবন গিয়েছিলেন তখন তিনি রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রথম দর্শনেই শ্রীজীব তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১৪] মনে হয় ডঃ সেন কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে শ্রীনিবাসাচার্য যখন শ্রীজীবের কাছে পাঠ নিতে গিয়েছিলেন তখন শ্রীজীব নিশ্চয়ই সে সময়ে বৃদ্ধ হবেন।

ডঃ সেন শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথের বিবরণের জন্য প্রেমবিলাসের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে যে কতখানি ত্রুটি আছে তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার আলোচনা করে

---

[৯] ঐ. পৃ. ১৩। [১০] V. L. M. B. পৃ. ১০৭। [১১] ম. বা. সা. ত. কা. পৃ. ৬০। [১২] ষো. শ. প. সা. পৃ. ১০৮। [১৩] ম. বা. সা. ত. কা. পৃ. ১১৪। [১৪] শ্রীনি. গু. সূ. ৩৩-৩৮ শ্লোক।

দেখিয়েছেন।[১৫] জীবনী আলোচনা কালে আমরাও এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আলোচনাকালে ডঃ সেন বীর হাম্বীরের নামের অর্থ করেছেন "হাম বীর" অর্থাৎ "আমি বীর"।[১৬] সংস্কৃত "হম্ভ্" শব্দ থেকে হাম্বা শব্দের উৎপত্তি। এর উত্তর অস্তি অর্থে "র" প্রত্যয় যোগে "হাম্বীর" শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কল্যাণ ঠাটের একটি রাগের নাম। উত্তর ভারতে হিন্দীতে এই রাগ 'হামীর' নামেও পবিচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নাম নূতন নয়। উড়িষ্যাব রাজা কপিলেন্দ্রের এক পুত্রের নাম ছিল হাম্বীর। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রতাপরুদ্রের খুল্লতাত ছিলেন।[১৭] শিশোদিয়া রাজবংশেও একজন হাম্বীরের নাম পাওয়া যায় যিনি গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের আমলে মালদেবের পুত্রকে পরাজিত করে চিতোরে শিশোদিয়াদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।[১৮] বিষ্ণুপুর সঙ্গীত জগতের একটি বিখ্যাত নাম। পূর্বভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরী ঘরানা আজও বিখ্যাত। এই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ঐতিহ্য যে কত পুরাতন তা হাম্বীরের নাম থেকেই অনুমান করা যায়।

ডঃ সেন বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৫৮ খৃস্টাব্দ থেকে আরম্ভ বলে ধরে নিয়েছেন,[১৯] কিন্তু আবুলফজল রচিত 'আকবরনামা' থেকে জানা যায় যে ১৫৯০ খৃস্টাব্দে বীর হাম্বীর মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।[২০] তিনি আরও লিখেছেন যে বীর হাম্বীর সমস্ত বাংলাদেশ জয় করার স্বপ্ন দেখতেন, এমনকি, গৌড়ের মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন।[২১] এই সমস্ত কথা অমূলক। তবে বীর হাম্বীর একবার মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বলে সমসাময়িক গ্রন্থ 'বহারিস্তান-ই-গায়বি' থেকে জানা যায়।[২২]

প্রেমবিলাসে বর্ণিত বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের দেহত্যাগের ঘটনাকেও ডঃ সেন সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।[২৩] এই

---

[১৫] ষো. শ. প. সা. পৃ. ১১০-১। [১৬] V. L. M. B. পৃ. ১০৯। [১৭] H. C. I. P. Vol. 6 পৃ ৩৬৭। [১৮] ঐ Vol. 5 পৃ ৯১-২। [১৯] V. L. M. B. পৃ. ১০৯। [২০] ম. বা. সা. ত. কা. পৃ. ১১৫। [২১] V L. M. B. পৃ. ১০৯। [২২] ম. বা. সা. ত. কা পৃ. ১১৫। [২৩] V. L. M. B. পৃ. ১১১।

প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে কবিরাজের বয়স তখন একশত বৎসরের ওপর ছিল। কিন্তু এটি যে প্রকৃত ঘটনা নয় তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করেছেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রেমবিলাস গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এই ঘটনার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমরাও আলোচনা করে দেখিয়েছি যে ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত।

ডঃ সেনের মতে বীর হাম্বীর ১৬০০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীনিবাসাচার্য কর্তৃক দীক্ষিত হন।[২৪] বীর হাম্বীর সম্বন্ধে এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন তা তিনি জানান নি। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক শ্রীনিবাসাচার্যকে লিখিত এক পত্রে "শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষঃ'—এই উক্তি থেকে জানা যায় যে, ১৫৯২ খৃস্টাব্দের আগেই বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ডঃ সেনের মতে দীক্ষান্তে রাজার নাম হয়েছিল হরিচরণ দাস। বীর হাম্বীরের দীক্ষান্তে প্রাপ্ত এই নামটি প্রেমবিলাসে পাওয়া যায়। এই নাম ইতিহাসসম্মত নয়।

প্রেমবিলাসের বিবরণের ওপর নির্ভর করে ডঃ সেন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আচার্য যখন বিষ্ণুপুর রাজসভায় উপস্থিত হন তখন সেখানে রাসপঞ্চাধ্যায় পড়া হচ্ছিল। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত ভ্রমরগীতার কথা তিনি অগ্রাহ্য করেছেন।[২৫] কিন্তু আচার্যের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় আছে যে সে সময়ে ভ্রমরগীতা পড়া হচ্ছিল।[২৬] বোঝা যাচ্ছে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা এই রচনা অবলম্বনে করা হয়েছে। কাজেই ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অগ্রাহ্য করে প্রেমবিলাসের বর্ণনাকে গ্রাহ্য করা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে ডঃ সেনের আরও একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। খেতরী উৎসবে উপস্থিত বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে তিনি বীরভদ্র ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম উল্লেখ করেছেন।[২৭] নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে কাটোয়ার উৎসবে বীরভদ্রের[২৮] এবং খেতরীর উৎসবে জাহ্নবী দেবীর উপস্থিতির কথা বলেছেন।[২৯] বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খেতরীতে উপস্থিত থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে

---

[২৪] V. L M B. পৃ. ১২০। [২৫] ঐ পৃ. ১১২। [২৬] শ্রীনি. গু. সূ ৮৭ শ্লোক।
[২৭] V. L M. B. পৃ. ১২৮। [২৮] ভ. র. ৯ম তরঙ্গ। [২৯] ভ. র. ১০ম তরঙ্গ।

ফেরার পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেহত্যাগ করেছিলেন বলে অনুরাগবল্লী[৩০] এবং ভক্তিরত্নাকরে[৩১] উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খেতরীর উৎসব হয়েছিল। বীরভদ্র এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বলে কোন গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

পদকর্তা বৈষ্ণবদাসের সংকলিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। পঞ্চম খণ্ডে সম্পাদক মহাশয় প্রায় দেড় শত পদকার-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা মুখ্যতঃ ভক্তিরত্নাকর অবলম্বনে রচিত।

আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে সতীশচন্দ্র রায় ১৪৩৮ শকাব্দকে আচার্যের জন্মকাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২] এসময়ে জন্ম হলে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে আচার্যের বয়স সতেরো বৎসর হয়। মনে হয় ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আচার্যের একাকী নীলাচল গমন করা থেকে তিনি আচার্যের জন্মকাল সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করে থাকবেন। আচার্যের জন্মকাল নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে এসময়ে তাঁর বয়স ১৪।১৫ বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়।

পদকল্পতরুর সম্পাদকের মতে শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল।[৩৩] রায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তের মূলে আছে ভক্তিরত্নাকরের ভ্রমাত্মক বিবরণ। গ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়েছিল কোনও এক সময়ে গৌড় থেকে নীলাচল যাওয়ার পথে। আচার্যের বৃন্দাবন যাওয়ার সময় সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমতের মূলেও আছে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাব যে তাঁর নীলাচল গমন ও বৃন্দাবন যাত্রার মধ্যে সময়ের যে বিরাট ব্যবধান আছে তা ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে আপাতদৃষ্টিতে পূরণ করা কঠিন। ঘটনাবলী

---

[৩০] অ. ব. ৬ষ্ঠ ম.। [৩১] ভ. র. ৭।৫৩৪। [৩২] প. ক. ত. ৫ম খণ্ড পৃ. ২২২।

[৩৩] ঐ পৃ. ১৭৪।

বিশ্লেষণকালে আচার্যের বৃন্দাবন গমনের কাল যে এত এগিয়ে যেতে পারে না তা সামান্য একটি উদাহরণ দিয়েই বোঝানো যেতে পারে। আচার্য যখন প্রথমবার বৃন্দাবন যান তখন রূপ ও সনাতন গোস্বামী ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলে আচার্য-শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় ও ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ আছে।[৩৪-৩৫] সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ১৫৫৪ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত করেছিলেন।[৩৬] কাজেই আচার্য যে ১৫৫৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে বৃন্দাবন যান নি এবিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ডঃ সুকুমার সেন রচিত “A History of Brajabuli Literature” ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৪৩৮ শকাব্দকে তিনি আচার্যের জন্মকাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭] মনে হয় চৈতন্যদেবের তিরোধান এবং সে সময়ে আচার্যের নীলাচল গমন থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে থাকবেন। আচার্যের তিন পুত্র ও তিন কন্যা আচার্যের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৮] কিন্তু আচার্যের জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে ধারণা হয় একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ ছাড়া অন্য সকলেই আচার্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত সন্তান।

ড সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে। এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথমার্ধে আচার্যের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ডঃ সেন এখানে কালনির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেন নি।[৩৯] এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রেমবিলাসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪০]

রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বিভিন্ন ঘটনার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনায় তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আচার্য ১৫৯০

---

৩৪. শ্রীনি গু. সূ ১৯তম শ্লোক। ৩৫ ভ র. ৪।১৯৪-২০৬। ৩৬. ষো. শ. প. সা. পৃ. ১১৮।
৩৭ H. B. L. পৃ. ৯৩। ৩৮ ঐ পৃ. ৯৪। ৩৯. বা. সা. ই. ১। ৪ ৩৭-৪০।
৪০. ঐ ৪৩৮ পা. টী.।

খৃস্টাব্দের পর প্রথমবার বৃন্দাবন গমন করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই সময়ে রূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দ মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে আচার্যের প্রথমবার এই মন্দিরে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই হেতু তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবনে আগমন এর পূর্বে হতে পারে না।[৪১] দীনেশচন্দ্র কিভাবে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বসু ঐ একই সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় ডঃ সেনের মতন অনুরূপ ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ডঃ নাথ তাঁর দুই পূর্বসূরীর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করায় নিজেও অনুরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর বিভিন্ন সময়ের কাল নির্ণয়ের জন্য ডঃ নাথ তাঁর সুবিধামতন নানা গ্রন্থের নানা বক্তব্যকে গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময়ে আচার্যের নীলাচল গমনের বর্ণনাকে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি।[৪২] কারণ সে সময়ে আচার্যের বয়স কমপক্ষে ১৫ বৎসর হলে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স হয় প্রায় ৭২ বৎসর। নগেন্দ্রনাথ বসু ও দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় তিনি আচার্য-শিষ্যদ্বয় নৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপূর কবিরাজের উক্তিগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর সুবিধার জন্য তিনি এই প্রামাণ্য উক্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করে প্রেমবিলাসের ওপর নির্ভর করেছেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বভাবতই রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানকালের সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য। এই আলোচনাকালে ডঃ নাথ গ্রাউসের সিদ্ধান্তে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত ২০শে বৈশাখ তাঁর বৃন্দাবন গমনের তারিখ স্থির করে মন্দির নির্মাণের পরবর্তী তারিখ হিসাব করে তিনি আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের সময় ১৫১৪ শকাব্দ বলে নির্ণয় করেছেন।[৪৩] কিন্তু যে

---

৪১. চৈ চ. ভূ. পৃ. ১৯। ৪২. চৈ. চ. ভূ. পৃ. ২৪। ৪৩. ঐ পৃ. ২০।

বিবরণের ভিত্তিতে তিনি কাল নির্ণয় করেছেন সেই গ্রাউসের ইতিহাসের অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের রচনা আলোচনা করার সময় প্রতিপন্ন করেছি। কাজেই তার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

ডাঃ নাথ তাঁর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সব প্রামাণ্য তথ্যকে অগ্রাহ্য করেছেন তার মধ্যে ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত শ্রীজীবগোস্বামীর কয়েকটি পত্র উল্লেখযোগ্য।[৪৪] এই পত্রগুলির তথ্যাদি তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তিনি এগুলির অংশবিশেষকে প্রক্ষিপ্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গ্রাউসের ইতিহাসকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে গিয়ে তাঁর এসব প্রামাণ্য তথ্যকে অস্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রচিত এই গ্রন্থটিকে বাদ দিলে আচার্যশিষ্যদের রচনা, শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রগুলি এবং অন্যান্য প্রামাণিক তথ্যাদি থেকে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী তথা খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নির্ণয় করা যায় বলে আমাদের ধারণা।

পরবর্তীকালে ডঃ সেন ও ডঃ নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল আনুমানিক ১৫৮৭ খৃস্টাব্দ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।[৪৫] এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীদের ন্যায় সমস্ত প্রামাণ্য তথ্যকে অস্বীকার করতে হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীজীবের পত্রগুলিকে তিনি অপ্রামাণিক বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৪৬] শুধু তাই নয়, আচার্যের জন্মকাল আনুমানিক ১৫৮৭ খৃস্টাব্দ বলে স্বীকার করায় তাঁকে এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে হয়েছে যে শ্রীনিবাসাচার্য গোপালভট্টের শিষ্য নন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু কর্ণপূর কবিরাজ, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রামাণ্য উক্তির নয়, আচার্যপুত্র গতিগোবিন্দের বক্তব্যেরও বিরোধী।[৪৭] এতগুলি প্রামাণ্য তথ্য অগ্রাহ্য করে তর্কতীর্থ মহাশয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের "চৈতন্যচরিতের উপাদান" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়

---

৪৪. ঐ পৃ. ২৮। ৪৫. O. H. ২।১ পৃ. ১৯৭-৮। ৪৬. ঐ পৃ. ২০১। ৪৭. ক. পৃ. ৮।

সংস্করণে প্রেমবিলাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৮] প্রেমবিলাসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীনিবাসাচার্যের জন্ম চৈতন্যদেবের জীবিতকালে হওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে তাঁব সামনে দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার প্রথমটি হলো বৃন্দাবন গমনের সময়ে আচার্যের বয়স। তাঁর হিসাবে আচার্যেব এই সময়ে বয়স হয় কমপক্ষে ৩৬ বৎসর। কিন্তু প্রেমবিলাসে এসময়ে তাঁকে বালক বলা হয়েছে। ডঃ মজুমদারেব দ্বিতীয় সমস্যা হলো বীর হাম্বীবেব রাজত্বকাল ১৫৮৭ খৃস্টাব্দ বলে ধরে নিলে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহরণ, এবং আচার্যের বিবাহেব সময় তাঁর নিজের বয়স সত্তরের উপব হয়।[৪৯] শেষ অবধি এই গ্রন্থে ডঃ মজুমদার ডঃ নাথ প্রমুখদেব মতেই সায় দিয়েছেন। এই মত তিনি অবশ্যই পরিবর্তন করেছেন পরবর্তীকালে। "ষোডশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য" গ্রন্থে তিনি ভক্তিবত্নাকব অবলম্বন করে তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যাদি রচিত প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভব কবে তাঁর কাল নির্ণয়ের প্রথম চেষ্টা কবেন শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায। ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে।[৫০] তিনি সংক্ষেপে আচার্যের কালক্রম নির্ণয়ের জন্য প্রথমে জীবনীগ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা বিচাব করেছেন। তাবপর নৃসিংহ কবিরাজ, শ্রীজীব গোস্বামীব পত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর কবে আচার্যের জীবনের কয়েকটি কাল নির্ণয় করেছেন এবং সেই সঙ্গে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের সিদ্ধান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম"-এ তিনি আচার্যের জীবনী সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করে আরও তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থে প্রমাণিত সিদ্ধান্তগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৫১]

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাল নির্ণয়ের সমর্থন পাওয়া যায় বিমানবিহারী রচিত "ষোডশ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের কাল নির্ণয় সম্পর্কিত আলোচনায়।[৫২] শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গ্রন্থে নিজ বক্তব্যের সমর্থনে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আচার্যশিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের একটি

---

[৪৮] চৈ. চ. উ. পৃ. ৪৮৪। [৪৯] ঐ পৃ. ৪৮৪। [৫০] প্রা. বা. সা. কা. পৃ. ১৮৬-৯৪।
[৫১] ম. যু. বা. সা. ত. কা. পৃ. ১১১-৩২।

শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। ডঃ মজুমদার এই শ্লোকের সমর্থনে নরোত্তমবিলাসে উদ্ধৃত আচার্যের অপর শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের গুণলেশসূচকের শ্লোকের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫৩] শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে এঁদের দুজনের রচনাই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত করেছেন।

আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "নরহরি চক্রবর্তী খুব সম্ভব ভক্তিরত্নাকর লিখিবার সময় কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত সূচকটি পান নাই, তাই ঐ গ্রন্থে উহার উল্লেখ করেন নাই।"[৫৪] কিন্তু এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে গ্রন্থকার কর্ণপূর কবিরাজের সমগ্র রচনাটির সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিলেন না, তিনি এর থেকে বহু অংশ ভক্তিরত্নাকরে প্রায় অনুবাদ করে দিয়েছেন।

ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি তাঁর "চৈতন্য-পরিকর" নামক গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "প্রামাণিক অপ্রামাণিক নির্বিশেষে প্রায় সকলগ্রন্থের সকল ঘটনাকে সাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রথমেই বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত সকল ঘটনা সম্বন্ধেই একসঙ্গে সঠিক বিচার অসম্ভব বলিয়া প্রথমে যেইগুলি সম্বন্ধে বিচার সম্ভব, মাত্র সেইগুলির বিচার করিয়াই সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।"[৫৫] সকল গ্রন্থ থেকে সকল বর্ণনা নির্বিচারে গ্রহণ করার ফলে তাঁর গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী যে রূপ গ্রহণ করেছে তা' থেকে আচার্যের প্রকৃত জীবনী উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ডঃ মাইতি কর্তৃক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে তাঁরা বিভিন্ন বর্ণনা বিচার করেছেন এবং কোন্ বিবরণগুলি গ্রহণযোগ্য সেগুলি স্থির করেছেন। তাছাড়া হরিদাস দাস বাবাজী কর্তৃক আচার্যশিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ গুণলেশসূচক নিয়ে আলোচনা করলে

---

৫৩. যো. শ. প. সা.—পৃ. ১০৮ ৫৪ যো. শ. প. সা.—পৃ ১০৮। ৫৫. চৈ. প.—ভূমিকা।

ডঃ মাইতি আচার্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারতেন বলে আমাদের ধারণা। উদাহরণস্বরূপ নরোত্তম ঠাকুরের বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ডঃ মাইতিব সিদ্ধান্তের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর মতে নবোত্তম শ্রীনিবাসাচার্যের পরে বৃন্দাবন গমন করেছিলেন।[৫৬] প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতির ঘটনাবিন্যাস থেকে এরূপ অনুমান করা গেলেও গুণলেশসূচকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নরোত্তম—আচার্যের বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বেই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেছিলেন।[৫৭] এছাড়া শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক 'আচার্য' উপাধিদান, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহবণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও পরবর্তী বচনাগুলির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে সেগুলি সম্বন্ধেও ডঃ মাইতি গুণলেশসূচকের ওপব নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন।

ডঃ ননীগোপাল গোস্বামী কর্তৃক রচিত "চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব" গ্রন্থটি ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। ডঃ গোস্বামীর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আচার্যের জীবনের কয়েকটি কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাব উদাহরণস্বরূপ প্রথমে আচার্যেব জন্মকাল নির্ণয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নির্দেশিত আচার্যেব জন্মকাল ১৫১৯/২০ খৃস্টাব্দকে অস্বীকার করেছেন।[৫৮] এবং এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে ১৫১৮ খৃস্টাব্দকে আচার্যের জন্মকাল বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর সিদ্ধান্তও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের এমন বিরাট পার্থক্য কোথায় দেখা গেল যাব জন্য তিনি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে পারেন নি, তা বোধগম্য হলো না।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধান কাল সম্বন্ধেও ডঃ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হলো তাঁরা দুজনেই ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে এক মাসের ব্যবধানে দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু "চৈতন্য চরিতামৃত" ও "শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকে"র আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এঁদের তিরোধানের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক মাসেব

---

[৫৬] চৈ প.—পৃ. ৫৫২। [৫৭] গু. লে সূ. ৪৬ শ্লোক। [৫৮] চৈ যু গৌ বৈ—পৃ ১৯।

ব্যবধান আছে। এসম্বন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৫৯] আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে আমরাও এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব যে এঁরা মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দেহত্যাগ করেন নি।

ডঃ গোস্বামীর অপর সিদ্ধান্ত হলো শ্রীনিবাসাচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের পূর্বে বিবাহ করেছিলেন।[৬০] তিনি এই তথ্যটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন অনুমান করা কঠিন। কারণ আচার্যশিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস প্রভৃতি সকল গ্রন্থের গ্রন্থকার একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগমনের পর বিবাহ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অনুরাগবল্লীর ষষ্ঠ মঞ্জরী থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন সেগুলির আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এসমস্তই তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এটি যদি প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তবে রামচন্দ্র কবিরাজ কোথা থেকে এলেন? আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের পর আচার্যপত্নী কর্তৃক রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে যেতে আদিষ্ট হয়েছিলেন একথা স্বীকার করলে স্বীকার করতে হবে আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বেই দীক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ।

এ পর্যন্ত আচার্যের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসম্বন্ধে আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হলেও তাঁর জন্মকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নানা কারণে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে কয়েকজন ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ স্বীকার করে জন্মকাল চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছু পূর্বে স্থির করলেও পরবর্তীকালে গ্রাউসের ইতিহাসের বিবরণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর জন্মকালকে অনেকে আরও পরবর্তীকালের ঘটনা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে আচার্যের জীবনকালের নানা ঘটনাবলীর নানা প্রামাণ্য তথ্য সম্বন্ধে নানা মত ও নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই জটিলতার দিকে প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও প্রথমে এ সমস্যার কোনও সমাধান করেন নি।

---

[৫৯] ম যু বা. সা. ত. কা.—পৃ. ১২৮। [৬০] চৈ. যু. গৌ বৈ —পৃ. ২৬।

সর্বপ্রথম শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় প্রামাণ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে আচার্যের জীবনের কয়েকটি কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে ডঃ মজুমদার শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরও পরে আচার্যের জীবনী নিয়ে কিছু আলোচনা হলেও এবিষয়ে কেউই অধিক অগ্রসর হন নি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কাল নির্ণয় করার চেষ্টা করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ হয় নি। তিনি "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রমে" আচার্যের জন্মকাল নির্ণয় করলেও তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় সেই গ্রন্থে করেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর অপর গ্রন্থ "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রমে" এই তারিখটি সম্বন্ধে তিনি অবশ্য সিদ্ধান্তে এসেছেন। তৎসত্ত্বেও আচার্যের জীবনের আরও কয়েকটি ঘটনার কাল নির্ণয়ের কাজ অসম্পূর্ণ আছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহরণের কাল, গোবিন্দদাস কবিরাজের দীক্ষাদান ও খেতরীর উৎসবের কাল নির্ণয়ের কথা বলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে দেখা যাবে চৈতন্যোত্তর যুগের ইতিহাসের অনেক উপকরণ আচার্যের জীবনকে অবলম্বন করে লেখা আছে। কাজেই আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে তাঁর সমসাময়িক অনেক বৈষ্ণব মহাজন ও তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যা নিয়ে এযাবৎ আলোচনা হয় নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী

কুলপরিচয়—শ্রীনিবাসাচার্যের কুলপরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র তাঁর শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের রচনায়। এই রচনা থেকে জানা যায় যে তিনি রাঢ়ীয় ঘন্টেশ্বরীকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১] এই রচনায় কিংবা অনুরাগবল্লীতে তাঁর পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্যের পিতা ও মাতার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় আচার্যের পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর ভট্টাচার্য।[২] তিনি চৈতন্যদাস নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই নামকরণের কারণ হিসাবে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সময় বহু লোকের সঙ্গে তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের দৃশ্যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং চৈতন্যের নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি গ্রামে প্রবেশ করেন। সেই থেকে তিনি চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন।[৩] ভক্তিরত্নাকরকার এই বিবরণ আচার্যের আদি বাসস্থানের এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট হতে সংগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] এই বিবরণ কতখানি সত্য তা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও অনুমান করা যায় আচার্যের পিতৃদেব সম্বন্ধে এরকম একটি কাহিনী নরহরি চক্রবর্তীর বহুদিন আগে থাকতেই ছিল।

আচার্যের পিতা গঙ্গাধর অপেক্ষা চৈতন্যদাস নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। কারণ প্রেমবিলাসে তাঁর এই নামের উল্লেখ আছে।[৫]

শ্রীনিবাসাচার্যের মায়ের নাম ছিল লক্ষ্মীপ্রিয়া। ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে তাঁর এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মের পূর্ব কাহিনী—ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের জন্মের

---

১. শু. লে. সূ. ১ শ্লোক। ২. ভ. র. ২।২২। ৩. ভ. র. ২।৩৭-৬১। ৪. ঐ ২।৬১।

৫. প্রে. বি. ১ম বিলাস।

পূর্বকাহিনী হিসাবে বলা হয়েছে যে লক্ষ্মীপ্রিয়া অনেকদিন অপুত্রক ছিলেন। প্রভুর অর্থাৎ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় তাঁর পুত্রকামনা হওয়ায় স্বামীস্ত্রী পরামর্শ করে নীলাচলে যান। সেখানে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় এবং তাঁর নির্দেশে গোবিন্দ তাঁদের জগন্নাথ দর্শন করান। নীলাচলে থাকতে চৈতন্যদাস জগন্নাথ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং পরদিন চৈতন্যদেবও তাঁকে দেশে ফিরে যেতে বলেন। চৈতন্যদাস সস্ত্রীক ফিরে এসে যাজিগ্রামে কয়েকদিন থেকে চাখন্দিতে ফিরে আসেন। এসময় লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভবতী হন।[৬]

ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে চৈতন্যদেবের সঙ্গে চৈতন্যদাসের পূর্ব পরিচয় ছিল। ভক্তিরত্নাকরে অন্যত্র দেখা যায় যে চৈতন্যদাসের সঙ্গে কেশবভারতীর পূর্ব পরিচয় ছিল এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চৈতন্যদাস প্রায়ই কাটোয়ায় যেতেন।[৭] সেই সূত্রে চৈতন্যদেব কর্তৃক আচার্যের পিতাকে এভাবে অনুগ্রহ করা আশ্চর্য নয়। তবে চৈতন্যদেবের শাখা বর্ণনায় চৈতন্যদাসের কোনও উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যায় তিনি চৈতন্যদেবের গুণগ্রাহী হলেও চৈতন্য-শাখাভুক্ত ছিলেন না। চৈতন্যভাগবতে যে চৈতন্যদাসের উল্লেখ আছে তিনি শিবানন্দ সেনের পুত্র।[৮] এছাড়া অন্য কোনও চৈতন্যদাসের উল্লেখ এই গ্রন্থে নেই।

প্রেমবিলাসের আরম্ভ শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব-কাহিনী দিয়ে। এই কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ নীলাচলে চৈতন্যদেবের গৌড়ে প্রেমভক্তি বিতরণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কথা অবতারণা করে বলা হয়েছে যে অদ্বৈতাচার্য প্রেমভক্তি ছেড়ে মুক্তির কথা প্রচার করেছেন জেনে চৈতন্যদেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। নিত্যানন্দ অবিদ্যমানে জীবের মধ্যে ভক্তি প্রচারের জন্য তিনি "প্রেমরূপ এক পাত্র" জন্মাতে আগ্রহ প্রকাশ করে পৃথিবীকে ডাকলেন। জগন্নাথদেব তাঁকে চৈতন্যদাস নামে এক গৌড়িয়া ব্রাহ্মণের কথা বললেন যিনি এই পাত্রের উপযুক্ত পিতা হতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যদেব খোঁজ নিয়ে জানলেন যে এই গৌড়িয়া চৈতন্যদাস কিছুদিন আগে নীলাচল ত্যাগ করেছেন। চৈতন্যদেবের আদেশে পৃথিবী চৈতন্যদাসকে খুঁজে বার করলেন এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে প্রেম সমর্পণ করলেন। এভাবে শ্রীনিবাসাচার্যের জন্ম হলো।

---

[৬] ভ. র. ২।১৪৮-৫১। [৭] ঐ ২।৩২২-৩। [৮] চৈ ভা ২।১০।

প্রেমবিলাসের এই বর্ণনায় যে শুধু বাহুল্য আছে তা' নয়, এই বিবরণ ইতিহাস-বিরুদ্ধ। চৈতন্যচরিতামৃতে তরজা প্রাপ্তিকালীন চৈতন্যদেবের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেই বর্ণনানুসারে তাঁর প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য কোনও চিন্তা কিংবা প্রচেষ্টার প্রশ্ন ওঠে না। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যায় চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়া নীলাচল এসেছিলেন চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে। এই গ্রন্থের অন্যান্য বিবরণ থেকে অনুমান করা গিয়েছে কেশবভারতীর সম্পর্কে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে হয়তো পরিচিত ছিলেন। কাজেই নীলাচল এসে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে চলে যাবেন—একথা বিশ্বাস করা যায় না। অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধেও যা বলা হয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন আছে। কাজেই কোনও দিক থেকে প্রেমবিলাসের এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল—শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের তারিখের সাহায্যে তাঁর বয়স নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। গ্রাউসের বিবরণের সাহায্যে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যেহেতু আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন গিয়ে শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গে যে গোবিন্দমন্দিরে সাক্ষাৎ করেন সেই মন্দিরটি রাজা মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯০ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল, সেই হেতু আচার্যের বৃন্দাবনে আগমন এর পূর্বে হয় নি। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁরা আচার্যের জন্মসময় ১৫৬০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি বলে অনুমান করেছেন।

অপরপক্ষে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখগণ আচার্যের শিষ্যদ্বয়—কর্ণপূর কবিরাজ ও নৃসিংহ কবিরাজের রচনার ওপর নির্ভর করে তাঁর জন্মকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই শিষ্যদ্বয়ের রচনায় দেখা যায় যে চৈতন্যদেবকে দর্শন করার আগ্রহে শ্রীনিবাসাচার্য নীলাচল যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর তিরোধানের সংবাদ পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সে সময়ে তাঁর বয়স ২২।২৩ বৎসর ছিল বলে সতীশচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন। কিন্তু ডঃ মজুমদার ও শ্রীমুখোপাধ্যায় সে সময়ে আচার্যের বয়স সর্বনিম্ন ১৪।১৫ বৎসর অনুমান করে তাঁর জন্মসময় ১৫১৮।১৯ খৃস্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন। পুলিনবিহারী দাসও তাঁর 'বৃন্দাবন কথা'য় একটি প্রাচীন পুঁথির উল্লেখ করে শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল ১৫১৯ খৃস্টাব্দ বলে নির্ণয় করেছেন।

আলোচ্য দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর যে গোবিন্দমন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীজীব শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।[৯] এই বর্ণনায় মন্দির কিংবা সন্ধ্যারতির কোনও উল্লেখ নেই। মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ভক্তিরত্নাকব ও প্রেমবিলাসে। এই রচনাদুটি পরবর্তীকালে লেখা। এক্ষেত্রে আচার্যের শিষ্যের রচনার ওপব অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিসম্মত।

দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যায় চৈতন্যদেবের প্রকটকালে রূপ গোস্বামী গুমাটিলার যোগপীঠ থেকে গোবিন্দ-বিগ্রহ উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন।[১০] নরহরি চক্রবর্তী তাঁর বিবরণের সমর্থনে বাধাকৃষ্ণ গোস্বামী রচিত সাধনদীপিকা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইনি ছিলেন হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য এবং গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য। হরিদাস পণ্ডিত রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। কাজেই তাঁর শিষ্যের বক্তব্যকে অপ্রামাণিক বলা চলে না। চৈতন্যদেবের প্রকটকালে যে বিগ্রহ উদ্ধার করা হয়েছিল সেই বিগ্রহ মানসিংহ কর্তৃক মন্দির তৈরি হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠা করা হয় নি—একথা স্বীকার করা যায় না। বরং চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে রঘুনাথ ভট্টের এক শিষ্য এই মন্দিব নির্মাণ করেছিলেন।[১১] এমন হতে পারে যে পরবর্তীকালে মানসিংহ সেখানে ১৫৯০ খৃস্টাব্দে এই মন্দিরটিব স্থলে আলোচ্য মন্দিরটি প্রস্তুত করে থাকবেন। সেক্ষেত্রে ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত গোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীজীবের সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাতের বিবরণকে সত্য ঘটনা বলে স্বীকার করে নিলেও তা' যে মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরেই হয়েছিল তাব কোনও প্রমাণ নেই। এই কারণে গ্রাউসের বিবরণের ওপব নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসঙ্গত নয়।

---

[৯] গু. লে সূ. ৩৪-৩৬ শ্লোক।   [১০] ভ. র. ২।৪২৭-৩৭

[১১] চৈ. চ. ৩।১৩।—পৃ. ৫৭৮ (ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতির মতে এই শিষ্য হলেন মহারাজ মানসিংহ। কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট রূপসনাতনের পূর্বে অর্থাৎ ১৫৬২ খৃস্টাব্দের পূর্বে দেহত্যাগ করেন। মানসিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয় ১৫৯০ খৃস্টাব্দে। কাজেই মনে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে রঘুনাথের শিষ্য বলতে মানসিংহের কথা বোঝান নি। তাঁর পূর্বে রঘুনাথের অপর কোনো শিষ্য এই মন্দির করে থাকবেন।)

অপর পক্ষে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদ্বয়ের বিবরণের ওপর নির্ভর করে তাঁর জন্ম-সময় নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা যায়। কারণ এখানে এমন একটি তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে যার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদ্বয়ের শ্লোক দুটির ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতেরা তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে এলেও তাঁর জন্মের সঠিক কাল সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারেন নি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে এঁদের মতে আচার্যের জন্মকাল ১৫১৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। ১৫১৬ খৃস্টাব্দকে আচার্যের জন্মকাল ধরলে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে নীলাচলে একাকী যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বয়স হলেও তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে বয়সের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে ১৫১৯ খৃস্টাব্দকে তাঁর জন্মকাল বলে স্বীকার করলে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে তাঁর যে বয়স আমরা পাই সেটা চৈতন্যদেবকে শুধুমাত্র দর্শন করার আগ্রহে একাকী নীলাচল রওনা হওয়ার পক্ষে অসঙ্গত নয়। পরন্তু তাঁর পরবর্তীকালের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে বয়সের সামঞ্জস্য রক্ষা করাও সম্ভব হয়। ১৫১৯ খৃস্টাব্দের পর জন্মকাল ধরলে পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর বয়সের সামঞ্জস্য রক্ষা করা গেলেও চৈতন্যদেবকে দেখার আগ্রহ হওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে একাকী রওনা হওয়ার পক্ষে বয়স কম হয়ে যায়। একারণে তাঁর বয়সের নিম্নতম সীমা ১৫১৯ খৃস্টাব্দের নীচে ধরা যায় না। পুলিনবিহারী দাস মহাশয় আচার্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত একটি পুঁথি থেকে জেনেছিলেন যে তাঁর ১৫১৯ খৃস্টাব্দে জন্ম ও ১৬০৩ খৃস্টাব্দে তিরোধান হয়েছিল।[১২] আলোচ্য যুক্তি অনুসারে পুঁথি বর্ণিত জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সেই কারণে ১৫১৯ খৃস্টাব্দকে শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মকাল বলে ধার্য করা যেতে পারে।

শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মসময়—শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মসময় সম্বন্ধে একমাত্র ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বৈশাখী পূর্ণিমায় "দিবা রোহিণী মুহূর্তে" তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে বৈশাখী পূর্ণিমায় শুভদিনে ও শুভক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] জগবন্ধু ভদ্র লিখেছেন "বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে" তাঁর জন্ম হয়েছিল।[১৫] মনে হয় ভক্তিরত্নাকরের রোহিণী-মুহূর্ত

---

[১২] যো. শ. প. সা.—পৃ. ১৩১।
[১৩] ভ. র. ২।১৫৬
[১৪] প্রে. বি. ১ম বি.
[১৫] গৌ. প. ত.—পৃ. ৭০।

অনবধানতাবশতঃ রোহিণী নক্ষত্রে পরিণত হয়ে থাকবে এবং ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথও ভদ্র মহাশয়ের লেখার ওপর নির্ভর করে ভক্তিরত্নাকরের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে থাকবেন। ডঃ মাইতিও তাঁর গ্রন্থে "রোহিণী নক্ষত্রে" আচার্যের জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

ডঃ নাথেব মতে বৈশাখী পূর্ণিমা কখনও রোহিণী নক্ষত্রে হয় না।[১৭] গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেব পণ্ডিত হিসাবে তাঁব অভিমত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি ভালভাবে বিচার কবে দেখলে দেখতে পেতেন এই গ্রন্থে 'নক্ষত্র' না বলে 'মুহূর্ত' বলা হয়েছে কাজেই ধরে নেওয়া যায় গ্রন্থকার এখানে 'রোহিণী মুহূর্ত' বলতে নক্ষত্রের কথা না বলে অন্য কিছু বলতে চেয়েছেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র দিয়ে মুহূর্ত গণনা কোনও নূতন বিষয় নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়কে পনেরো ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে একটি নক্ষত্রের নামে মুহূর্ত হিসাবে গণনা করা হয়। এর মধ্যে নবম মুহূর্ত হলো "রোহিণী মুহূর্ত"। বাংলা পঞ্জিকাগুলিব গণনানুসারে এদেশে বৈশাখ মাসে সূর্যোদয় হয় ভোব ৫টায় আর সূর্যাস্ত হয় সন্ধ্যা ৬টায় অর্থাৎ এই দুইএর মধ্যে ১৩ ঘণ্টার পার্থক্য বিদ্যমান। সেই হিসাবে বৈশাখ মাসে প্রতি মুহূর্তের অবস্থান হলো ৫২ মিনিট এবং রোহিণী মুহূর্তেব আরম্ভ আনুমানিক বেলা প্রায় ১১টা ৫০ মিনিট। এই হিসাবে শ্রীনিবাসের জন্মসময় এই সময় থেকে বেলা প্রায় ১২-৩০টার মধ্যে হওয়া সম্ভব। ডঃ নাথ যদি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি ভাল কবে দেখতেন তবে এবিষয়ে আরও খানিকটা আলোকপাত করতে পাবতেন বলে মনে হয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের রূপ বর্ণনা—আচার্যের শিষ্যবর্গের রচনায় এবং পরবর্তীকালেব বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ কৃত "শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-প্রভোরষ্টকম্" এর কথা।[১৮] এই আটটি শ্লোকের ছয়টিতেই আচার্যের রূপবর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তাঁর গায়ের রং ছিল কাঁচা সোনার মতো। গলাব স্বর ছিল মধুর এবং মাথায় ছিল চিকণ চাঁচব কেশ। তাঁর শরীর ছিল সুগঠিত। তিলক আর যজ্ঞসূত্রে শোভিত আচার্যের চেহারা

---

৬১ চৈ. প.—পৃ. ৫৪৭ ১৭ চৈ চ. ভূ—পৃ. ২৩। ১৮. শ্রীনি. প্র.—পৃ. ২৩-২৫

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর সুন্দর চলার ভঙ্গী, মধুর স্বর ও সুমধুর হাসিতে সকলেই মুগ্ধ হতেন।

অনুরাগবল্লীতে শ্রীনিবাসাচার্যের যে রূপ-বর্ণনা দেওয়া আছে তাকে রামচন্দ্র কবিরাজের বর্ণনার পুনরুক্তি বলা চলে।[১৯] ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের যে বর্ণনা দেওয়া আছে সেটি পড়লেও মনে হয় গ্রন্থকার রামচন্দ্র কবিরাজের বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।[২০]

রামচন্দ্র কবিরাজের শ্লোকগুলিতে শ্রীনিবাসাচার্যের যে রূপ-বর্ণনা পাওয়া যায় তাকে অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ নেই, কারণ এই বিবরণ হলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। প্রশ্ন উঠতে পারে এই শ্লোকগুলি যথার্থই রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা কি না। অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে গ্রন্থকারদ্বয় এই রচনার ওপর ভিত্তি করে আচার্যের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা একে প্রামাণ্য জেনেই এর ওপর নির্ভর করেছিলেন—একথা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে এই রচনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না।

শ্রীনিবাসাচার্যের বাল্যকাল—জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের বাল্যকাল সম্বন্ধে খানিকটা বিবরণ পাওয়া যায়। শিশুকালে বাড়ীর আঙিনায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ানো মায়ের হাত ধরে স্খলিত পদক্ষেপে হাঁটা প্রভৃতির বিবরণ এই গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা পড়লে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের শিশু বিশ্বম্ভরের কথা মনে পড়ে। ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণ যে-কোনও শিশুর বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাজেই এর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের বিদ্যার্জন—অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে আচার্য পৌগণ্ডে বিদ্যারম্ভ করেন এবং অল্পদিনেই ব্যাকরণ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রবেশ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একবার পড়লেই তাঁর সবকিছু কণ্ঠস্থ হয়ে যেত।[২১] ভক্তিরত্নাকরে এই বর্ণনার পুনরুক্তি করা হয়েছে মাত্র।[২২] এই দুই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে বাল্যকাল থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পরবর্তীকালে যিনি বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পক্ষে

---

১৯. অ. ব. ২য় স.। ২০. ভ. র. ২।১৯১-৫ ২১. অ. ব. ২য়। ২২. ভ. র. ২।১৮২-৩

বাল্যে মেধাবী হওয়া বিস্ময়ের কথা নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই এই দুই গ্রন্থের বক্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা বিচার না করেও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসাচার্যের বিদ্যার্জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর এবিষয়ে উৎসাহ এত অধিক ছিল যে উপনয়ন সংস্কারের সময় তিনদিন পাঠ বাদ যাওয়ায় তিনি ক্রন্দন শুরু করেন।[২৩] এমন সময় তিনি রাত্রি বেলায় স্বপ্নে নির্দেশ পেলেন সর্বদা রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করার। দশদিন পর তিনি মাতৃ-আজ্ঞায় যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হলেন তখন গুরু স্বীকার করলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে গুরুর আর বিদ্যাস্ফূর্তি ছিল না। ছাত্র লজ্জিত হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়া এসম্বন্ধে কিছু জানেন না। পুত্র ফিরছে না দেখে তাঁরা গুরুগৃহে গিয়ে শুনলেন শ্রীনিবাস অনেকক্ষণ বাড়ী ফিরে গিয়েছে। ঘরে এসে দেখেন শ্রীনিবাস "পুস্তক হাতে নিদ্রাতে আবিষ্ট" আছেন। ভোজন সমাপন করে তিনি যখন আবার শুলেন তখন সরস্বতীর দৈববাণী হলো। দেবী বললেন যে "চৈতন্য আজ্ঞাতে" তিনি শ্রীনিবাসকে বিদ্যাদান করতে এসেছেন। এরপর তাঁর আর পাঠ বাদ পড়ে নি।[২৪]

প্রেমবিলাসের এই অবাস্তব কাহিনী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মনে হয় ভক্তিরত্নাকর রচনারও পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে যেসব কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হওয়ার ফলে ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হচ্ছিল, সেই অতিরঞ্জিত কাহিনীই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ যত দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ততই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা আরও বৃদ্ধি পেয়ে এমন উচ্চস্থানে পৌঁছেছিল যে তাকে অলৌকিক কাহিনী দিয়ে ব্যাখ্যা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিক্ষাগুরু—ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের শিক্ষাগুরুর নাম বলা হয়েছে ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি। প্রেমবিলাসে আচার্যের শিক্ষাগুরু হিসাবে একই ব্যক্তিকে যথাক্রমে বিদ্যানিধি পণ্ডিত, শ্রীরাম বাচস্পতি ও ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৫] দুটি গ্রন্থে যখন ধনঞ্জয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে তখন এঁকে আচার্যের শিক্ষাগুরু হিসাবে স্বীকার করা যেতে পারে।

---

[২৩] প্রে. বি. ৩য় বি.। [২৪] প্রে. বি. ৩য় বি.। [২৫] প্রে. বি. ৩য় বি.।

শ্রীনিবাসের শিক্ষাগুরুর কোন সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সে সময়ে একজন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ইনি বর্ধমান জেলার শীতল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[২৬] নিত্যানন্দের শিষ্য ও দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিত আচার্যের শিক্ষাগুরু হলে ভক্তিরত্নাকরে তাঁর পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখ থাকত। প্রেমবিলাসকারও নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। তিনিও একথা উল্লেখ করতে ভুলতেন না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীনিবাসাচার্যের শিক্ষাগুরু নিত্যানন্দশিষ্য ধনঞ্জয় হতে পৃথক ব্যক্তি।

বাল্যকালে শ্রীনিবাস কর্তৃক কয়েকজন চৈতন্য-পরিকরের আশীর্বাদ লাভ—বাল্যকালেই শ্রীনিবাসাচার্যের কয়েকজন-চৈতন্য-পরিকরের আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। এঁদের মধ্যে পদকার গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে চৈতন্যদাস বালক শ্রীনিবাসকে সর্বদা সঙ্গে রাখতেন, এমনকি তিনি বাইরে কোথাও গেলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি গোবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসেছিলেন।[২৭] 'রসকল্পবল্লীর' উক্তি অনুযায়ী গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে বাস করতেন।[২৮] চাকন্দি থেকে এই গ্রাম মাত্র দেড়ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। কাজেই পিতার সঙ্গে শিশু শ্রীনিবাসের এখানে যাতায়াত করা অসম্ভব নয়। সে কারণে ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া শ্রীনিবাস বাল্যকালে অন্য যে দুজন চৈতন্য-পরিকরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় সরকার ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনিবাসের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স খুবই কম। সে সময় তাঁরা থাকতেন চাকন্দিতে এবং তাঁর মাতুলালয় ছিল নিকটবর্তী যাজিগ্রামে। একদিন তিনি কোনও একজন সঙ্গীর সাথে মাতুলালয়ে যাচ্ছিলেন। সেসময় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নরহরি সরকার ঠাকুর সেখানে এসেছিলেন। পথে এই সুদর্শন বালক দেখে তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাঁকে

---

২৬. র. ক. ব. পৃ. ২০০। ২৭. ভ. র. ২।২০৩-৭। ২৮. র. ক. ব. পৃ. ১৯৮।

আশীর্বাদ করেন।[২৯] নিজের বাড়ী থেকে সামান্য দূরে মাতুলালয় যেতে যখন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল তখন অনুমান করা যেতে পারে সেসময়ে শ্রীনিবাসের বয়স ছয় সাত বৎসর ছিল।

বালক শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরহরি সরকার ঠাকুবের প্রথম সাক্ষাৎকারের দুটি বিবরণ প্রেমবিলাসের দু'জায়গায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের চতুর্থ বিলাসের বিবরণে দেখা যায় একদিন সকালে শ্রীনিবাস স্নান কবতে চলেছেন, সে সময়ে সরকার ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তাঁব চেহারা দেখে সরকার ঠাকুর আকৃষ্ট হলেন। হঠাৎ তাঁর চৈতন্যদেবের কথা স্মরণ হলো। শ্রীনিবাসের পরিচয় জেনে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে নিত্যানন্দ শ্রীনিবাসের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। বীরভদ্রও "জাহ্নবা সাক্ষাতে" সরকার ঠাকুবকে বলেছেন শ্রীনিবাসকে অবিলম্বে বৃন্দাবন পাঠাতে।[৩০]

সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীনিবাস ঘরে ফিরে এলেন। তাঁব সংস্পর্শে এসে বালক শ্রীনিবাস প্রেমে অস্থির হয়ে পডেছিলেন। বাডীতে তাঁব রোদনে পাডাব সকলে একত্রিত হলেন। তাঁর অস্থিরতাব কারণ কেউ বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে গ্রামের এক বৃদ্ধ বললেন যে সরকাব ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বালক প্রেমে উন্মাদ হয়েছেন। ঠাকুরেব নাম শুনে শ্রীনিবাস স্থির হলেন।[৩১]

নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎকারেব অপব বিবরণ পাওয়া যায় প্রেমবিলাসের ষোডশ বিলাসে। এই বিবরণানুযায়ী গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাস জাহ্নবাদেবীব সঙ্গে তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবন পরিভ্রমণের সময় সঙ্গী হয়েছিলেন। সেবার জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে কপগোস্বামী, রঘুনাথ দাস প্রমুখ চৈতন্য পরিকরদের সাক্ষাৎ হয়। জাহ্নবাদেবী দেশে ফিরে আসার সময় রূপগোস্বামী শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন পাঠাতে অনুরোধ জানান। জাহ্নবাদেবী তাঁকে অন্বেষণ করে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দান করেন। দেশে ফিরে তিনি নবহরি সরকার, রঘুনন্দন ও মুকুন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং নরহরিকে বলেন, "শ্রীনিবাস কে আছে তারে পাঠাও বৃন্দাবন"। এরপর জাহ্নবাদেবী দেশে ফিরে গেলেন কিন্তু নিত্যানন্দ দাস শ্রীখণ্ডে থেকে গেলেন। ইতিমধ্যে একদিন নরহরি ঠাকুরের

---

২৯. ভ. র. ২।২১১-১৯। ৩০. প্রে. বি. ৪র্থ বি.। ৩১. ঐ।

সঙ্গে দেখা করার জন্য এক বালক এসে উপস্থিত হলো। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তার নাম শ্রীনিবাস, নিবাস চাকন্দি গ্রাম এবং মাতাপিতার সঙ্গে সেখানে বাস করছে। নরহরি ঠাকুর তাঁকে রূপগোস্বামী ও জাহ্নবাদেবীর তাঁর সম্বন্ধে আলাপের কথা বলে তাঁকে বৃন্দাবন যেতে আজ্ঞা দিলেন।৩২

প্রেমবিলাসের দু’জায়গার এই দুই বিবরণের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও বক্তব্যের দিক থেকে এক। কারণ এই দুটিই নরহরির সঙ্গে শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ। প্রথম বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের খানিকটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণের সঙ্গে প্রথমটির কোনও সাদৃশ্য নেই। দ্বিতীয় বিবরণকে লেখক যখন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলে বিবৃত করছেন তখন তিনি প্রথম বিবরণ কেন দিলেন বোঝা গেল না। এই দুটি বিবরণের যে কোনও একটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে অগ্রাহ্য করলেও অপরটিকে আসল বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে দুটিতেই ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তি আছে।

প্রথম বিবরণে দেখা যাচ্ছে নরহরি শ্রীনিবাসকে বলছেন যে জাহ্নবাদেবীর সাক্ষাতে বীরচন্দ্র তাঁকে বলেছেন যে তিনি যেন শ্রীনিবাসকে সত্বর বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেন। যে সময়ে বীরচন্দ্রের সঙ্গে নরহরি সরকার ঠাকুরের এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল তখন শ্রীনিবাস “জন্মিয়াছেন গঙ্গাতীরে অতি শিশু হন”৩৩, সেজন্য বীরভদ্র তখনও তাঁর দেখা পান নি। অতি শিশু বলতে ধরে নেওয়া যায় শ্রীনিবাসের বয়স তখন দুই এক বৎসরের বেশী হবে না। অর্থাৎ ধরে নিতে হবে ১৫২১।২২ খৃস্টাব্দে এই কথোপকথন হয়েছিল। এই সময়টি চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্বের কথা। নরহরি সরকারকে এই অনুরোধ করতে হলে বীরভদ্রের বয়স তখন কমপক্ষে ২০।২১ বৎসর হতে হয়। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় নিত্যানন্দ ১৪৯৮।৯৯ খৃস্টাব্দে বিবাহ করেছিলেন। নিত্যানন্দের বিবাহের এই তারিখ এত অবাস্তব যে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই প্রেমবিলাসের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রেমবিলাসের দ্বিতীয় বিবরণে দেখা যাচ্ছে নরহরির সঙ্গে শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি এতটা সাবালক যে তিনি একা শ্রীখণ্ডে এসেছেন সরকার

---

৩২. প্রে বি. ১৬শ বি.।   ৩৩. প্রে. বি. ৪র্থ বি.।

ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এসময়ে তাঁর বয়স যদি কমপক্ষে পনেরো বৎসর ধরা যায় তাহলে স্বীকার করতে হয় যে এই ঘটনা ১৫৩৪ খৃস্টাব্দের কথা। সে সময়ে নিত্যানন্দের বর্তমান থাকার কথা। তিনি বর্তমান থাকতে জাহ্নবাদেবী দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন এবং সশিষ্য বৃন্দাবন গিয়েছিলেন একথা স্বীকার কবা যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে জাহ্নবাদেবী খেতরী উৎসবের পর অতি পরিণত বয়সে প্রথমবার বৃন্দাবন গমন করেছিলেন। সে সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য এদেশে আচার্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস যদি সে সময়ে জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়েও থাকেন তবে ফিরে এসে তাঁর বালক শ্রীনিবাসকে দেখার কথা নয় এবং সে সময়ে নরহরি সরকার ঠাকুরের বর্তমান থাকার কথাও নয়। কাজেই কোনও দিক থেকে গ্রন্থকারের যোড়শ বিলাসে বর্ণিত ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করা যায় না।

প্রেমবিলাসের এই দুই ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস-নরহরি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিশেষ মনোভাব লক্ষ্য করার বিষয়। উভয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসের কাছে জাহ্নবাদেবী ও বীরচন্দ্রের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করছেন মাত্র। শ্রীনিবাসাচার্যের উপর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের প্রভাবের ঘটনা সর্বজনবিদিত। কাজেই তাকে গ্রন্থকার একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য হলো শ্রীনিবাসাচার্যের উপর নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখানো। হয়তো সেজন্য তিনি সর্বজনবিদিত ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক কাহিনী সংযোজন করে নরহরি সরকার ঠাকুর, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ও অন্যান্য সকলের উপর জাহ্নবাদেবী ও বীরভদ্রের প্রভাব কতখানি ছিল তা' দেখাতে চেয়েছেন।

প্রেমবিলাসের ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতেই এত স্পষ্ট যে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে এই গ্রন্থখানিকে এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিচারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেজন্য এই গ্রন্থের পরস্পরবিরোধী বিবরণ ও অনৈতিহাসিক ঘটনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এখানে এই গ্রন্থের যে বিবরণ দুটি নিয়ে আলোচনা করা হলো সেই বিবরণ দুটির বিচারে অন্ততঃ একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে গ্রন্থকার কখনই আচার্যের সমসাময়িক ছিলেন না। কারণ সমসাময়িক কোন লেখকের রচনায় এত ইতিহাসবিরুদ্ধ বিবরণ থাকতে পারে না।

শ্রীনিবাসের চৈতন্য-অনুরাগ—ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের বিবরণ যতটুকু পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় সেসময়ে এদেশে যে কয়জন বৈষ্ণব প্রেমভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর প্রথম জীবনে এঁরা সংখ্যায় খুব অল্প ছিলেন বলে বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে তিনি নিজের মনোভাব প্রকাশ করতেন না।৩৪ নিজের মনোভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করলেও এই বৈষ্ণবসমাজের সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ হলো কেশবভারতীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়।৩৫ পরবর্তীকালে নীলাচলে চৈতন্যদেবকে দর্শন করে দেশে ফিরে আসার পর তিনি নিয়মিত কীর্তন করতেন বলেও এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে।৩৬ মনে হয় সে সময়ে তাঁর কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁর সহধর্মী হলেও বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা কম ছিল না।৩৭

শ্রীনিবাসের মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীও প্রেমভক্তিপথে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় শ্রীনিবাস যখন প্রথম কথা বলতে শেখেন সেসময় তিনি পুত্রকে দিয়ে চৈতন্যদেবের ও তাঁর পরিকরদের নাম বলাতেন এবং তাঁর মুখে আধো আধো উচ্চারণে এঁদের নাম শুনে আনন্দ পেতেন।৩৮

বাড়িতে পিতামাতার প্রভাব এবং বাইরে চৈতন্যদাসের সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষ আদি চৈতন্য পরিকর ও ভক্তদের বাড়ি যাতায়াত—এসবের মধ্য দিয়ে শৈশবকাল থেকে শ্রীনিবাসের চৈতন্যদেবের দিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। সেসময়ে চৈতন্যদাসের কাছে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা কাহিনী এবং তাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যদাসের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও শুনতেন।৩৯ ভক্তিরত্নাকরের এসব বিবরণ কতখানি ইতিহাসসম্মত তা' বলা কঠিন। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে এগুলোকে অযৌক্তিক বলা চলে না, কারণ এরকম একটি পরিবেশে আশৈশব বড় হয়ে উঠেছিলেন বলে তিনি প্রথম সুযোগে চৈতন্যদেবকে দর্শন করার জন্য নীলাচল অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগ ও চাকন্দি গ্রাম ত্যাগ—শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে যা উল্লেখ আছে তাতে মনে হয় তাঁর শৈশবেই পিতৃবিয়োগ

---

৩৪. ভ. র. ২।২৩০-৩৬। ৩৫. ঐ ২।২২২-২৪। ৩৬. ঐ ২।১৪৭-৪৮। ৩৭. ঐ ২।১৪৯।

৩৮. ভ. র. ২।১৭৬-৮১। ৩৯. ঐ ২।২২৭-৩৫৯।

হয়েছিল। এই বিবরণানুসারে দেখা যায় গৌরগুণে মগ্ন শ্রীনিবাস তাঁর পিতামাতার সেবায় দিন কাটাচ্ছিলেন। চাকন্দি গ্রামের সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। এমন সময় "কতদিনে পিতার হইল পরলোক।"[৪০] এসময়ে শ্রীনিবাসের বয়স কত ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে এটি তাঁর নীলাচলে যাওয়ার আগের ঘটনা। সেজন্য অনুমান করা যায় তাঁর বয়স ১৪।১৫ বৎসর হওয়ার পূর্বেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তবে এর খুব বেশী আগে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয় না। কারণ এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পুত্রের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছেন।[৪১] কমপক্ষে ১৩।১৪ বৎসর বয়স না হলে মাতা পুত্রের সঙ্গে এসব আলোচনা করতে পারেন না। কাজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, শ্রীনিবাসের বয়স যখন প্রায় ১৩।১৪ বৎসর, সেসময়ে তাঁর পিতা চৈতন্যদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশ্য 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণ যদি সত্য হয়।

পিতৃবিয়োগের পর শ্রীনিবাস ও তাঁর মা লক্ষ্মীপ্রিয়া চাকন্দি গ্রামের বাস তুলে নিয়ে যাজিগ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এ প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে পিতার মৃত্যুর পর শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যাজিগ্রামে বাস করা স্থির করলেন। যাজিগ্রামবাসীরাও পিতৃহীন বালককে সানন্দে তাদের গ্রামে বাস করার বন্দোবস্ত করে দিল।[৪২]

শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগ সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুদিনের মধ্যে চৈতন্যদাসের জ্বর হয় এবং সাতদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪৩] ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে আমরা ইতিপূর্বে অনুমান করেছি শ্রীনিবাস অতি বাল্যে একবার নরহরি সরকার ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এই বিবরণ থেকে আরও অনুমান করা যায় যে এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাঁদের পরবর্তী জীবনের যোগাযোগের কোনও সম্পর্ক নেই। তার পরের বিবরণ অনুযায়ী শ্রীনিবাস ক্রমশঃ বড় হচ্ছেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পিতার মুখে তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনছেন। এভাবে কাল অতিবাহিত হওয়ার পর কিছুকাল বাদে তাঁর পিতৃবিয়োগ হলো। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত এই দুই ঘটনার মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান আছে বলে মনে হয়।

[৪০] ঐ ৩।১৮। [৪১] ঐ ৩।২০। [৪২] ঐ ৩।১৯-২১। [৪৩] প্রে. বি. ৪র্থ বি.।

সরকার ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীনিবাসের বয়স খুব অল্প ছিল বলে আমরা ইতিপূর্বেই অনুমান করেছি। তারপর দেখেছি তাঁর প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। কাজেই এই দুই ঘটনার মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান বর্তমান একথা সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়। সেইদিক থেকে বিচার করলে প্রেমবিলাসের বক্তব্যকে স্বীকার করা কঠিন। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় কিছু ইতিহাস-বিরুদ্ধ ঘটনার বিবরণ পেয়েছি। কাজেই এই প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসের বিবরণকেও স্বীকার করা যায় না।

প্রেমবিলাসের এই বিবরণকে স্বীকার না করার আরও কারণ আছে। এই গ্রন্থের বিবরণে মনে হয় শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরহরি ঠাকুরের প্রথম থেকেই যোগাযোগ ছিল। শ্রীনিবাসের যে বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল সেই বয়সে বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও বালকের এই ধরণের যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়— বিশেষতঃ যে পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং তাঁদের আদরযত্নে পালিত হচ্ছে। সেইজন্য যখন প্রেমবিলাসে দেখা যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং তারই প্রস্তুতিস্বরূপ পিতৃবিয়োগের পর সরকার ঠাকুরের পরামর্শে মাকে যাজিগ্রামে রাখার কথা চিন্তা করছেন[৪৪] —তখন এই বিবরণকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকার করা কঠিন হয়।

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের মাতুলালয় ছিল একথা ভক্তিরত্নাকরে গোড়া থেকেই এত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তারপর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাজিগ্রামে বসবাস করতে চাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। লক্ষ্মীপ্রিয়াও অভিভাবকহীন অবস্থায় নাবালক পুত্রকে নিয়ে পিত্রালয়ের কাছে থাকতে চাইবেন—একথাও যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায়। একাজে মাতুলালয়ের সহায়তায় শ্রীনিবাস যাজিগ্রামবাসীদের সাহায্য পাবেন—একথাও অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে এসে বাস করার পেছনে যে এতখানি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে সে কথা বলা নেই। এই গ্রামে যে তাঁর মাতুলালয় ছিল তাও বলা নেই। সেক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে তিনি চাকন্দির বাস তুলে এখানে বসবাস স্থাপন করলেন তা' বলা হয় নি।

[৪৪] প্রে. বি. ৪র্থ বি.।

যাজিগ্রামে বসবাসের জন্য বালক শ্রীনিবাস গ্রামের জমিদারের সাহায্য পেয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে।[৪৫] পিতৃবিয়োগের সময় শ্রীনিবাসের বয়স ১৩।১৪ বৎসর ছিল বলে আমরা ইতিপূর্বে অনুমান করেছি। এই বয়সের বালক একা জমিদারের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলো এবং জমিদারও বালকের প্রস্তাবে সম্মত হলেন—একথা স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকার করা কঠিন। এসব কারণে প্রেমবিলাসে বর্ণিত শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগ ও চাকন্দি গ্রাম ত্যাগ করে তাঁদের যাজিগ্রামে বসবাস করা সম্বন্ধে যেসব বিবরণ দেওয়া আছে তাকে ইতিহাস-সম্মত বলে স্বীকার করা যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গমন—শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথম জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নীলাচল গমন। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তৃততর বিবরণ নানা রচনায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে আচার্যের শিষ্যদ্বয়ের রচনায় এই ঘটনার উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু পরবর্তীকালের রচনাগুলিতে নানা ঘটনা সন্নিবেশিত হয়ে এই বিবরণ ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করেছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গমনের সংক্ষিপ্ততম বিবরণ পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে ধৃত শ্রীনিবাসশিষ্য এবং অষ্ট কবিরাজের অন্যতম নৃসিংহ কবিরাজ কৃত একটি শ্লোকে। এই শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্য নীলাচল গমনে ইচ্ছুক হলে চৈতন্যদেবের তিরোধান-সংবাদে তিনি অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে প্রকৃতই সে সময়ে নীলাচল গিয়েছিলেন এমন কোনও তথ্য এই শ্লোকে পাওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তী এছাড়া তাঁর এমন কোন শ্লোক উদ্ধৃত করেন নি যা থেকে জানা যেতে পারে যে শ্রীনিবাস প্রকৃতপক্ষে সেবার নীলাচল গিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের অপর শিষ্য এবং অষ্ট কবিরাজের অন্যতম কর্ণপূর কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকে পূর্বোক্ত রচনা থেকে বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায় শ্রীনিবাস নীলাচলে যাওয়ার পথে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। সেই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে তিনি গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল গিয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত গোস্বামীর শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁর সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি। তবে তাঁর সহায়তায় তিনি দেশে ফিরে এসে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর পরামর্শানুযায়ী বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করেন।

[৪৫] প্রে. বি. ৪র্থ বি.

অনুরাগবল্লীর বিবরণ কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণের অনুরূপ কিন্তু আরও বিস্তৃত। পূর্বোক্ত রচনাদ্বটির সঙ্গে এর বিবরণের কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। মনোহর দাসের বিবরণে দেখা যায় গদাধর পণ্ডিতই শ্রীনিবাসাচার্যকে বৃন্দাবন যাওয়ার কথা প্রথম বলেছিলেন এবং তিনিই প্রথম শ্রীনিবাসকে গোপালভট্টের কথা বলেন। রঘুনাথ দাসের বৃন্দাবনে উপস্থিতির কথাও এই গ্রন্থে পণ্ডিত গোস্বামীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। এছাড়া এই গ্রন্থে আচার্যের নীলাচল যাত্রা প্রসঙ্গে আরও কিছু নূতন ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ, বলা বাহুল্য, কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণের অনুরূপ। তবে এই গ্রন্থের বিবরণ অনুরাগবল্লী অপেক্ষা দীর্ঘ এবং নানা তথ্যে সমৃদ্ধ। এই রচনায় দেখা যায় নীলাচলে অবস্থানকালে আচার্য চৈতন্য-পরিকরদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদলাভ করেছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল ভ্রমণের বিবরণে একটু নূতনত্ব আছে। নরহরি চক্রবর্তীর মতে আচার্য গদাধর পণ্ডিতের নির্দেশক্রমে একবার ফিরে এলেও দ্বিতীয়বার নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান-বার্তা পেয়ে ফিরে আসেন। একথা পূর্ববর্তী কোনও রচনায় পাওয়া যায় নি। তবে নরহরি চক্রবর্তীর ইতিহাস-সচেতনতার যে পরিচয় তাঁর গ্রন্থে আমরা পাই তাতে তাঁর প্রদত্ত এই সংবাদটির গুরুত্ব উপেক্ষা করার মতো নয়।

প্রেমবিলাসের বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরের অনুরূপ। তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রথমতঃ শ্রীনিবাস-শিষ্যদ্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা—নীলাচলের পথে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদ—গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নি, কিংবা সে সম্বন্ধে নিজেও কিছু বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের দ্বিতীয়বার নীলাচল যাত্রার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বলা হয় নি। এখানে তার উপযুক্ত কারণ দর্শানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর বিভিন্ন ঘটনাবলীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে নৃসিংহ ও কর্ণপূর কবিরাজের রচনাদ্বটির গুরুত্ব পরবর্তীকালে রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির তুলনায় অনেক বেশী, কারণ এগুলি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদ্বয় কর্তৃক রচিত। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালের গ্রন্থকাররা আচার্যের জীবনী রচনাকালে এঁদের প্রদত্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন। কাজেই শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গমন-সম্বন্ধীয় ঘটনা-

বলীর সত্যাসত্য-নির্ণয়কালে তাঁর শিষ্যদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিচার করে দেখতে হবে পরবর্তী জীবনীকাররা আচার্যের নীলাচল ভ্রমণ সম্বন্ধে কতখানি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। প্রথমে নৃসিংহ কবিরাজের রচনা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল যাত্রার সংক্ষিপ্ততম বিবরণ পাওয়া যায় নৃসিংহ কবিরাজের একটি শ্লোকে। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির অর্থ হলো শ্রীনিবাস পুরুষোত্তমে যেতে ইচ্ছুক হলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদ পেয়ে শোকে দুঃখে বারংবার মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। ভক্তের ব্যথায় চৈতন্যদেব ব্যথিত হয়ে তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আশ্বাসবাক্য বললেন।[৪৬]

হরিদাস দাস বাবাজীর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-গ্রন্থমালায় আচার্যের অপর একজন বিশিষ্ট শিষ্য কর্ণানিধি চট্টরাজ বিরচিত বলে যে নয়টি শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য শ্লোকটি তাঁর দ্বিতীয় শ্লোক। আসলে এই ন'টি শ্লোকই নৃসিংহ কবিরাজের রচনা হওয়া সম্ভব; এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এই রচনার তৃতীয় শ্লোকে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় শ্লোকের জের স্বরূপ চৈতন্যদেবের স্বপ্নদত্ত আশ্বাসবাণীকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই তৃতীয় শ্লোকের বক্তব্য হলো—তুমি আমার নিজ শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি শীঘ্র বৃন্দাবন যাও। সেখানে রূপজীবাদি কৃতীপুরুষেরা আছেন। আমি পূর্বেই তাঁদের গ্রন্থরাশি তোমাকে অর্পণ করতে আদেশ দিয়েছি। তুমি নিঃসন্দেহে সেগুলো গ্রহণ করে গৌড়দেশের জনগণকে শিক্ষা দাও।[৪৭] এর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্য এই আদেশ প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং সেখানে কৃতিত্ব অর্জন করে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

এই রচনাতে এমন কোনও উল্লেখ নেই যা থেকে বোঝা যায় শ্রীনিবাসাচার্য প্রকৃতপক্ষে নীলাচল গমন করেছিলেন। হরিদাস দাস বাবাজীর গ্রন্থে ধৃত এই রচনা বিশ্লেষণে একথাই মনে হয় যে বৃন্দাবন গমন শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈতন্যদেবের স্বপ্নাদেশ থেকে অনুমান করা যেতে পারে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল-গমনের ইচ্ছা তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার পথ সুগম

---

৪৬. ভ. র. ৩।৭৮।   ৪৭. শ্রীনি. গ্র. পৃ ২০।

করেছিল মাত্র। যদিও এই কার্য কারণ সম্পর্কটি আলোচ্য সংক্ষিপ্ত রচনা থেকে অনুমান করা কঠিন।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় পূর্বোক্ত রচনার সুর বর্তমান, তবে বর্ণনা বিস্তৃততর। এই বিস্তৃত বর্ণনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বর্ণনার সঙ্গে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। কর্ণপূর রচিত গুণলেশসূচকের দ্বিতীয় শ্লোকেই এই পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে বলা হয়েছে পুরুষোত্তম যেতে যেতে পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গোপনবার্তা শুনে শ্রীনিবাস মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেকে করাঘাত করতে লাগলেন। তারপর চৈতন্যদেবের চরণ হৃদয়ে ধারণ করে তিনি নীলাচল গমন করলেন।৪৮

এখানে দেখা যাচ্ছে আচার্যের নীলাচল যাওয়ার ইচ্ছার কথা না বলে সোজাসুজি তাঁর নীলাচল যাত্রার কথা বলা হয়েছে। নৃসিংহ কবিরাজের রচনা থেকে যদি ধরে নেওয়া যায় যে শ্রীনিবাস শুধুমাত্র নীলাচল যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন মাত্র, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে তিনি দেশে অবস্থানকালে চৈতন্যদেবের তিরোধান বার্তা পেয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজের রচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদ পেয়েছিলেন। অর্থাৎ কর্ণপূর কবিরাজের মতে শ্রীনিবাসাচার্য শুধু নীলাচল যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না তিনি যাত্রাও করেছিলেন। এই শ্লোকে তাঁর নীলাচল গমনের কথা যা বলা হয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময়ের কথা তা' কবিরাজের পরবর্তী শ্লোকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনা থেকে আরও একটি তথ্য পাওয়া যায় যা হরিদাস দাস বাবাজী প্রদত্ত কলানিধি চট্টরাজের রচনায় পাওয়া যায় না। এই রচনায় শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গমনের ইচ্ছা সম্বন্ধে কোনও কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় এই কারণ বলা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠ করা।৪৯ এই রচনা থেকে আরও জানা যায় যে পণ্ডিত গোস্বামীর শারীরিক অবস্থা দৃষ্টে তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয় নি। তবে তাঁর নির্দেশমত আচার্য দেশে

[illegible] ৪৯. ঐ [illegible] শ্লোক

ফিরে এসে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি আচার্যের বৃন্দাবন যাত্রার পরামর্শ দেন।[৫০]

ঘটনার বিশদ বর্ণনায় শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদ্বয়ের রচনায় কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল ঘটনা সম্বন্ধে এঁরা দুজনে একমত। এই ঘটনাটি হলো শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল যাওয়া। তিনি যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় যাত্রা করেছিলেন সে বিষয়েও এঁরা দুজনে একমত। তাঁর তিরোধানকালের সাহায্যে অনায়াসে বলা যেতে পারে শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোনও সময়ে নীলাচল যাত্রার ইচ্ছা করেছিলেন কিংবা নীলাচলের পথে ছিলেন। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজেব রচনায় তাঁব নীলাচল গমনের কারণ সম্বন্ধে এবং সেখানে তাঁর ব্যর্থমনোরথ হওয়া সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে সন্দেহ হয় যে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি কি ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল যাত্রা করেছিলেন? এসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার আগে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও তথ্যাবলীর বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

শ্রীনিবাসাচার্যেব নীলাচল গমনের যে সময় পাওয়া যাচ্ছে এবং সে সময়ে তাঁর নীলাচল গমনের যে উদ্দেশ্য কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় ব্যক্ত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে দেখতে হবে এই সময়ে তাঁর বয়স কত ছিল এবং তখন ভাগবত পাঠের কিংবা তার ব্যাখ্যা শোনার মতন উপযুক্ত বয়স ছিল কি না। তারপর দেখা দরকার এসময়ে ব্যর্থমনোরথ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কি না।

আগেই দেখা গিয়েছে শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৩৩ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ নীলাচলের পথে ছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে তিনি ১৫১৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই হিসাবে নীলাচল যাত্রার সময় তাঁর বয়স ১৪ বৎসরের বেশী ছিল না। এবয়সে গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত শোনার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়, বরং জ্ঞান হওয়া অবধি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা কথা শুনে তাঁকে দর্শন করার আগ্রহাতিশয্যে নীলাচল রওনা হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে চৈতন্যদেবকে দর্শন করার আগ্রহে, নীলাচল অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন তার সমর্থন তাঁর শিষ্যদ্বয়ের রচনায় পাওয়া যায়। তাঁকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে নীলাচল যাত্রা করেছিলেন বলে পথিমধ্যে তাঁর

তিরোধানের সংবাদে শ্রীনিবাস এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আশাহত শ্রীনিবাসের যে বর্ণনা তাঁর শিষ্যদ্বয় দিয়েছেন মানসিক অস্থিরতার সেই প্রকাশ এ বয়সের বালকের পক্ষেই সম্ভব। সেদিক থেকে শিষ্যদ্বয়ের বক্তব্যকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। এসময়ে তাঁর ভাগবত পড়ার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

এখন সমস্যা থেকে যায় শ্রীনিবাসাচার্যের ভাগবত পড়া এবং এবিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে নীলাচল থেকে ফিরে আসা সম্বন্ধে। ব্যর্থ হওয়ার কারণস্বরূপ কর্ণপূর কবিরাজ বলেছেন যে বৃদ্ধ গদাধর পণ্ডিতের চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়েছিল।[৫১] ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে গদাধর পণ্ডিতের বৃদ্ধ হয়ে পড়ার কোনও কারণ আছে কি না বিচার করে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর বয়স সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। কাজেই শ্রীনিবাসাচার্যের ভাগবত পাঠ সম্বন্ধে ব্যর্থমনোরথ হওয়া সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে গদাধর পণ্ডিতের জন্মকাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে হবে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় একদিন শচী ঠাকুরানী শিশু গদাধর ও জগদানন্দকে কোলে করে গৃহে প্রবেশ করলে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক চৈতন্যদেব তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন গদাধরকে প্রতিপালন করেন এবং যজ্ঞসূত্র দান করেন।[৫২] এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে জগদানন্দ ও গদাধর সমবয়সী ছিলেন। জগদানন্দ পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ছাত্র ছিলেন।[৫৩] কাজেই তিনি চৈতন্যদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের বয়সের পার্থক্য ৫।৬ বৎসরের কম হওয়া সাধারণত দেখা যায় না। কাজেই চৈতন্যদেব ও জগদানন্দের বয়সের পার্থক্য ৫।৬ বৎসর ধরে নিলে চৈতন্যদেব ও গদাধর পণ্ডিতের মধ্যে বয়সের এতটা পার্থক্য ধরে নেওয়া যেতে পারে।

জয়ানন্দের এই তথ্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার পক্ষে যুক্তি আছে। প্রথমতঃ তিনি চৈতন্যদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের তিরোধানকালে তাঁর বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর ছিল বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫৪] তাছাড়া তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে, কারণ প্রথমতঃ তিনি তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশ ভণিতায় গদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ যদুনাথদাসের

---

[৫১] গু. লে. সূ. ৩য় শ্লোক। [৫২] চৈ. ম. নদীয়া ২৯।৫। [৫৩] চৈ. চ. ৩।৪

[৫৪] চৈ. ম. ভূমিকা—পৃ. ৪০, ৪৪।

‘শাখানির্ণয়ামৃতে’ গদাধর শাখায় জয়ানন্দের নাম পাওয়া যায়।[৫৫] কাজেই চৈতন্যমঙ্গলে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

জয়ানন্দের বিবরণ থেকে আমরা গদাধর পণ্ডিতের বয়স সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এসেছি চৈতন্যভাগবতের কয়েকটি বিবরণ থেকেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারি। এই গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের গয়া যাওয়ার আগে। সে সময়ে ঈশ্বরপুরী একবার নবদ্বীপে এসে কিছুকাল ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ঈশ্বরপুরী স্নেহ করতেন এবং স্বরচিত কৃষ্ণলীলামৃত পড়াতেন।[৫৬] এই বিবরণ থেকে তাঁর সঠিক বয়স সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও অনুমান করা যায় যে এসময়ে তাঁর বয়স চোদ্দ বৎসরের উর্ধ্বে হবে কারণ তার চেয়ে কম বয়সের কোনও বালককে কৃষ্ণলীলামৃত পড়িয়ে ঈশ্বরপুরীর মতন ভক্ত আনন্দ পেতেন না।

চৈতন্যভাগবতের পরবর্তী বিবরণে দেখা যায় গয়া থেকে ফিরে এসে চৈতন্যদেব যখন উন্মত্তপ্রায় হয়ে আছেন গদাধর পণ্ডিত তখন সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এসময় অদ্বৈতাচার্য একদিন চৈতন্যদেবের পাদবন্দনা করলে গদাধর পণ্ডিত তাঁকে হেসে বলেছিলেন “বালকেরে গোসাঞি এমন না জুয়ায়।” আচার্যও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন “গদাধর বালক জানিবা কথোদিনে।”[৫৭] এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় গদাধর পণ্ডিত খানিকটা প্রাপ্তবয়স্ক।

চৈতন্যভাগবতের যে দুটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে গদাধর পণ্ডিতের সে সময় এতটা বয়স হয়েছে যে ঈশ্বরপুরীর মতন ভক্ত সন্ন্যাসীর কাছে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করতে পারেন এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তাঁকে সর্বদা সঙ্গদান করতে পারেন এবং অদ্বৈতাচার্যের কাছে প্রশ্রয়ও পেতে পারেন। এসব থেকে তাঁর তখনকার বয়স কমপক্ষে পনেরো বৎসর অনুমান করা গেলেও বয়সের উর্ধতম সীমা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এই গ্রন্থে বর্ণিত অপর একটি ঘটনার বিবরণ থেকে এই উর্ধতম সীমা সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে।

---

৫৫. ঐ পৃ. ৪১। ৫৬. চৈ. ভা. ১।৭। ৫৭. ঐ পৃ. ২।২।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যদেব যখন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় আছেন তখন শচীদেবীও পুত্রের আচরণে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। এসময়ে তিনিও পুত্রকে সামলাতে পারতেন না। এরকম এক সময়ে গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে কৌশলে শান্ত করলে শচী দেবী আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিন্তা করলেন—" 'এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি।' আমি ভয়ে এর সম্মুখীন হতে পারি না, অথচ 'শিশু হই দেখ প্রবোধিল ভালমতে'।"[৫৮] এরপর শচীদেবী গদাধরকে সর্বদা চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনিও এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় শচীদেবী গদাধর পণ্ডিতকে 'শিশু' বলে চিন্তা করছেন। পনেরো-ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কোনও কিশোরকে মাতৃতুল্যা কোনও মহিলা শিশু বলতে পারেন। কাজেই চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে আমরা অনুমান করতে পারি গদাধর পণ্ডিতের বয়স এসময় উর্ধ্বপক্ষে ষোল বৎসর ছিল।

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত প্রথম ঘটনা দুটি থেকে আমরা আলোচ্য সময়ে গদাধর পণ্ডিতের নিম্নতম বয়স পনেরো বৎসর স্থির করছি এবং আলোচ্য ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁর বয়স উর্ধ্বপক্ষে ষোল বৎসরের বেশী হতে পারে না। অর্থাৎ গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় চৈতন্যদেবের বয়স যখন ছিল বাইশ বৎসর তখন গদাধর পণ্ডিতের বয়স ষোল বৎসরের বেশী নয়। কাজেই চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকেও দেখা যাচ্ছে এঁদের দুজনের বয়সের পার্থক্য ছয় বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়।

গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেব অপেক্ষা কমপক্ষে ছয় বৎসরের ছোট হলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় তাঁর বয়স ৪২।৪৩ বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। এই বয়সের কোনও ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিহীন হলেও বৃদ্ধ হতে পারেন না। কাজেই কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে শ্রীনিবাসাচার্য একবার নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেও অথবা সেবার নীলাচল গিয়ে থাকলেও এসময়ের অনেক পরে গদাধর পণ্ডিত যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন তখন তিনি ভাগবত পড়ার বাসনা নিয়ে আবার নীলাচল গিয়েছিলেন।

---

[৫৮] চৈ. ভা. ২।২।

প্রশ্ন উঠতে পারে কর্ণপূর কবিরাজের আলোচ্য শ্লোকের "জরতঃ" শব্দের ওপর নির্ভর করে গদাধর পণ্ডিতকে বৃদ্ধ বলে ধরে নেওয়ার কারণ কি ? শোকেও মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এখানে সে অর্থেও তাঁকে "জরতঃ" বলা হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কর্ণপূর কবিরাজের রচনার ষষ্ঠ শ্লোক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্য যখন গদাধর পণ্ডিতের পত্র নিয়ে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর কাছে তা শুনে গদাধর দাস মন্তব্য করেছিলেন তিনি (অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত) স্মৃতিহীন, দুর্বলমতি ও শোকদুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। শোক দুঃখে জরাগ্রস্ত হলেও সকলে স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি হয়ে পড়েন না। সাধারণতঃ এগুলি বার্ধক্যের লক্ষণ। কাজেই আচার্যের বৃদ্ধ গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে আসার কাল চৈতন্যদেবের তিরোধানের কালের অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা বলে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া বয়সের বিচারেও আমরা দেখেছি যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় শ্রীনিবাসাচার্যের বয়স যা ছিল সেই বয়সে ভাগবত পাঠের এমন অত্যুগ্র আগ্রহ থাকতে পারে না যার জন্য নীলাচল আসার উৎসাহ থাকতে পারে। কাজেই এই দুটি ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের পার্থক্য আছে একথা স্বীকার করা যেতে পারে।

শ্রীনিবাসাচার্য যে কৈশোরে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় একবার নীলাচল যাত্রা করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এবিষয়ে তাঁর দুই শিষ্য সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তবে নৃসিংহ কবিরাজ তাঁর নীলাচল-যাত্রা না বলে যাওয়ার ইচ্ছার কথা বলেছেন এবং কর্ণপূর কবিরাজের মতে তিনি শুধু ইচ্ছাই করেন নি—রওনাও হয়েছিলেন। এই দুই বর্ণনা থেকে একথা অনুমান করা যায় কৈশোরে শ্রীনিবাসাচার্য চৈতন্যদেবকে দেখার আগ্রহে একবার নীলাচল অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি প্রকৃতপক্ষে নীলাচল পৌঁছেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। তবে তিনি পরবর্তীকালে ভাগবত পড়ার বাসনা নিয়ে নীলাচল উপস্থিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অনুরাগবল্লীতে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল যাত্রা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কবিরাজের বর্ণনার বিশ্লেষণে আচার্যের দুবার নীলাচল গমনের মধ্যে যে ব্যবধান পাওয়া যায়, মনোহর দাস তা লক্ষ্য না করে থাকায় তাঁর রচনায় কিছু অসঙ্গতি নজরে পড়ে। এছাড়া তিনি প্রচলিত কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে এমন কয়েকটি ঘটনা এর সঙ্গে

সংযোজিত করেছেন যার ফলে তাঁর বর্ণিত শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল-ভ্রমণ পর্বটি বাস্তবানুগ হয় নি।

অনুরাগবল্লীর দ্বিতীয় মঞ্জরীতে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে চৈতন্যদেব তখনও প্রকট আছেন শুনে "মহাপ্রভুর চরণ শরণ" ও ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে সকলের অনুমতি নিয়ে তিনি নীলাচল অভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যে চৈতন্যদেবের তিরোধানবার্তা শুনে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। পরে একটু স্থির হয়ে ঠিক করলেন জগন্নাথ দর্শন ও চৈতন্যপরিকরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি নীলাচল যাবেন। সেখানে পৌঁছে তিনি চৈতন্য-বিরহে কাতর গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাগবত পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গদাধর পণ্ডিত পুথি খুলে দেখালেন যে চৈতন্যদেবের প্রেমাশ্রুতে বহুস্থানে অক্ষর লুপ্ত হওয়ায় পুথিটি পাঠের অনুপযুক্ত হয়েছে। তিনি তখন শ্রীনিবাসাচার্যকে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপসনাতনের শরণ নিতে উপদেশ দিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানালেন যে দক্ষিণদেশ থেকে গোপালভট্ট বৃন্দাবন গিয়েছেন এবং স্বরূপ দামোদরের দেহত্যাগের পর রঘুনাথদাসও সেখানে আছেন। এরপর পণ্ডিত গোস্বামী দেশে ফিরে গিয়ে গদাধর দাসকে একটি প্রহেলী বলতে আদেশ করলেন। সেটি হলো "মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী।" এরপর শ্রীনিবাস সেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করে দেশে ফিরে এলেন।

মনোহরদাসের এই বিবরণ পাঠে অনুমান করা যায় যে তিনি কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ বিশ্লেষণ করে শ্রীনিবাসাচার্যের দুবার নীলাচল গমনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান উপলব্ধি না করতে পারায় তাঁর বিবরণে অসামঞ্জস্য রয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেব-দর্শন এবং ভাগবত পাঠ এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীনিবাসাচার্য যদি একবারই নীলাচল গিয়ে থাকেন তবে সে সময়ে তাঁর যে বয়স হওয়া উচিত, সে বয়সকে স্বীকার করে নিলে তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন। কাজেই মনোহরদাসের এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাগবত পড়ার কথায় পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্যকে বৃন্দাবন যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে এই গ্রন্থে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটি নূতন সংযোজন। ইতিপূর্বে একথা আমরা কোথাও পাইনি। বরং দেখা যায় কর্ণপূর কবিরাজ এপ্রসঙ্গে অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসকে দেশে গিয়ে গদাধর দাসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং তিনিই শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন

যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দুই বর্ণনার মধ্যে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনোহরদাসের বিবরণকে অস্বীকার করতে হয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গমন প্রসঙ্গে মনোহরদাসের আরও কয়েকটি বিবরণ ইতিহাসসম্মত বলে স্বীকার করা যায় না। তার মধ্যে স্বরূপ দামোদরের প্রসঙ্গ অন্যতম। এই বিবরণানুযায়ী শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নীলাচলে এসে দেখলেন স্বরূপ দামোদর গত হয়েছেন এবং রঘুনাথ দাস বৃন্দাবন গমন করেছেন। এই বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে স্বীকার করতে হয় চৈতন্যদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপদামোদর পরলোক গমন করেছিলেন। বস্তুতঃ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবাচারদর্পণে এরকম কথাই লিখেছেন।[৫৯] কিন্তু চৈতন্য-তিরোধানের পরও যে স্বরূপ দামোদর কিছুকাল জীবিত ছিলেন তা স্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রমাণ স্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের একস্থানে গ্রন্থকার বৃন্দাবনে এসে রূপসনাতন, রঘুনাথভট্ট ও স্বরূপের আশ্রয়লাভ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬০] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে গ্রন্থকার স্বরূপের তত্ত্বগত আশ্রয়ের কথা বলেছেন।[৬১] কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্য বিশ্লেষণে মনে হয় তিনি এঁদের সাক্ষাৎ আশ্রয়ের কথাই বলেছেন। একথা মনে করার প্রথম কারণ হলো স্বরূপ ছাড়া অপর যে তিনজনের নাম তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন তাঁরা বহুদিন থেকে বৃন্দাবনে ছিলেন কাজেই এখানে এসে কৃষ্ণদাস এঁদের আশ্রয় লাভ করেছিলেন একথা স্বীকার করা যায়। সেইসঙ্গে যখন স্বরূপের উল্লেখ আছে তখন স্বীকার করতে হবে এঁদের সঙ্গে তিনি স্বরূপের আশ্রয়ও লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যদি তত্ত্বগত আশ্রয়ের কথা স্বীকার করতে হয় তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে ছয়জন বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীর ঋণ স্বীকার করেছেন সেখানে স্বরূপের নামের উল্লেখ থাকার কথা। সেখানে এই নামের উল্লেখ না করে যখন কৃষ্ণদাস আশ্রয়লাভ-প্রসঙ্গে গোস্বামীদের সঙ্গে স্বরূপের নামের উল্লেখ করেছেন তখন একে তত্ত্বগত আশ্রয় না বলে সাক্ষাৎ আশ্রয় ও আশীর্বাদ লাভ বলে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত গ্রন্থে এসম্বন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৬২]

---

৫৯. চৈ. প. ২৬৭ পৃ.। ৬০ চৈ. চ. ১।৫। ৬১. চৈ. চ. উ. —পৃ. ৩০৯। ৬২. স. মু. বা. সা. ত. কা. —পৃ. ২০২-৩।

আমাদের এই অনুমানের সমর্থনে ডঃ সুশীলকুমা’ দের বক্তব্যও উল্লেখ করা যায়। তিনি রঘুনাথ দাস রচিত মুক্তাচরিতের চতুর্থ শ্লোক থেকে অনুমান করেছেন যে স্বরূপদামোদর তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কড়চাখানি এখানে বসেই রচনা করেছিলেন।[৬৩] ডঃ দে মুক্তাচরিত থেকে যা অনুমান করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের আলোচ্য অংশ থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রঘুনাথ দাস তবে এসময়ে কোথায় ছিলেন? বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে রঘুনাথ দাস “ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন।”[৬৪] এই ছত্র দুটি থেকে সকলেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর স্বরূপ ও রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন। সেখানে স্বরূপের তিরোধানের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবন আসেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই ছত্র দুটির এরূপ ব্যাখ্যা করে তাঁর বৃন্দাবনে অবস্থিতির কথা অগ্রাহ্য করেছেন।[৬৫] কিন্তু কবিরাজের উক্তি দুটি যে পরস্পর-বিরোধী নয় তা' একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা চলে যে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর স্বরূপ দামোদর বৃন্দাবন চলে যান কিন্তু রঘুনাথ দাস নীলাচলে ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বরূপ বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করলে রঘুনাথ বৃন্দাবন চলে আসেন।

মনোহরদাসের বিবরণের অপর অসঙ্গতি হলো শ্রীনিবাসাচার্যের চরিত্র। এখানে তিনি তাঁর যে চরিত্রচিত্রণ করেছেন তাকে ইতিহাসসম্মত বলা চলে না। গ্রন্থকারের বিবরণে দেখা যাচ্ছে ভাগবত পাঠে উৎসুক শ্রীনিবাস যখন বুঝতে পারলেন নীলাচলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না এবং এসম্বন্ধে তিনি যখন পণ্ডিত গোস্বামীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশও পেলেন তখন তিনি কেন নীলাচলে বৃথা কয়েক বৎসর অতিবাহিত করলেন তা' বোঝা গেল না। বরং এবিষয়ে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য। এই বিবরণে দেখা যায় পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গদাধর দাসের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিলে তিনি দেশে ফিরে এসে প্রথমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর পরামর্শে বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

---

[৬৩] E. H. V. F. M. B. পৃ. ৪১। [৬৪] চৈ. চ. ১।১০

[৬৫] চৈ. চ. উ. —পৃ. ৩০৯।

মনোহরদাসের আরও একটি বিবরণ শ্রীনিবাসের চরিত্রের পরিপন্থী। পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গদাধর দাসের উদ্দেশ্যে বলে দিলেন, "মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ওবাড়ী।" এই প্রহেলী পৌঁছে দেওয়ার ভার পেয়েও তিনি নীলাচলে কয়েক বৎসর কাটিয়ে দিলেন এবং দেশে ফিরে এসে সেই প্রহেলী যথাস্থানে পৌঁছে দিতে ভুলে গেলেন। এই বিবরণ শ্রীনিবাসের চরিত্রানুগ হয় নি। মনে হয় তৎকালে প্রচলিত কোনও কিংবদন্তীকে তিনি বিনা বিচারে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বিচার করে দেখলে তিনি দেখতে পেতেন যে এর মধ্যে কতখানি অসঙ্গতি আছে। প্রথমতঃ শ্রীনিবাস সে সময়ে বালক ছিলেন স্বীকার করে নিলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁকে কেউ ভাগবত পড়ার জন্য বৃন্দাবন যেতে উপদেশ দেবেন না এবং তাঁকে কেউ প্রহেলিকা পৌঁছে দেওয়ার মত দায়িত্বও দেবেন না। আবার শ্রীনিবাস তখন প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলে যদি স্বীকার করা হয় তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে পরবর্তী জীবনে যিনি বিরাট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতন উদ্দেশ্য সফল না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বৃথা কালক্ষেপ করবেন না কিংবা কোনও দায়িত্বভার গ্রহণ করলে তা' পালন করবেন না।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসের নীলাচল ভ্রমণের যে বিবরণ আছে তার মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তবে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ বিশ্লেষণ করে আমরা ইতিপূর্বে শ্রীনিবাসের প্রথম জীবনে দু'বার নীলাচল যাওয়া সম্বন্ধে যা অনুমান করেছি তার সমর্থন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজের সূত্রাকারে বর্ণিত ঘটনাবলীর যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ করতে না পারায় তিনি খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে তাঁর বর্ণনায় মনোহর দাসের বর্ণনার মতন কোনও অবাস্তব ঘটনার বিবরণ নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল গিয়ে চৈতন্যদেবকে দর্শন করার আগ্রহ হওয়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন যে যাজিগ্রামে আসার পর তিনি সর্বদা ভক্তদের সঙ্গে ভক্তিরসে মগ্ন থাকতেন।[৬৬] চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্তদের সর্বদা দেখে, তাঁদের কাছে চৈতন্যলীলা শুনে এবং নীলাচলে তিনি তখনও বর্তমান

---

[৬৬] ভ. র. ৩।২৩-২৫।

আছেন জেনে শ্রীনিবাসাচার্য সেখানে গিয়ে চৈতন্যদেবকে দেখে আসা স্থির করলেন।

নীলাচল যাত্রা সম্বন্ধে মনস্থির করে শ্রীনিবাস প্রথমে গেলেন নরহরি সরকার ঠাকুরের কাছে। তাঁর কাছে নীলাচল যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি সাশ্রুনেত্রে বললেন যে প্রভুর লীলা সঙ্গোপন করার সময় হয়েছে কাজেই তিনি যেন অবিলম্বে যাত্রা করেন। এই বলে "পথের সঙ্গতি কড়ি দিল সেইক্ষণে।"[৬৭]

শ্রীখণ্ড থেকে ফিরে এসে শ্রীনিবাস মায়ের অনুমতি নিয়ে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বহুদূর যাওয়ার পর চৈতন্য-সঙ্গোপন বার্তা শুনে তিনি শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করলেন এবং স্বপ্নে চৈতন্যদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য "নীলাচলে শ্রীনিবাস গেলা কতদিনে।"[৬৮]

নীলাচলে পৌঁছানোর পর শ্রীনিবাস জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে রাত কাটালেন। প্রভাতে উঠে প্রথমে গেলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে। তিনি শ্রীনিবাসের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সকল চৈতন্য-পরিকরের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে শ্রীনিবাস প্রথমে গেলেন বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ীতে। সেখানে তখন সার্বভৌম রায় রামানন্দের সঙ্গে গৌরগুণগানে মত্ত ছিলেন। এরপর শ্রীনিবাস যথাক্রমে বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্দ, শিখি মাহিতি, বাণীনাথ পট্টনায়ক, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্যকে দর্শন করেন। এঁদের সঙ্গে দেখা হলেও স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস ও প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো না। এরপর সমুদ্রকূলে হরিদাসের সমাধি দেখে তিনি মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করলেন।

মন্দির দর্শনের পর শ্রীনিবাস আবার ফিরে এলেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে। এবার তাঁর কাছে ভাগবত পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে গদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাসকে জীর্ণ ভাগবত দেখিয়ে তাঁকে বৃন্দাবন যেতে পরামর্শ দিলেন।[৬৯]

এরপর পণ্ডিত গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস গৌড়ে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নীলাচল ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তিনি সেরাত্রি সেখানে থেকে পরদিন সকালে আবার শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁর ইচ্ছা

---

[৬৭] ঐ ৩।৪৬। [৬৮] ঐ ৩।৮৬ [৬৯] ভ. র. ৩।২৭৩-৬

ছিল যে গোসাঞির আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেখানেই থাকবেন। কিন্তু পথিমধ্যে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান-বার্তা শুনে উদ্ভ্রান্তের মতন যাজপুরের সন্নিধানে কিছুকাল কাটালেন। পরে গৌর ও গদাধর তাঁকে স্বপ্নে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিলে তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন।[৭০]

শ্রীনিবাসের নীলাচলে গমনের ইচ্ছা প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে যা বলা হয়েছে তার ওপর কর্ণপূর কবিরাজের প্রভাব বর্তমান। শ্রীনিবাসের এই বাসনার পটভূমিকা হিসেবে সর্বদা চৈতন্যগুণগান শ্রবণ এবং তাঁর পরিকর ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গ সম্বন্ধে নরহরি যা বলেছেন তা কাল্পনিক হলেও বাস্তবানুগ।

নীলাচল যাত্রার পূর্বে শ্রীনিবাস নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুমতি নিয়েছিলেন এবং তিনি শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে কোথাও এমন কথা লেখা নেই। মনে হয় কোনও জনশ্রুতি থেকে নরহরি এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। যে সূত্র থেকেই এই কাহিনী সংগৃহীত হয়ে থাকুক এই ঘটনা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে নরহরি সরকার ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী—"প্রভু করিবেন এই লীলা সঙ্গোপন।"[৭১] —সম্ভবপর ঘটনা বলে মনে হয় না। কারণ চৈতন্যদেবের আসন্ন তিরোধান সম্বন্ধে কোন হদিশ পেলে তাঁর গৌড়ীয় পরিকরবৃন্দ নীলাচল না গিয়ে দেশে বসে থাকবেন একথা বিশ্বাস করা যায় না।

নরহরি চক্রবর্তী শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার যে তারিখ উল্লেখ করেছেন সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। চৈতন্যদেবের তিরোধান তারিখ হলো ৩১শে আষাঢ়। সে সময়ে শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে। তিরোধানের সংবাদ পথিমধ্যে তিনি শ্রাবণের প্রথম দিকে পেয়ে থাকবেন। শান্তিপুর থেকে নীলাচল যেতে চৈতন্যদেবের ১৩।১৪ দিন লেগেছিল।[৭২] কিশোর বালকের সেক্ষেত্রে খুব বেশী হলেও একমাসের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। এই হিসেবে বালক শ্রীনিবাসের আষাঢ়ের প্রথম দিকে রওনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নরহরির মতে শ্রীনিবাস মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।[৭৩] মাঘ মাসে রওনা হলে শ্রীনিবাসের ফাল্গুনে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু এসময়ে রওনা হয়েও তিনি আষাঢ়ের মধ্যে নীলাচল পৌঁছুতে পারলেন না—এটা বিস্ময়কর ঘটনা। তবে নরহরি যদি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার নীলাচল গমনের তারিখ হিসাবে এটিকে সংগ্রহ করে থাকেন তবে স্বতন্ত্র কথা।

---

৭০. ঐ ৩।৩০৪ ২২। ৭১. ঐ ৩।৩৯ ৭২. ব, বৃ. বা. সা. ও কা.—পৃ. ৩৩। ৭৩. ভ. র. ৩।৫১

নীলাচলের পথে চৈতন্য-সঙ্গোপনের কথা শুনে শ্রীনিবাসের অবস্থার যে বর্ণনা নরহরি দিয়েছেন তাকে কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনার অনুবাদ বলা চলে। তৎপরবর্তী ঘটনা—স্বপ্নে শ্রীনিবাস কর্তৃক চৈতন্যদেবের দর্শনলাভ—নৃসিংহ কবিরাজের বর্ণনার অনুরূপ। এখানে তিনি ঋণ স্বীকার করে নবপদ্য থেকে শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করেছেন।

নৃসিংহ কবিরাজের যে শ্লোকটি ভক্তিরত্নাকরে ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় চৈতন্যদেব স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নবপদ্যের এই আশ্বাসবাণী সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে স্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নেই। হরিদাস দাস বাবাজী কলানিধি চট্টরাজ বিরচিত বলে যে নয়টি শ্লোক তাঁর গ্রন্থে ধৃত করেছেন সেই রচনায় দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের এই আশ্বাসবাণী হচ্ছে তাঁকে বৃন্দাবন যেতে আদেশ দেওয়া। কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় এসব স্বপ্নাদেশের কথা না বলে সোজাসুজি গদাধর পণ্ডিতের কাছে শ্রীনিবাসের ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে নীলাচল গমনের উল্লেখ আছে। এই দুই রচনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নরহরি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার চৈতন্যদেব কর্তৃক গদাধর পণ্ডিতের কাছে যাওয়ার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ার কথা বলে থাকবেন।

শ্রীনিবাসাচার্য-শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ রচিত গুণলেশসূচকের বর্ণনা বিশ্লেষণকালে আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে শ্রীনিবাস দুবার নীলাচল গিয়েছিলেন। কিন্তু নরহরি এই রচনা থেকে সময়ের ব্যবধান ধরতে না পারায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। ফলে শ্রীনিবাস নীলাচলে এসে যে সব চৈতন্য-পরিকরদের দেখা পেয়েছিলেন বলে নরহরি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হয়। তবে নরহরির বর্ণনানুসারে আমরা যদি ধরে নেই যে শ্রীনিবাস ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে এসব পরিকরদের দর্শন করেছিলেন তবে আমরা বিচার করে দেখতে পারি সে সময়ে তাঁদের বর্তমান থাকা এবং নীলাচলে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল কি না।

ভক্তিরত্নাকরে এই প্রসঙ্গে যে সব চৈতন্য-পরিকরের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখেছি যে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের দেহত্যাগের ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না এবং রঘুনাথ দাসেরও নীলাচলে অনুপস্থিত থাকার কথা নয়। তবে শ্রীনিবাসাচার্য দ্বিতীয়বার ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে যখন নীলাচল এসেছিলেন তখন এঁদের দুজনের একজনকেও তিনি নীলাচলে না দেখে থাকতে পারেন।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্য প্রথম নীলাচল এসে যাঁদের দেখা পান নি তাঁদের মধ্যে অপরজন হলেন উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে পূর্ববর্তীকালে কিছু সংশয় থাকলেও বর্তমান যুগে তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ বলে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত হয়েছেন।৭৪ সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্য থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়েছিল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে। এই নাটকের প্রস্তাবনায় লেখা আছে যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যবিরহে শোকাকুল হলে তাঁর শোক অপনোদনের জন্য এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা কর হয়। নাটকের সূত্রধারের উক্তি —"গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি" থেকে সকলেই অনুমান করেন যে তাঁর নির্দেশে কবিকর্ণপূর এই নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকের প্রস্তাবনা ও সূত্রধারের উক্তি থেকে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় প্রতাপরুদ্র জীবিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস নীলাচলে উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের দেখা হওয়ার কথা ছিল।

বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায় যে তিনি চৈতন্য-চরিত থেকে আরম্ভ করে চৈতন্যাষ্টক শ্লোক পর্যন্ত অনেক কিছু রচনা করেছেন।৭৫ এই গ্রন্থে সার্বভৌম রচিত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে ঈশ্বরের আবির্ভাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে কলিতে তিনি শচীনন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।৭৬ এছাড়া তাঁর রচিত চৈতন্যাষ্টক শ্লোক, চৈতন্যের শত শ্লোক, চৈতন্যসহস্রনাম প্রভৃতি চৈতন্যদেবের প্রকটকালে রচিত হয়েছিল বলে স্বীকার করা যায় না। এছাড়া চৈতন্যভাগবতেও ইঙ্গিত আছে যে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর জীবিত ছিলেন।৭৭

চৈতন্য-তিরোধানের পর জীবিত থাকলেও সার্বভৌম শেষ জীবন কোথায় যাপন করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে তিনি চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বে ১৫৩২ খৃস্টাব্দে বারাণসী গমন করেছিলেন।৭৮ প্রমাণস্বরূপ তিনি কবিকর্ণপূরের নাটকের শেষ অঙ্কে

---

৭৪. H. C. I. P. Vol. 6 —পৃ. ৩৯১। ৭৫. চৈ. ম. প্রকাশ। ৬ ৭৬. চৈ. ম. প্রকাশ। ৬

৭৭. ম. যু. বা. সা. ত. কা. পৃ. ১৩-১৪। ৭৮. বাং সা. ইং. পৃ. ৪২

সার্বভৌমের উক্তি এবং চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ লীলার সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। আলোচ্য এই দুই গ্রন্থে সার্বভৌমের কাশীগমন সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় পরবর্তীকালে দুজন পণ্ডিতের মতের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে চৈতন্যদেব কাশী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সার্বভৌম কাশী গিয়েছিলেন।৭৯ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের কাশী যাত্রার বহু পূর্বেই তাঁর মত সেখানকার বেদান্তবাদীদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।৮০

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ডঃ নাথের সিদ্ধান্ত ঠিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এখানকার বক্তব্য বিশ্লেষণে দেখা যায় চৈতন্যদেবের জীবনের আটচল্লিশ বছরের মধ্যে প্রথম চব্বিশ বছরের লীলাকে তিনি আদিলীলায় বর্ণনা করেছেন। শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলাকে তিনি 'মধ্য' ও 'অন্ত্য' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর মধ্যলীলায় বর্ণিত অংশটুকু প্রথমে ও পরে অন্ত্যলীলায় বর্ণিত অংশটুকু সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন।

মধ্যলীলার বর্ণনার যে সূত্র কবিরাজ এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে কাশী থেকে নবদ্বীপ, শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে ফেরা পর্যন্ত এই লীলার বর্ণনার বিষয়বস্তু। এই বর্ণনায় একটি ক্রম পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর নীলাচলে এসে স্নানযাত্রা দর্শন করেন। এটি ১৫১২ খৃস্টাব্দের ঘটনা।৮১ এরপর "অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন" তিনি আলালনাথে যান। চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর গৌড়ীয় ভক্তরা এসে পড়েন। ফলে তিনি সার্বভৌমদের আগ্রহে আবার নীলাচলে ফিরে আসেন। কিন্তু জগন্নাথের দর্শন না পাওয়ায় তাঁর মন ব্যাকুল ছিল বলে ভক্তরা কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ে তিনি রামানন্দকে নীলাচলে আসতে আজ্ঞা দেন এবং তিনিও রাজাদেশ সংগ্রহ করে নীলাচলে চলে আসেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৫১৩ খৃস্টাব্দে গৌড়ীয়রা আবার নীলাচল আসেন। এবারই কুলীনগ্রামবাসীদের প্রথম আগমন হলো। এই বৎসর প্রথম প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের কৃপালাভ করেন। এবারই চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তদের প্রতি বৎসর নীলাচল আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ষান্তরে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃস্টাব্দের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ যখন নীলাচলে

---

৭৯. চৈ চ উ.—পৃ. [illegible]। ৮০. চৈ. চ. মূ.—পৃ. [illegible]। ৮১. ব. মু. আ.-আ. ভ. বা.—পৃ. [illegible]।

আসছিলেন তখন পথে তাঁদের সঙ্গে সার্বভৌমের দেখা হয়। তিনি তখন কাশী যাচ্ছেন। এবৎসর চৈতন্যদেব গুণ্ডিচা গৃহ সম্মার্জন করেন

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনার ক্রমের সঙ্গে কবিকর্ণপূরের নাটকের দশম অঙ্কে বর্ণিত সার্বভৌমের কাশীযাত্রার বর্ণনার ক্রমের সাদৃশ্য বর্তমান। মনে হচ্ছে কবিকর্ণপূর এসময়কার ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীও এই বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলে তাঁর রচনায় কবিকর্ণপূরের রচনার ক্রম বজায় রেখেছেন।

এক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে তার বিচারে দেখা যাচ্ছে যে ডঃ নাথের সিদ্ধান্ত ঠিক। তবে ১৫১৩ খৃস্টাব্দে সার্বভৌম কাশী গিয়েছিলেন বলে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন আমাদের হিসাবে সেটা পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৫১৪ খৃস্টাব্দ হয়।

বাসুদেব সার্বভৌম যে সে সময়ে কাশীবাসী হন নি বরং চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় নীলাচলে ছিলেন তার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতের কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যেই রামচন্দ্র পুরী চৈতন্যদেবের ভোজন সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করেছিলেন, ফলে তিনি আহার প্রায় ত্যাগ করেন। এসময় পরমানন্দ পুরী প্রভৃতির উপদেশে আবার নিয়মিত ভোজন করতে থাকেন। তখন যাঁদের গৃহে তিনি নিয়মিত ভিক্ষা গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে সার্বভৌম অন্যতম ছিলেন বলে চরিতামৃতে উল্লেখ আছে। এছাড়া এর পরবর্তী ঘটনা—হরিদাসের দেহত্যাগের সময়ও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সার্বভৌম অন্যতম। এই বর্ণনাদ্বয় ও চরিতামৃতের অন্যান্য উল্লেখ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের শেষ জীবনে নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলা চলে না। মনে হয় নরহরি চক্রবর্তীও নানাভাবে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় সার্বভৌম নীলাচলে ছিলেন। সেজন্য তিনি শ্রীনিবাসের নীলাচলে ভ্রমণের সময় তাঁর সেখানে উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস, প্রতাপরুদ্র এবং সার্বভৌম ছাড়া অন্যান্য চৈতন্য-পরিকরদের সম্বন্ধে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না যার ওপর নির্ভর করে বলা চলে যে চৈতন্য-তিরোধানের পর তাঁরা জীবিত ছিলেন এবং নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জীবিত থাকার স্বপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ এই যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বে তাঁদের দেহত্যাগের কথায় চৈতন্যচরিতামৃতে

উল্লেখ নেই। তা' থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে শ্রীনিবাস প্রথমবার যদি সত্যিই নীলাচল গিয়ে থাকেন তবে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত অন্যান্য পরিকরদের দর্শন পাওয়া সম্ভব ছিল।

ইতিপূর্বে আমরা ভক্তিরত্নাকরে দেখেছি যে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফিরে এসে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে রাত্রি সেখানে থেকে পরদিন আবার নীলাচল যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে গদাধর পণ্ডিতের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের এই গমনের উদ্দেশ্য গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেন নি। তাছাড়া প্রথমবার নীলাচল থেকে ফিরে আসার পরই দ্বিতীয়বার নীলাচল যাওয়ার পথে পণ্ডিত গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ পাওয়া অবাস্তব ঘটনা। কারণ কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা বিশ্লেষণে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে তিনি চৈতন্যদেবের তিরোধানের অনেক পরে দেহত্যাগ করেছেন। তবে নরহরি যদি বলতে চেয়ে থাকেন যে আমাদের হিসাবের দ্বিতীয়বার শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফিরে আসার পর তিনি পুনর্বার নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং পথিমধ্যে এই সংবাদ পেয়েছিলেন তবে স্বতন্ত্র কথা। সেক্ষেত্রে পণ্ডিত গোস্বামীর দেহত্যাগের সময় নিরূপণ করা যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে একমাত্র নরহরির অস্পষ্ট বিবরণের ওপর নির্ভর করে এসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসের নীলাচল গমন প্রসঙ্গে যে বিবরণ আছে তা ভক্তিরত্নাকরের অনুরূপ। বিবরণে খানিকটা পার্থক্য ও সংযোজনও আছে। এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ দাস যা বলেছেন তাতে দেখা যায় বালক শ্রীনিবাস পিতৃবিয়োগের পর মাকে যাজিগ্রামে রেখে শ্রীখণ্ডে এলেন। সেখানে রঘুনন্দনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হলো। তিনি শ্রীনিবাসের পরিচয় পেয়ে তাঁকে সরকার ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাসকে দেখে সরকার ঠাকুর বললেন কিছুদিন আগে তিনি বীরচন্দ্রের কাছ থেকে লিখন পেয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে "শ্রীনিবাসে শীঘ্র করি পাঠাও বৃন্দাবন।"[৮২] সরকার ঠাকুরের স্নেহস্পর্শে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

অপরাহ্নে রঘুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনিবাস আবার সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আবার শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন

---

[৮২] প্রে. বি. ৪র্থ বি.

করলেন। শ্রীনিবাস এব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করলে সরকার ঠাকুর জানালেন যে সেখানে চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোপালভট্ট তাঁকে দীক্ষাদান করবেন। এ ব্যবস্থা শ্রীনিবাসের মনঃপূত হলো না। সেই রাত্রে তিনি চৈতন্যদেব কর্তৃক বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হলেন। সরকার ঠাকুর পরদিন এই স্বপ্নাদেশের কথা শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বীরচন্দ্রকে পত্র দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে উত্তর এলে তাঁর বৃন্দাবন যাত্রার ব্যবস্থা করা হবে।[৮৩] কিন্তু শ্রীখণ্ডে থাকাকালীন শ্রীনিবাসের হঠাৎ মনে হলো "শ্রীভাগবত পড়িব বলি বড় সাধ আছে। জগন্নাথ দেখিব রহি পণ্ডিতের কাছে।"[৮৪] নরহরি সরকার সম্মতি দিয়ে একজন সঙ্গী দিয়ে তাঁকে নীলাচল পাঠিয়ে দিলেন।

পুরী এসে শ্রীনিবাস পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শ্রীনিবাসের পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন যে তাঁকে ভাগবত পড়ানোর জন্য চৈতন্যদেবের আজ্ঞা ছিল কিন্তু অশ্রুজলে পুথিখানির অক্ষর লুপ্ত হওয়ায় তাঁর পক্ষে পড়ানো সম্ভব হলো না। তিনি একটি নূতন পুথি শ্রীনিবাসের হাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার ঠাকুরের কাছে এক পত্র দিয়ে দিলেন। পত্র নিয়ে শ্রীনিবাস সরকার ঠাকুরের কাছে এলেন। "যে দিবস বীরচন্দ্র বাড়ীতে বহু সংঘট্টে।" সে সময়ে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে জানানো হলো বৃন্দাবন থেকে পত্র এসেছে। শ্রীনিবাস যেন ভাগবত পড়া শেষ করে সেখানে যান। গোসাঞির পত্র পাঠ করে শ্রীনিবাসের হাতে নূতন পুথি দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু যাজপুর পর্যন্ত গিয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান-বার্তা পেয়ে ফিরে এলেন।

ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসের বিবরণ দুটির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় এই দুই বিবরণের ঘটনাবলী ও বর্ণনার ক্রমের সাদৃশ্য আছে। পার্থক্যের মধ্যে শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার সময় পথিমধ্যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা সকল গ্রন্থে আছে, কিন্তু প্রেমবিলাসে এসম্বন্ধে কিছু নেই।

এই দুই গ্রন্থের বিবৃত ঘটনাবলী ও বর্ণনার ক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রেমবিলাসের বর্ণনায় প্রতি ক্ষেত্রে কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবকে দেখার উদ্দেশ্যে নীলাচল যাত্রার জন্য সরকার ঠাকুরের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন।

---

[৮৩] ঐ ৪র্থ বি. [৮৪] ঐ

প্রেমবিলাসে এই ঘটনার বিবরণের মধ্যে আরও একটু বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস লক্ষ্যহীন ভাবে সরকার ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। তিনি বীরচন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী শ্রীনিবাসকে তাঁর কাছে রেখে তাঁকে বৃন্দাবন পাঠানোর নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসের নীলাচল গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করা এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে ভাগবত পাঠ করার ইচ্ছা হলো। সরকার ঠাকুরও এবার বীরচন্দ্রের নির্দেশের অপেক্ষা না করে শ্রীনিবাসের নীলাচল যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে দেখা গিয়েছে পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে শ্রীনিবাস ভাগবত পড়তে চাইলে তিনি তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা বলেন এবং পুথির জীর্ণ দশাও দেখান। কিন্তু প্রেমবিলাসে পণ্ডিত গোস্বামীর শারীরিক অক্ষমতার কথা বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে যে শ্রীনিবাসকে ভাগবত পড়ানোর জন্য চৈতন্যদেব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসের পুনর্বার নীলাচল অভিমুখে রওনা হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো হয় নি। কিন্তু প্রেমবিলাসে তার একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে পণ্ডিত গোস্বামী একটি নূতন পুথি আনয়নের জন্য শ্রীনিবাসকে গৌড়ে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। সেই পুথি নিয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি পণ্ডিত গোস্বামীর দেহত্যাগের বার্তা শোনেন।

শ্রীনিবাসের নীলাচলযাত্রা প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসে যে সব নূতন ঘটনা সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্রের প্রাধান্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার সময় বীরভদ্র এতটা প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন যে সরকার ঠাকুরের মতন বয়স্ক, গণ্যমান্য চৈতন্য-পরিকরকেও তিনি নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই বর্ণনা নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমে নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে বীরভদ্রের সম্পর্কের কথা প্রেমবিলাসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। সরকার ঠাকুর বয়সে ও সম্মানে বীরভদ্রের পিতৃতুল্য ছিলেন। তাছাড়া তিনি নিত্যানন্দগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত নিত্যানন্দশাখা বর্ণনায় তাঁর নাম নেই। এমতাবস্থায় বীরভদ্রের পক্ষে পিতৃতুল্য সরকার ঠাকুরকে নির্দেশ দেওয়া যুক্তিসম্মত বলে স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, গৌড়ের বৈষ্ণবসমাজে বীরভদ্রের প্রাধান্যলাভ পরবর্তীকালের ঘটনা। অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে নিত্যানন্দের তিরোধানের পর জাহ্নবাদেবী এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করে আসছিলেন। তাঁর জীবিতকালে বীরভদ্র কোনও কোনও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকলেও তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী আমাদের এই অনুমানের সমর্থনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

ভক্তিরত্নাকরে বীরভদ্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীনিবাসের গৌড় ভ্রমণের সময়। প্রথমবার তিনি যখন খড়দহে, উপস্থিত হন তখন সেখানে শ্রীবসু ও জাহ্নবার সাক্ষাৎলাভ করেন। সে সময়ে বীরভদ্র সেখানে উপস্থিত থাকলেও শ্রীনিবাসের সঙ্গে কথাবার্তা একমাত্র জাহ্নবাদেবীরই হয়েছিল। জাহ্নবাদেবীর নির্দেশেই তিনি অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এরপর বীরভদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে। গদাধর দাসের তিরোধানে কাটোয়ায় যে মহোৎসব হয় সেখানে এবং তার অব্যবহিত পরে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের তিরোধান-মহোৎসবে বীরভদ্রের উপস্থিতি ও সংকীর্তনে অংশ গ্রহণের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু খেতরীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উৎসবে নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেছিলেন স্বয়ং জাহ্নবাদেবী। বীরভদ্র সে সময়ে এই গোষ্ঠীর পুরোভাগে থাকলে তাঁকে বাদ দিয়ে জাহ্নবাদেবী একা এই উৎসবে উপস্থিত থাকতেন না। কাজেই অনুমান করা যায় তখন পর্যন্ত বৈষ্ণবসমাজে তিনি নিত্যানন্দপুত্র বলে আদৃত হলেও বৈষ্ণবদের অন্যতম নেতা বলে স্বীকৃতিলাভ করেন নি। সেক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার নীলাচলে গমনের সময়ে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাঁর নেতৃসুলভ আচরণের যে দাবী প্রেমবিলাসে করা হয়েছে তাকে স্বীকার করা যায় না।

প্রেমবিলাসের আলোচ্য অংশে বীরভদ্রের ভূমিকা ছাড়া সরকার ঠাকুর ও শ্রীনিবাসের যে চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করা কঠিন। এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন। অপরপক্ষে শ্রীনিবাসও চৈতন্যদেবের নিকট থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবন যেতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসের হঠাৎ নীলাচল গিয়ে গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার বাসনা হলো এবং নরহরিও এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেতৎক্ষণাৎ তাঁকে নীলাচল

পাঠিয়ে দিলেন। এখানে শ্রীনিবাসকে ও সরকার ঠাকুরকে খামখেয়ালী ও অস্থিরচিত্ত বলে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেরূপ বর্ণনা এযাবৎ কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই বর্ণনা এত অস্বাভাবিক যে একে সত্য ঘটনা বলে স্বীকার করাও কঠিন।

ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে প্রেমবিলাসের শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার বর্ণনার প্রধান পার্থক্য হলো এই যাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনায়। প্রেমবিলাস ছাড়া অন্যান্য সকল রচনায় যা বলা হয়েছে তাতে অনুমান করা যায় যে শ্রীনিবাস প্রথমবার চৈতন্যদেবকে দর্শনের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়বার ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে নীলাচল গিয়েছিলেন। প্রেমবিলাস-এ প্রথমাংশের কোন উল্লেখ নেই। এই অনুল্লেখ থেকে ড° রাধাগোবিন্দ নাথ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে গৌর-নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর শ্রীনিবাসের জন্ম হয়েছিল।[৮৫] কিন্তু এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস-শিষ্যদ্বয়ের রচনা অধিক নির্ভরযোগ্য। কাজেই প্রেমবিলাসে এ সম্বন্ধে অনুল্লেখে কবিরাজদ্বয়ের তথ্যকে অগ্রাহ্য করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বরং প্রেমবিলাসের উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

প্রেমবিলাসের এই অংশের সময় বিচার করলেও বক্তব্যের অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। প্রেমবিলাসের বর্ণনার ক্রম থেকে অনুমান করা যায় শ্রীনিবাসের পিতার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার জন্য নীলাচল গিয়েছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীনিবাস নিজে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না—অন্যের উপদেশ ও সাহায্যের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাঁর এ বিষয়ে অন্যের উপদেশের ওপর নির্ভর করতে হতো না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর নীলাচল যাত্রার সময় সঙ্গে লোক দেওয়া। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সঙ্গে লোক দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অল্প বয়সে ভাগবত পড়া বিশেষতঃ গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠের বর্ণনাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকার করা যায় না। দেখা যাচ্ছে প্রেমবিলাস বর্ণিত শ্রীনিবাসের নীলাচল যাত্রার বর্ণনাকে তাঁর বাল্যকালের ঘটনা বলে স্বীকার করলে বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যায়।

এই গ্রন্থে বর্ণিত নীলাচল যাত্রার ঘটনাকে যদি পরবর্তীকালের বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলেও অসামঞ্জস্য থেকে যায়। একথা ঠিক যে পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে ভাগবত পাঠের ইচ্ছা পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস প্রাপ্তবয়স্ক হলেই হওয়া

---

[৮৫] চৈ. চ. ভূ. পৃ. ২৫

স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রেমবিলাসের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তির পক্ষে বিনা উদ্দেশ্যে কোথাও যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে হঠাৎ কিছু ঠিক করা আবার বালকসুলভ অস্থিরতার সঙ্গে হঠাৎ মত পরিবর্তন করে ভাগবত পাঠ করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি অস্থিরচিত্ত কোনও বালকের চরিত্র বর্ণনায় হয়তো যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

প্রেমবিলাসে বর্ণিত অন্যান্য অসঙ্গতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় চৈতন্যদেবের বিভিন্ন স্বপ্নাদেশের মধ্যে পার্থক্য। তিনি শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন যেতে আদেশ দিলেন। সেই স্বপ্নাদেশ অগ্রাহ্য করে শ্রীনিবাস নীলাচলে গেলে দেখা গেল চৈতন্যদেব শ্রীনিবাসকে ভাগবত পড়ানোর জন্য গদাধর পণ্ডিতকে আদেশ দিয়েছিলেন। এ রকম বিপরীত বর্ণনা আরও আছে। বীরচন্দ্র শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন পাঠানোর জন্য সেখানকার গোস্বামীদের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। তখনও শ্রীনিবাসের নীলাচল যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে নি। পরে তিনি হঠাৎ নীলাচল গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেল বৃন্দাবন থেকে খবর এসেছে যে শ্রীনিবাস গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠ সমাপন করার পর যেন বৃন্দাবন আসেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীনিবাসের নীলাচল যাওয়ার খবর কিভাবে পেলেন তা বোঝা গেল না। আবার তাঁর নীলাচলে ভাগবত পাঠ যদি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে তাঁকে সেখানকার আরব্ধ কাজ শেষ করার আগে কেন বৃন্দাবন পাঠানো হচ্ছিল তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা গ্রন্থকার দেন নি। এসব কারণে প্রেমবিলাসে বর্ণিত শ্রীনিবাসের নীলাচল ভ্রমণের বিবরণের কোনও অংশই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করা যায় না।

বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণ থেকে শ্রীনিবাসের নীলাচল-পর্ব সম্বন্ধে যা জানা গেল তা' থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি প্রথম বয়সে একবার নীলাচল গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদ্বয়ের রচনা থেকে একথা স্বীকার করতে হয় যে তাঁর এই নীলাচল ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবকে দর্শন করা। অনুমান করা যায় এ সময় তাঁর বয়স কমপক্ষে চৌদ্দ বৎসর ছিল।

শ্রীনিবাসাচার্যের অন্যতম শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের রচনা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি পরবর্তীকালে গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার নীলাচল গিয়েছিলেন। তাঁর এই দু'বার নীলাচল যাত্রার মধ্যে উদ্দেশ্যের পার্থক্য কবিরাজের রচনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় পরবর্তীকালে

যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে দুবার নীলাচল গিয়েছিলেন নিম্নলিখিত কারণে সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না।

প্রথমতঃ, তাঁর নীলাচল গমনের দুটি উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে। তার একটি হলো চৈতন্যদেবকে দর্শন এবং অপরটি হলো গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পাঠ। তিনি প্রথমবার চৈতন্য-তিরোধানের সময় যখন নীলাচলে গিয়েছিলেন সে সময় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল যাওয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু সে সময়ে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে বয়সের সঙ্গতিরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্য সঙ্গত কারণে সে সময়ে তাঁর বয়স ঊর্ধ্বপক্ষে চৌদ্দ বৎসর ধরা হয়েছে। এই বয়সে তাঁর গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ার ইচ্ছাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। কাজেই স্বীকার করতে হয় তিনি দুবার দুই উদ্দেশ্যে নীলাচল গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় গদাধর পণ্ডিতের স্বাস্থ্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা চৈতন্য-তিরোধানের সময়ের উপযোগী নয়। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি এই সময়ে তাঁর বয়স ৪২ বৎসরের অধিক ছিল না। এ সময়ে তাঁর জরাজীর্ণ বার্ধক্যের কোনও প্রশ্ন আসে না। কাজেই ধরে নেওয়া যায় শ্রীনিবাস এমন সময়ে ভাগবত পাঠের ইচ্ছা নিয়ে দ্বিতীয়বার নীলাচল গিয়েছিলেন সে সময়ে পণ্ডিত গোস্বামী বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য দ্বিতীয়বার কোন্ সময়ে নীলাচল গিয়েছিলেন তার আনুমানিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যায় তিনি নীলাচল থেকে গৌড় প্রত্যাবর্তন করে শোনেন যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য তিরোধান করেছেন।[৮৬] এ থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে তিনি এঁদের তিরোধানের পূর্বে নীলাচল চলে গিয়েছিলেন। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় হিসাব করে দেখিয়েছেন যে নিত্যানন্দের তিরোধান ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের[৮৭] এবং অদ্বৈতাচার্যের তিরোধান ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের[৮৮] পূর্বে হয় নি। এই হিসাব থেকে অনুমান করা যায় যে শ্রীনিবাস ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভাগবত পড়ার উদ্দেশ্যে নীলাচল গিয়ে থাকবেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের দুবার নীলাচল গমনের আনুমানিক হিসেব যুক্তিসঙ্গত

---

[৮৬] ভ র. ৩।৩৩০ [৮৭] ম. যু. বা. সা. ত. কা. পৃ. ৫০ [৮৮] ঐ পৃ. ৫৫

বলে স্বীকার করে নিলে দেখা যাচ্ছে এই দুই সময়ের মধ্যে প্রায় এগারো বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। সেক্ষেত্রে সমস্যা থাকে এই দীর্ঘ সময় তিনি কি করেছিলেন? এ সম্বন্ধে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যার ওপর নির্ভর করে সঠিকভাবে কিছু বলা যায়। তবে একথা অনুমান করা চলে যে প্রথমবার নীলাচল থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসার পর তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে থাকবেন। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হিসেবে তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে সময়কার ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায় সে সময়ে গৌড়ে নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য-পরিকরবৃন্দ হরিভক্তি প্রচার করলেও তার কোনও দার্শনিক ভিত্তি তাঁরা স্থাপন করতে পারেন নি; চৈতন্য-প্রদর্শিত ভক্তিবাদের সাহায্যে ভাগবতের ব্যাখ্যার প্রচলন তখনও এদেশে হয় নি। শাস্ত্রালোচনা করতে করতে শ্রীনিবাসাচার্য এ বিষয়ে উৎসুক হয়ে ওঠেন। হয়তো নরহরি সরকার ঠাকুরের পরামর্শে তিনি গদাধর পণ্ডিতের কাছে এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যে জীর্ণ পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আচার্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বিতীয়বার নীলাচল যাত্রা সফল হয়েছিল বলা যেতে পারে। কারণ গদাধর পণ্ডিত তাঁকে ভাগবত পাঠে সাহায্য করতে না পারলেও তিনি আচার্যের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথ দেখিয়ে দেন। সেই পথে অগ্রসর হয়ে আচার্যের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে পণ্ডিত গোস্বামীর পরামর্শে আচার্য গৌড়ে ফিরে এসে অন্যতম চৈতন্য-পরিকর গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শ্রীনিবাসের অভিপ্রায় শুনে তাঁকে বৃন্দাবন যেতে পরামর্শ দেন এবং তাঁকে বৃন্দাবন যেতে সাহায্যও করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তার পূর্বে দেখা যেতে পারে আচার্য দ্বিতীয়বার নীলাচলে গিয়ে কতদিন ছিলেন।

আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাওয়া যাবে যে শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার বৃন্দাবন গমন করেছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ এবং পরবর্তী জীবনীকারদের রচনা থেকে দেখা যায় যে আচার্য দ্বিতীয়বার নীলাচল থেকে প্রত্যাগমন করার অব্যবহিত পরেই বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ নীলাচল থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন। অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে

যে তিনি নীলাচলে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন।[৮৯] গ্রন্থটির এই বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের অনুমানের মিল পাওয়া যাচ্ছে। ১৫৫৪ খৃস্টাব্দ নাগাদ নীলাচল গিয়ে থাকলে সে সময় পণ্ডিত গোস্বামীর বয়স হয় আনুমানিক বাহান্ন বৎসর। চৈতন্যগতপ্রাণ পণ্ডিত গোস্বামীর এ সময়ে শোকে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া এবং বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই আচার্য-জীবনীকারদের বিবরণ স্বীকার করে নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে তিনি ১৫৫৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নীলাচলে থাকলেও তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে পারেন নি। তবে পণ্ডিত গোস্বামীর আস্থা অর্জন করে তাঁর অভীপ্সিত ফললাভের পথ সুগম করতে পেরেছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্যের এত দীর্ঘকাল নীলাচলে থাকার স্বপক্ষে বলা যায় যে তিনি নীলাচলে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে পণ্ডিত গোস্বামীর বিশ্বাস অর্জন করে তাঁর কাছ থেকে গদাধর দাসের নামে পরিচয়পত্র আনতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছিল। এছাড়া পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে তিনি গৌড় থেকে নীলাচলে আসার পথে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল। নীলাচলে চৈতন্য-ভক্তদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় না থাকলে গৌড় থেকে সেখানে গ্রন্থ বহন করে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই সময় ছাড়া আচার্যের জীবনের এমন কোন সময় পাওয়া যায় না কিংবা এমন কোনও ঘটনা জানা যায় না কিংবা এমন কোনও তথ্য জানা যায় না যা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি পরবর্তী কোনও কালে নীলাচলে গিয়ে এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কাজেই অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে আমরা সঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারি যে শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৫৫ খৃস্টাব্দের পূর্বে নীলাচল গিয়ে অধ্যয়ন ও সেবা দ্বারা পণ্ডিত গোস্বামীর আস্থা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গদাধর দাসের কাছে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে ভাগবত অধ্যয়ন করার জন্য ১৫৬১ খৃস্টাব্দ নাগাদ গৌড়ে ফিরে এসে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের তিরোধানের বার্তা শোনেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তুতি-পর্ব—শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শ্রীখণ্ড ও বীরলোক কৃষ্ণনগর ভ্রমণ। এসম্বন্ধে আচার্য-শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। পরবর্তী কালে রচিত জীবনীগ্রন্থগুলিতে কবিরাজের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। অবশ্য

---

[৮৯] অ. ব. ২য় ম.

কয়েকক্ষেত্রে সে সব বর্ণনা পল্লবিত হয়েছে। কিছু কিছু কিংবদন্তীও এসব বর্ণনার মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে।

কর্ণপূর কবিরাজের শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকের পঞ্চম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত আচার্যের গৌড় ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলিতে দেখা যায় শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফিরে এসে প্রথমেই গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কাছ থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পরামর্শ পেয়ে তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। এরপর তিনি গদাধর দাসের আশীর্বাদ লাভ করে প্রথমে যান শ্রীখণ্ডে। সেখানে নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দনকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি যান বীরলোক কৃষ্ণনগরে। সেখানে তিনি অভিরাম ঠাকুরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। অভিরাম ঠাকুর শ্রীনিবাসের বৈরাগ্যের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বৃন্দাবন যেতে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

গুণলেশসূচকে গদাধর দাসের সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা পাঁচটি শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে পণ্ডিত গোস্বামীর লিপি এনে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং গোস্বামীর লিপি তাঁর কাছে দিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকে দেখা যায় তিনি শ্রীনিবাসের মনোবাসনা শুনে স্বীকার করেন যে পণ্ডিত গোস্বামী স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি হয়ে পড়েছেন। তারপর তিনি শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন গিয়ে "সনাতন-যুতং" রূপের আশ্রয় নিতে পরামর্শদান করেন। তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাস তাঁর এই আজ্ঞা শিরোধার্য করে গদাধর দাসকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনিবাসের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। চতুর্থ শ্লোকে এই আশীর্বাদ-বাণীটি বলা হয়েছে। এখানে দেখা যায় দাস ঠাকুর শ্রীনিবাসকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন—যে চৈতন্যদেবের হৃদয়ে রাধাবিরহী কৃষ্ণের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে সেই চৈতন্যদেব শ্রীনিবাসের হৃদয়ে স্ফুরিত হোন। পঞ্চম শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাস এই আশীর্বাদ লাভে অভিভূত হয়ে চক্ষের জলে গদাধর দাসের পাদপ্রক্ষালন করে কায়মনোবাক্যে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং গোকুলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন।

এরপর মাত্র একটি শ্লোকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে

গমন এবং সেখানে নরহরি সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর আজ্ঞালাভের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দনকে প্রণাম করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী একাদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোকে কর্ণপূর কবিরাজ শ্রীনিবাসের সঙ্গে অভিরাম গোস্বামীর সাক্ষাৎকার ও তৎকর্তৃক শ্রীনিবাসের পরীক্ষা গ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন। এই আটটি শ্লোকে দেখা যায় বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীনিবাস বীরলোকে উপস্থিত হলেন। সেখানে অভিরাম ঠাকুরের চরণবন্দনা করে তাঁর নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যায় অভিরাম ঠাকুর শ্রীনিবাসের বৈরাগ্য নির্ণয়ের জন্য তাঁর বসবার জন্যে তৃণ, ভোজনের জন্যে পাঁচটি কড়ি ও শতচ্ছিন্ন কলার পাতা পাঠিয়ে দিলেন। গোস্বামী ঠাকুরের আশা ছিল এর দ্বারা শ্রীনিবাসের বৈরাগ্যের অবসান হবে। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মনে সেই পাতা জলে ধুয়ে নিলেন এবং এক কড়ি দিয়ে লবণ ও এক কড়ির চাল সংগ্রহ করে তিনদিনের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তী শ্লোকে আছে অভিরাম গোস্বামী একথা শুনে শ্রীনিবাসকে যথার্থ ভক্ত বলে স্বীকার করলেন এবং তাঁকে বাঞ্ছিত বর দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। পরবর্তী শ্লোকে অভিরাম গোস্বামীর বরদানেচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও তিনি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করছেন পার্থিব সুখসমৃদ্ধিই তাঁর কাম্য কি না। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাস এর উত্তরে রাগানুগা ভক্তি কামনা করেছিলেন। পরবর্তী শ্লোকে কবিরাজ শ্রীনিবাসের এই উত্তরে অভিরাম গোস্বামীর প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে তিনি আনন্দিত হয়ে শ্রীনিবাসকে তাঁর বিখ্যাত জয়মঙ্গল চাবুক স্পর্শ করিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আলোচ্য শেষ শ্লোকে দেখা যায় শ্রীনিবাস তাঁর কাছ থেকে ব্রজে যাওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাওয়ার পথে অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বীরলোকে গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিবরণের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে। রামগোপাল দাসের পাটনির্ণয়ে অভিরাম গোস্বামীর পাট প্রসঙ্গে বীরলোক কৃষ্ণনগরের উল্লেখ আছে।[১০] হরিদাস দাস বাবাজী অভিরামের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে 'পাট পর্যটন' নামে একটি গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে

---

[১০] র. ক. ব. পৃ. ১৯৯

অভিরামের পাট ছিল খানাকুল কৃষ্ণনগরে। জগবন্ধু ভদ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরামের পাট ছিল বলে স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালের সকল রচনাতেই এই স্থানকে তাঁর পাট বলে স্বীকার করা হয়েছে। হরিদাস দাস বাবাজী বীরলোককে খানাকুলের নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন।[৯১] অবশ্য সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল বলে তিনি তাঁর বক্তব্যের পাশে (?) চিহ্ন দিয়েছেন।

অনুরাগবল্লীর বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস নীলাচলে কয়েক বৎসর বাস করে দেশে ফিরে এলেন। এখানেও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে তিনি একবার ভাগবত পড়ে নিলেন। তারপর তিনি স্থির করলেন চিরকালের মতন গৌড় ত্যাগ করে বৃন্দাবন যাবেন। সেজন্য যাওয়ার আগে গৌড়ে সকল পাট দর্শন করতে মনস্থ করলেন। এরপর শ্রীনিবাস 'সরকার ঠাকুর আদি সবাকার পাট' দর্শন করতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে তিনি খবর পেলেন 'শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত দুই প্রভু অপ্রকট।' তখন তাঁর মনে হলো গদাধর পণ্ডিত গদাধর দাসকে একটি প্রহেলিকা বলতে বলেছিলেন। নানাস্থানে ভ্রমণের পর তিনি নবদ্বীপে এসে দাস গদাধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পণ্ডিত গোস্বামীর প্রহেলিকা বললেন। এই প্রহেলিকা শুনে গদাধর দাস বিলাপ করে বলতে লাগলেন যে কিছুদিন আগেই পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট সংবাদ এসেছে। তিনি এসংবাদ পাঠিয়েছেন জানলে গদাধর দাস নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। এরপর তিনি শ্রীনিবাসকে তিরস্কার করে বললেন "চলি যাহ পুন মোরে না দেখাইহ মুখ।" দুঃখিত অন্তরে শ্রীনিবাস প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে মনস্থির করে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শুয়ে রইলেন। গঙ্গার ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দাসীরা তাঁর নিত্য ব্যবহারের জল আনতে যেত। একদিন তারা শ্রীনিবাসকে সেখানে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে খবর দেয়। তিনি শ্রীনিবাসকে ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে গদাধর দাস সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে ডেকে এনে শ্রীনিবাসকে ক্ষমা করতে বলেন। সেকথা শুনে গদাধর দাস বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্মুখে তাঁকে ক্ষমা করেন। এরপর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশীর্বাদলাভ করে শ্রীনিবাস অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী ও নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তারপর শ্রীনিবাস কৃষ্ণনগর গিয়ে অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মনোহর দাসের বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস কৃষ্ণনগরে দিনকতক ছিলেন। প্রথমদিন তিনি এখানকার গোপীনাথ মন্দিরের ভাণ্ডারীর কাছ থেকে সিধা

---

[৯১] গৌ বৈ-জী. বীরলোক দ্র.

গ্রহণ করলেও পরদিন থেকে নিজের জিনিষপত্র বিক্রয় করে দিন কাটাতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে পাঁচ কড়ি অবশিষ্ট রইল। এই দিয়ে তিনি চাল, নুন ও কাঠ কিনে দ্বারিকেশ্বরের কাছে রান্না করছেন একথা জানতে পেরে অভিরাম ঠাকুর চারজন বৈষ্ণব পাঠিয়ে দিলেন। রান্না শেষে ভোগ দেওয়ামাত্র এই বৈষ্ণব চারজন গোস্বামী কর্তৃক পূর্ব নির্দেশমত শ্রীনিবাসের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। অভিরাম ঠাকুর একথা শুনতে পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন এবং শ্রীনিবাসকে জয়মঙ্গল নামে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। তিনবার প্রহার করার পর অভিরাম পত্নী মালিনী দেবী ঠাকুরের হাত ধরে তাঁকে নিবারণ করলেন। গোস্বামীর আশীর্বাদ ও আদেশ পেয়ে শ্রীনিবাস পরদিন বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

মনোহরদাসের এই বর্ণনা কর্ণপুর কবিরাজের বর্ণনার অনুরূপ হলেও অনেক নূতন ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে। গদাধর পণ্ডিতের প্রহেলিকা ও গদাধর দাসের আচরণ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ কর্ণপুর কবিরাজের রচনায় নেই। নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা কবিরাজের রচনায় থাকলেও অনুরাগবল্লীতে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই বরং এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, সীতা দেবী ও জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে যার কোন উল্লেখ কবিরাজের রচনায় নেই। অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ কবিরাজের রচনার অনুরূপ হলেও অনুরাগবল্লীতে কিছু নূতন ঘটনার উল্লেখ আছে।

গদাধর পণ্ডিতের প্রহেলিকা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে দেখা গিয়েছে এখানে শ্রীনিবাস ও গদাধর চরিত্র মনোহরদাস এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যাকে বাস্তবানুগ বলা চলে না। কাজেই এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুরাগবল্লীতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাও কতখানি গ্রহণযোগ্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। এই বর্ণনানুযায়ী দেখা যাচ্ছে গদাধর দাস নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় গদাধর দাস নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর অন্যান্য চৈতন্য-পরিকরদের সঙ্গে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে আড়িয়াদহে তাঁর নিজের গৃহে চলে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায় চৈতন্যদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে যখন গৌড়ের শান্তিপুর ও কামারহাটি হয়ে

পানি-হাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসেন তখন গদাধর দাস সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।[১২] গদাধর দাস যদি নবদ্বীপে থাকতেন তবে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিপুরে আসতেন। আড়িয়াদহ থেকে পানিহাটি খুব কাছে। সেজন্য চৈতন্যদেব পানিহাটিতে উপস্থিত হলে তিনি আড়িয়াদহ থেকে সেখানে এসেছিলেন। গদাধর দাস বাকী জীবন আড়িয়াদহে কাটিয়েছিলেন বলে এইস্থানকে অন্যতম শ্রীপাট বলে স্বীকার করা হয়েছে।[১৩] কাজেই মনোহরদাস বর্ণিত গদাধর দাস ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে শ্রীনিবাসের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেখা হওয়া খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এমন হতে পারে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গদাধর দাসের সঙ্গে আড়িয়াদহতে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন। তারপর শ্রীখণ্ড যাওয়ার পথে খড়দহ, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ হয়ে যথাক্রমে জাহ্নবা দেবী, সীতা-দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এঁদের বিশেষতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীনিবাস যদি দর্শন করে থাকতেন তবে কর্ণপূর কবিরাজ সেকথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন, কারণ অভিরাম গোস্বামীর আশীর্বাদের চেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশীর্বাদের গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশী। কর্ণপূর কবিরাজের এই অনুল্লেখে মনোহরদাস বর্ণিত এই তিনজনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়।

অভিরাম গোস্বামী সম্বন্ধে কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনার ওপর যে নূতন ঘটনার সংযোজন হয়েছে তাও কতখানি গ্রহণযোগ্য বিচার করা যেতে পারে। মনে হয় কর্ণপূর কবিরাজ অভিরাম গোস্বামী কর্তৃক শ্রীনিবাসের পরীক্ষার যে কাহিনী বিবৃত করেছেন পরবর্তীকালে সেটি যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হওয়ায় প্রসাদ গ্রহণকালে বৈরাগী প্রেরণরূপ নূতন কাহিনীর প্রচলন হয়েছিল।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তুতি পর্বের বর্ণনায় ভক্তিরত্নাকরের ওপর অনুরাগবল্লীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের নীলাচল পর্বের বর্ণনা আছে। তার শেষাংশে আছে গদাধর পণ্ডিতের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে শ্রীনিবাসের দেশে ফিরে আসার কথা। পথে তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের তিরোধান-বার্তা শুনে অধীর হয়ে পড়েন। তাঁরা দুজনে স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে দর্শন দেন এবং গৌড়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

---

[১২] চৈ. ভা.—৩।৫।

[১৩] শ্র. ক. ব. পৃ ১১৮

বৃন্দাবন যেতে উপদেশ দেন। এরপর গৌড় পরিক্রমার বর্ণনা এই গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গের প্রথমাংশে দেওয়া হয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনানুসারে দেখা যায় শ্রীনিবাস এবার নীলাচলের পথে সোজা নবদ্বীপ এসে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি সর্বপ্রথম বংশীবদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সহায়তায় শ্রীনিবাস বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদলাভ করেন। এরপর নবদ্বীপে মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও গদাধর দাসকে দর্শন করে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করেন। এরপর শ্রীনিবাস গেলেন শান্তিপুর। সেখানে অদ্বৈত-বিরহে সীতাদেবী কাতর ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে এবং অদ্বৈতাচার্যের পুত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি খড়দহে গেলেন। সেখানে প্রথমে দেখা হলো নিত্যানন্দ-শিষ্য পরমেশ্বরী দাসের সঙ্গে। তাঁর সহায়তায় শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ পত্নীদ্বয়ের দর্শন পেলেন। তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে তিনি নিত্যানন্দশিষ্য সূর্যদাস, গৌরীদাস, মহেশ পণ্ডিত আদি ভক্তদের আশীর্বাদলাভ করে বীরলোকে অভিরাম গোস্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে দশ কড়া দিয়ে এবং প্রসাদগ্রহণের সময় চারজন বৈষ্ণব প্রেরণ করে শ্রীনিবাসের বৈরাগ্য পরীক্ষা করলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অভিরাম গোস্বামী সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর বিখ্যাত জয়মঙ্গল চাবুক দ্বারা শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করলেন। এরপর শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁদের অনুমতি নিয়ে যাজিগ্রাম ফিরে এলেন। সেখানে মায়ের কাছে দিনকতক থেকে তাঁর অনুমতি নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

অনুরাগবল্লীর গদাধর দাস ও প্রহেলিকা সংক্রান্ত অবাস্তব অংশ ভক্তিরত্নাকরের এই বর্ণনায় গ্রহণ করা না হলেও নানা কারণে নরহরি চক্রবর্তীর এই বর্ণনাকেও গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় নীলাচল থেকে ফেরার পর গদাধর দাসের সঙ্গে শ্রীনিবাসের দেখা করার যে বিরাট প্রয়োজন ছিল সেই প্রয়োজনীয়তা এই রচনায় স্বীকার করা হয় নি। সেজন্য এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফিরে এসে আগে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে প্রথমে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করলেন। এরপর তিনি নবদ্বীপের অন্যান্য চৈতন্য-পরিকরদের সঙ্গে দেখা করার পর গদাধরদাসের সঙ্গে দেখা করলেন শুধুমাত্র গতানুগতিক ভাবে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। কর্ণপূর কবিরাজের রচনার সঙ্গে পরিচিত

হয়েও নরহরি চক্রবর্তী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতে কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না কেন বোঝা গেল না।

শুধু তাই নয়, অনুরাগবল্লীর বর্ণনানুযায়ী নরহরি ধরে নিয়েছেন যে গদাধর দাস নবদ্বীপবাসী ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তিনিও যে নবদ্বীপ ত্যাগ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি। কাজেই মনোহর চক্রবর্তীর এই বর্ণনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অনুরাগবল্লীর বর্ণনাকে স্বীকার করে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ ভ্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে নরহরি চক্রবর্তী সে সময়ে যে কয়জন চৈতন্য-পরিকরের নবদ্বীপে থাকা সম্ভব তাঁদের সকলের সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাতের কথা বলেছেন। কিন্তু কর্ণপুর কবিরাজের বর্ণনায় বোঝা যায় না শ্রীনিবাস আদৌ নবদ্বীপ গিয়েছিলেন কি না। কবিরাজের বর্ণন থেকে মনে হয় এসময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের নির্দেশিত পথ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা, যার জন্য যখন বৃন্দাবন যাওয়া স্থির হলো তিনি কালবিলম্ব না করে সে পথে রওনা হলেন। এতে শ্রীনিবাস-চরিত্রের যে একাগ্রতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী রচনায় এমনকি নরহরির এই বর্ণনাতেও তার অভাব দেখা যাচ্ছে।

ভক্তিরত্নাকরের এই প্রসঙ্গের বর্ণনাকে যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার না করার অপর কারণ হলো শ্রীনিবাসের এসময়ে ক্রমাগত উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর ভ্রমণ করে সকলের সঙ্গে দেখা করা এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করার বর্ণনা। তবে এমন হতে পারে শ্রীনিবাস প্রথমে আড়িয়াদহ এসে গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, পরে তিনি খড়দহ, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ হয়ে শ্রীখণ্ডে গেলেন এবং সেখান থেকে বীরলোক কৃষ্ণনগর হয়ে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হলেন। শ্রীনিবাসের এই যাত্রাপথও খুব নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। তিনি পথে এভাবে কালক্ষেপ করবেন—একথা স্বীকার করা কঠিন।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনায় অনুরাগবল্লীর অবাস্তব অংশ সন্নিবেশিত না হলেও কিছু কাল্পনিক বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। তার মধ্যে স্বপ্নদর্শন অন্যতম। এই প্রসঙ্গে প্রথমে দেখা যাচ্ছে নীলাচল থেকে ফেরার পথে তিনি প্রথমে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যকে স্বপ্নে দেখেন। এরপর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বপ্নে, চৈতন্যদেবকে দেখেন এবং তাঁর কাছে শ্রীনিবাসের আগমনবার্তা শোনেন, নবদ্বীপে শ্রীনিবাস শচীদেবীকে স্বপ্নে দেখেন আবার শান্তিপুরে প্রবেশের পথে পুনরায় অদ্বৈতাচার্যকে স্বপ্নে দেখেন। এসবই নরহরি চক্রবর্তীর কল্পনাপ্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসের গৌড় পরিক্রমার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা অসঙ্গত বর্ণনায় পূর্ণ। এই গ্রন্থের চতুর্থ বিলাসের শেষাংশে আছে যাজপুরে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান–সংবাদ পেয়ে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে এলেন। পণ্ডিত গোস্বামীর বিরহে কাতর হলেও তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা বাড়ল। কিন্তু তিনি শ্রীখণ্ড থেকে সোজা নবদ্বীপ চলে এলেন। সেখানে চৈতন্যদেবের গৃহের কাছে পণ্ডিত গোস্বামীর নাম করে ক্রন্দন করতে থাকলেন। প্রথম দু' চারদিন তিনি অন্নজল স্পর্শ করলেন না। শেষকালে ক্ষুধার তাড়নায় "ছটাক তণ্ডুল" সংগ্রহ করে গঙ্গাতীরে রন্ধন করে খেতে আরম্ভ করলেন। এভাবে আটদিন কাটানোর পর শ্রীনিবাস বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে ভাগবত পড়া হলো না বলে রোদন করতে লাগলেন। এমন সময়ে ঈশান সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শ্রীনিবাসের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে গিয়ে তাঁর কথা বললেন, তারপর তাঁর আজ্ঞানুসারে রন্ধনসামগ্রী শ্রীনিবাসকে দিয়ে এলেন। শ্রীনিবাস যখন আনন্দিত মনে রন্ধন করছেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দশজন বৈরাগীকে শ্রীনিবাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীনিবাস তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া সন্তুষ্ট হলেন। তারপর রাত থাকতে গঙ্গাস্নানে গিয়ে শ্রীনিবাসকে দেখে এলেন। তাঁর আদেশানুসারে ঈশান শ্রীনিবাসকে অন্তঃপুরে নিয়ে এলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী "অন্তঃপট দূর করি" তাঁকে দেখে চৈতন্যদেবের শক্তি বলে বুঝতে পারলেন। এরপর "লজ্জা উপেখিয়া" শ্রীনিবাসকে ডেকে একলা ঘুরে বেড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে শ্রীনিবাস বললেন যে পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে ভাগবত পড়া শেষ করে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পণ্ডিত গোস্বামীর দেহান্তর হওয়ায় তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এত অল্প বয়সে শ্রীনিবাসকে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করলেন। বৈরাগ্যের কাঠিন্যের কথা শুনে শ্রীনিবাস ভীত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশ্রয় ভিক্ষা করলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বহির্বাটিতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই রাত্রে চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আজ্ঞা দিলেন "শ্রীনিবাসকে" অভিরাম স্থানে "পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া।" নিদ্রাভঙ্গের পর বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাসকে অভিরাম গোস্বামীর কাছে পাঠালেন। পথে তাঁদের শান্তিপুর ও খড়দহ হয়ে যেতে বললেন।

প্রেমবিলাসের বর্ণনানুসারে আরও দেখা যায় যে কয়েক বছর পূর্বে অদ্বৈতাচার্যের দেহত্যাগ হলেও শান্তিপুরের পথে শ্রীনিবাসের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের সাক্ষাৎ হলো। অদ্বৈত শ্রীনিবাসকে বললেন যে চৈতন্যদেব তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলে শ্রীনিবাসের জন্ম। তারপর শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন যাওয়ার উপদেশ দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর শান্তিপুরে সীতাদেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে সীতা দেবী অদ্বৈত-গোষ্ঠীর বিভেদের কাহিনী শ্রীনিবাসকে বলছেন। সীতা দেবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে জগাই মাধাই উদ্ধারকালে অদ্বৈতাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে হরিদাসকে বলেছিলেন যে চৈতন্যদেব তাঁকে প্রেম না দিলে তিনি সমস্ত প্রেম শুষে নেবেন। তারপর তিনি নিত্যানন্দের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে জগদানন্দের হাতে তর্জা লিখে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠালেন। সেদিন থেকে চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গী দিলেন রামাই সুন্দরাদিদের এবং কামদেব নাগরকে অদ্বৈতের সঙ্গী করে দিলেন। কিন্তু নাগর জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করায় সীতা দেবী তাঁকে ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে অদ্বৈত-গোষ্ঠী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতের নির্দেশিত পথে চলছে, অপর দল নাগরের পরামর্শে বিপথগামী হয়েছে। সেজন্য সীতা দেবী অতন্ত দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। অদ্বৈত-গোষ্ঠী সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের অনেক সন্দেহ ছিল কিন্তু সীতা দেবীর কথায় তাঁর সকল সন্দেহের অবসান হলো। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনিবাস খড়দহের দিকে রওনা হলেন।

প্রেমবিলাসের পঞ্চম বিলাসের আরম্ভে দেখা যায় যে খড়দহে প্রবেশ করে শ্রীনিবাস আনন্দে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। বীরচন্দ্র জাহ্নবা দেবীর কাছে ছিলেন। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। জাহ্নবা দেবী বুঝতে পারলেন যে কোনও ভাগবতের আগমন হয়েছে এমনকি তিনি শ্রীনিবাসের আগমন সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হলেন। এমন সময়ে ঈশান এসে তাঁদের আগমনবার্তা জানালেন। জাহ্নবা দেবীর আদেশে বীরচন্দ্র শ্রীনিবাসকে তাঁর সামনে উপস্থিত করে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে তাঁকে শক্তি সঞ্চার করে দিতে অনুরোধ জানালেন। জাহ্নব দেবী অভিরাম গোস্বামীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে ঈশানের হাতে দিয়ে শ্রীনিবাসকে সেখানে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। এই পত্রে তিনি অভিরাম গোস্বামীকে আজ্ঞা দিলেন যাতে তিনি শ্রীনিবাসকে তাঁর জয়মঙ্গল চাবুক দিয়ে তিনবার স্পর্শ করেন।

অভিরাম গোস্বামী জাহ্নবা দেবীর এই পত্র পেয়েও শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি সেই উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাসের হাতে আটটি কড়ি দিলেন। এই কড়ি দিয়ে শ্রীনিবাস যখন রন্ধনের উদ্যোগ করছেন তখন অভিরাম দু'জন বৈষ্ণব পাঠালেন। তাঁদের সঙ্গে একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করায় অভিরাম গোস্বামী সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনিবাসকে তিনবার চাবুক স্পর্শ করালেন। এরপর মালিনী দেবী এসে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। অভিরাম গোস্বামীর আশীর্বাদ লাভ করে শ্রীনিবাস আবার শ্রীখণ্ডে ফিরে এলেন। সেখানে নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশ নিয়ে তিনি যাজিগ্রামে মায়ের কাছে ফিরে এলেন। মায়ের কাছে দুদিন থেকে তিনি এবার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

শ্রীনিবাসের গৌড় পরিক্রমার যে কাহিনীর গোড়াপত্তন অনুরাগবল্লীতে দেখা গিয়েছিল সেটি ভক্তিরত্নাকরে পল্লবিত হতে দেখা গিয়েছে। প্রেমবিলাসে এই কাহিনী আরও বিস্তারলাভ করেছে। অনুরাগবল্লীতে শ্রীনিবাসের গৌড় পরিক্রমার কারণ বিবৃত করে বলা হয়েছে যে তিনি চিরকালের মতন দেশত্যাগ করে বৃন্দাবন যাচ্ছেন বলে গৌড়ের কয়েকটি স্থান দর্শন করে নিতে চেয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে না বলা হলেও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্রেমবিলাসে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস বিনা উদ্দেশ্যেই যাজিপুর থেকে শ্রীখণ্ড হয়ে নবদ্বীপ এলেন।

নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনায় অনুরাগবল্লীতে পণ্ডিত গোস্বামী ও গদাধর দাসের প্রহেলিকার কাহিনীর সংযোগ আছে। গদাধর দাসের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীনিবাস প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সংকল্প নিয়ে গঙ্গার তীরে পড়েছিলেন। সেই সূত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে এই কাহিনীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীর মতে শ্রীনিবাস নবদ্বীপে এসে বংশীদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দর্শন লাভ করেন। প্রেমবিলাসে এই দুই কাহিনীকে একত্র করে নেওয়া হয়েছে। তবে গদাধর দাসের প্রসঙ্গ এখানে নেই। পণ্ডিত গোস্বামীর শোকে শ্রীনিবাস অধীর হয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে ছিলেন বলে বলা হয়েছে, তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা ঈশান ও বংশীদাসের মাধ্যমে হয়েছিল বলা হয়েছে।

অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে গৌড় ভ্রমণকালে শ্রীনিবাস যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কারণ তিনি সর্বত্র একাকী ভ্রমণ করছেন। কিন্তু প্রেমবিলাসে তাঁকে স্পষ্টভাবে অল্পবয়স্ক বলা

হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে অল্পবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করছেন এবং ঈশানকে সঙ্গে দিয়ে শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি স্থানে পাঠাচ্ছেন।

ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় শ্রীনিবাস স্বপ্নে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের দর্শন পেয়েছিলেন। প্রেমবিলাসে দেখা যাচ্ছে তিনি জাগ্রত অবস্থাতেই অদ্বৈতাচার্যের দর্শন পেয়েছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যা বলা হয়েছে তা ইতিপূর্বে অন্য কোনও গ্রন্থে বলা হয় নি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক শ্রীনিবাসের পরীক্ষা গ্রহণও এই গ্রন্থে পাওয়া গেল।

অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থের এই অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়েছে নীলাচল থেকে ফিরে আসার পর এবং বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে শ্রীনিবাসের গৌড় পরিক্রমার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। সেই মতানুসারে প্রেমবিলাসের এই বর্ণনাকেও সত্য বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়।

প্রেমবিলাসে এ সময়ে শ্রীনিবাসের বয়স সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেওয়া আছে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে এ সময় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সমসাময়িককালে রচিত বলে যে দাবী এই গ্রন্থে করা হয়েছে সে সম্বন্ধে নানা সন্দেহের মধ্যে শ্রীনিবাসের এ সময়কার বয়স সম্বন্ধে আলোচ্য ত্রুটিকেও একটি অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

শান্তিপুরে শ্রীনিবাসের কাছে অদ্বৈতাচার্য ও সীতাদেবীর নিজ দুঃখের কাহিনীর যে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া আছে তার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে স্বীকার করা যায় না। প্রেমবিলাসের গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে যে চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের ওপর ভয়ানক বিরক্ত ছিলেন সেকথা প্রমাণের চেষ্টা আছে। এখানে অদ্বৈতাচার্যকে দিয়ে সেকথার পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সীতা দেবীর বিবৃতিতে। জগাই মাধাই উদ্ধারের কালে অদ্বৈতাচার্যের ক্রোধের কারণ কি এবং "শুষিনু সকল প্রেম" বলারই বা কারণ কি বোঝা গেল না। জগাই মাধাই উদ্ধারে অদ্বৈতাচার্যের ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনও কারণ চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যভাগবতে আছে যে প্রথমদিন জগাই মাধাই মত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে তাড়া করলে তাঁরা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। সেদিন হরিদাস এসে আচার্যের কাছে নিত্যানন্দের নামে নালিশ করলে অদ্বৈতাচার্য পরিহাস করে বলেছিলেন যে যেখানে তিন মদ্যপ

একত্রিত হয়েছিল সেখানে হরিদাসের মতন বৈরাগীর উপস্থিত থাকা শোভা পায় না।[১৩] মনে হয় চৈতন্যভাগবতের এই উক্তি প্রেমবিলাসে অদ্বৈতাচার্যের ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনা ঘটেছিল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এবং অদ্বৈতাচার্য তর্জা পাঠিয়েছিলেন—১৫৩১।৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। এত দিনের ব্যবধানের এই দুই ঘটনার মধ্যে কি যোগসূত্র থাকতে পারে যার জন্য সীতাদেবী এই দুই ঘটনাকে এক নিঃশ্বাসে বললেন তাও বোধগম্য হয় না। মনে হয় অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর গোষ্ঠীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ বিবৃতির অবতারণা করা হয়ে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা লক্ষ্য করার বিষয়। সীতাদেবী এত কথা বলছেন অপরিচিত একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে যে তখনও একা পথ চলতে পারে না। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকটির মনে অদ্বৈত-গোষ্ঠী সম্বন্ধে নানা কৌতূহল ছিল। সীতাদেবীর কথায় সে সব সন্দেহ দূর হলো। এই বর্ণনা যে কতখানি অবাস্তব সেটা ব্যাখ্যা করে দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। গ্রন্থটি সমসাময়িক বঙ্গে স্বীকার না করার এটিও একটি বড় কারণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক শ্রীনিবাসের ভোগ গ্রহণের সময়ে বৈরাগী পাঠিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ প্রেমবিলাসের অপর অবাস্তব বর্ণনা। অনুরাগবল্লীতে অভিরাম গোস্বামী কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের কাহিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ অভিরাম গোস্বামীর ক্ষেত্রেও সেটিকে বর্জন করা হয় নি। অনুরাগবল্লীর বর্ণনা কতখানি সত্য তা বলা কঠিন হলেও কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে বৈরাগ্যের এই পরীক্ষা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রেমবিলাসে যেখানে শ্রীনিবাসকে বালক বলে বলা হয়েছে সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ও অভিরাম গোস্বামী একইভাবে দুবার পরীক্ষা গ্রহণ করলেন একথা শুধু অবিশ্বাস্যই নয় সম্পূর্ণ অবাস্তব। সমসাময়িক কোনও গ্রন্থে এ শ্রেণীর অবাস্তব ঘটনার বর্ণনা অকল্পনীয়।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তুতি পর্বের আলোচনায় দেখা গেল কর্ণপূর কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে রচিত নানা গ্রন্থে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্যে একমাত্র কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনাকে নানা কারণে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো এটি আচার্যের শিষ্য কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণনায় আচার্যের চরিত্রের একাগ্রতা ও দৃঢ়তার যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকার করা যায়। তৃতীয়তঃ এখানে

---

[১৩] চৈ. ভা. মধ্য ১৩শ অধ্যায় (বসুমতী সং)।

তাঁর কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে তাঁর নীলাচল থেকে ফিরে গৌড় হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাকে বাস্তবতাসম্মত বলে স্বীকার করতে হয়।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব দেখা যায় পরবর্তী-কালে রচিত তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে। অনুরাগবল্লীতে তাঁর গৌড় পরিক্রমার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে চিরদিনের জন্য বৃন্দাবন চলে যাবেন বলে শ্রীনিবাস গৌড়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন এবং দেশের উত্তর দিক থেকে ভ্রমণ করে দক্ষিণে এলেন। আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাত্রা করে বৃন্দাবন গেলেন। এই রচনায় গদাধর দাসের কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা দেখানো হয় নি যা কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাও অনুরাগবল্লীর অনুরূপ তবে আরও বিস্তৃত। এখানেও অনাবশ্যকভাবে শ্রীনিবাসকে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভ্রমণ করানো হয়েছে। বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে এভাবে তাঁর সময় নষ্ট করার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় না। প্রেমবিলাসের বর্ণনা আরও অযৌক্তিক এবং অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

তবে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে ফিরে এসে আড়িয়াদহে গদাধর দাসের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন। তারপর খড়দহ, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ হয়ে শ্রীখণ্ডে যান। এই সঙ্গে অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। তারপর যাজিগ্রামে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বীরভূমের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হন। সেক্ষেত্রে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণকে—বিশেষতঃ শ্রীনিবাসের গৌড়-পরিক্রমার ক্রমকে একটু পরিবর্তন করে নিয়ে—স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে, যদিও তার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহ থেকে যায়। কারণ শ্রীনিবাস অভিরাম গোস্বামীর কৃপালাভ করেছিলেন সেকথা কর্ণপূর কবিরাজ সগৌরবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সীতা দেবী, জাহ্নবী দেবী, বিশেষতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশীর্বাদ লাভ করে থাকলে সে কথা লিখতেন না—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তৎসত্ত্বেও অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে এইসব সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে বলে কর্ণপূর কবিরাজ লিপিবদ্ধ না করলেও এই সাক্ষাৎকারগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে আচার্য তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয়বার নীলাচল গমনের মাঝখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ আচার্যের

দ্বিতীয়বার নীলাচল হতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বিবরণ আরম্ভ করেছেন বলে এই সাক্ষাৎকারগুলির বর্ণনা দেন নি। ভুল সময় নির্দিষ্ট করায় এই গ্রন্থগুলিতে এগুলি পরবর্তী বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

বৃন্দাবনের পথে শ্রীনিবাস—গুণলেশসূচকে শ্রীনিবাসের গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথের কোন বর্ণনা নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে গৌড়ের বৈষ্ণব মহাজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে শ্রীনিবাস সোজা মথুরা পৌঁছে গেলেন[১৫]। অনুরাগবল্লীতেও এই রচনার প্রভাবে শ্রীনিবাসের গৌড় থেকে সোজা মথুরা প্রবেশের উল্লেখ পাওয়া যায়[১৬]। গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথের বর্ণনা পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকর[১৭] ও প্রেমবিলাসে[১৮]। এই দুই গ্রন্থের বর্ণিত পথ দুটিও ভিন্ন। কাজেই এই দুটি বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি নির্ভরযোগ্য তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় যাজিগ্রাম থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। এখান থেকে প্রথম গেলেন সপ্তগ্রাম আদি গ্রামগুলিতে। এরপর তিনি কাটোয়ায় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান দর্শন করে এলেন মৌড়েশ্বরে। বীরভূম জেলায় অবস্থিত মৌড়েশ্বর শিব দর্শন করে তিনি গেলেন কুণ্ডলীদমনে। সেখান থেকে নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রা গ্রাম হয়ে শ্রীনিবাস গয়া গেলেন। সেখানে চৈতন্যদেব ও ঈশ্বরপুরীর মিলনস্থান দর্শন করে শ্রীনিবাস কাশী পৌঁছুলেন। এখানে চন্দ্রশেখরের ভবনে উপস্থিত হলে কাশীতে চৈতন্যদেব যে স্থানে থাকতেন তাঁর শিষ্য সে স্থান দেখালেন। কাশীতে দিনকতক অবস্থান করে চৈতন্যদেবের ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীনিবাস অযোধ্যা ও প্রয়াগ হয়ে মথুরাতে প্রবেশ করলেন।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্নস্থানে তীর্থযাত্রীদের সমাগম অব্যাহত আছে। কাজেই এক তীর্থ থেকে অপর তীর্থ পর্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই যাতায়াতের উপযুক্ত পথও নিশ্চয়ই ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে শ্রীনিবাসের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ঘুরে বৃন্দাবন যাওয়ার বর্ণনাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তবে প্রশ্ন এই যে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার সম্ভাব্য পথ কোন্‌টি হতে পারে? নরহরি চক্রবর্তী গৌড়বঙ্গের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিয়ে শ্রীনিবাসের সোজা গয়া পৌঁছানোর কথা বলেছেন। কিন্তু গৌড় থেকে গয়া যাওয়ার

---

১৫. শ্রীনি. গু. সূ. ১৯ তম শ্লোক। ১৬. অ. ব. ৩য় মঞ্জরী। ১৭. ভ. র. ৪র্থ তরঙ্গ।
১৮ প্রে. বি. ৫ম বি।

কতকগুলি পথ ছিল এবং কোন্ পথে শ্রীনিবাসের যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক, নরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনা থেকে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই অনুসারে আমরা প্রেমবিলাসে বর্ণিত পথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারব।

নবদ্বীপ থেকে গয়া যাওয়ার পথ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আলোচনা বোধহয় মুরারি গুপ্তের। চৈতন্যদেবের গয়া যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি এই পথের কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থেও এই পথের খানিকটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তৎপরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপ থেকে গয়া যাওয়ার পথের খানিকটা বর্ণনা দিয়েছেন। তারও পরে জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁদের গ্রন্থে নবদ্বীপ থেকে গয়ার পথের বর্ণনা দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতন গোস্বামীর গৌড় থেকে কাশী যাওয়ার পথ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস দিয়েছেন।

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও অন্যান্যদের বর্ণিত চৈতন্যদেব কর্তৃক নবদ্বীপ থেকে গয়া গমনের পথ সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'-এ আলোচনা করেছেন[১১]। এই আলোচনায় দেখা যায় মুরারি গুপ্তের বর্ণিত পথ হলো—চোরান্ধায়ক নদী পার হয়ে মন্দার পর্বত অতিক্রম করে রাজগীর এবং সেখান থেকে গয়া। কবিকর্ণপূরের বিবরণ মুরারির বিবরণের অনুরূপ। বৃন্দাবনদাসের মতে চৈতন্যদেব মন্দার হয়ে পুনপুনা যান। সেখান থেকে তিনি গয়া গিয়েছিলেন। তিনি এপথে রাজগীরের উল্লেখ করেন নি। লোচনদাসের মতে চৈতন্যদেব মন্দার পর্বত হয়ে পুনপুনা যান। সেখান থেকে আসেন রাজগীর। তারপর তিনি গয়া আসেন। লোচনদাসের বর্ণিত পথ থেকে বোঝা যায় তিনি মুরারি ও কবিকর্ণপূরের বর্ণনার সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত পথের একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। লোচনদাসের এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পুনপুনা পাটনার কাছে। গয়া থেকে রাজগীর ও পুনপুনা দুটি ভিন্ন পথ। চৈতন্যদেবের এত ঘুরে গয়া যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

জয়ানন্দের বর্ণিত পথ পূর্বোক্ত পথগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে চৈতন্যদেব কানাই-এর নাটশাল হয়ে রাজগীর আসেন। সেখান থেকে গয়া। ফেরার সময় তিনি মন্দার পর্বত হয়ে বৈদ্যনাথধাম হয়ে নবদ্বীপ আসেন। চৈতন্যদেবের ফেরার পথের কথা ইতিপূর্বে কেউ বলেন নি।

কানাই-এর নাটশাল থেকে নবদ্বীপে ফেরার যে পথ ছিল তার বর্ণনা

---

[১১] চৈ. চ. উ.—পৃ. ২৪১-২৪৬

পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে। এখানে দেখা যায় নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব রামকেলিতে পৌঁছেছিলেন। সেখানে রূপসনাতন তাঁকে লোকজন নিয়ে বৃন্দাবন যেতে নিবৃত্ত করলে তিনি কানাই-এর নাটশাল হয়ে শান্তিপুর চলে আসেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্বে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। অনুমান করা যায় জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুটি ভিন্ন সূত্র থেকে এই একই পথের সংবাদ সংগ্রহ করে থাকবেন।

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে গৌড়বঙ্গ থেকে গয়া যাওয়ার মোটামুটি দুটি পথ ছিল। একটি পথ ছিল বৈদ্যনাথ ও মন্দার হয়ে রাজগীর ও গয়া। দ্বিতীয় পথ হলো কানাই-এর নাটশাল হয়ে রাজগীর ও গয়া। নরহরি চক্রবর্তী শ্রীনিবাসের গৌড়বঙ্গ থেকে গয়া পর্যন্ত পথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি বর্ধমান জেলা থেকে বীরভূমে প্রবেশ করে ক্রমশঃ উত্তরে একচক্রা পর্যন্ত গিয়েছেন। সেখান থেকে বৈদ্যনাথধাম হয়ে মন্দার পর্বত ও রাজগীরের পথে গয়া পৌঁছেছেন। একচক্রা থেকে বৈদ্যনাথধামের দূরত্ব প্রায় দেড়শত কিলোমিটার। দুমকা হয়ে এদিকে যাওয়ার পথ বর্তমানে আছে। ষোড়শ শতাব্দীতেও এই পথ থাকা অসম্ভব নয়।

গয়া থেকে কাশী যাওয়ার সোজা পথ হলো গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাওয়া। গয়া থেকে দক্ষিণে খানিকটা এসে এই পথ পাওয়া যায়। এই পথটি কাশী হয়ে প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়েছে। এ সময়ে গৌড়ের প্রান্তে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। কাজেই এই রাজপথ ধরে গয়া থেকে কাশী এবং সেখান থেকে প্রয়াগ যাওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীনিবাসের অযোধ্যা যাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হতে পারে। প্রথমতঃ এটি কাশী থেকে প্রয়াগ যাওয়ার পথে পড়ে না। অযোধ্যা খানিকটা উত্তরে, কাশী থেকে প্রয়াগের পথ হতে অনেক ভেতরে। তাছাড়া কাশী ও প্রয়াগ চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত, কিন্তু অযোধ্যায় তাঁরা কেউ গিয়েছিলেন বলে জানা নেই। কাজেই শ্রীনিবাসের অযোধ্যা যাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রয়াগ থেকে মথুরা যাওয়ারও কোন বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে নেই। এলাহাবাদ থেকে গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কানপুর, আগ্রা ও মথুরা হয়ে দিল্লী অভিমুখে গিয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে আচার্যও এই পথে মথুরা পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাস যে এত ঘুরে এই পথে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করতে করতে গিয়েছিলেন—একথা স্বীকার করার যুক্তি আছে কি না বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বৃন্দাবনে গোস্বামীদের কাছে ভাগবত পড়ার অধীর আগ্রহে যিনি গৌড় থেকে রওনা হয়েছেন তিনি পথে তীর্থদর্শন করতে করতে বৃথা কালক্ষেপ করবেন—একথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে সেকালে একমাত্র সংসারে বিবাগীরাই বৃন্দাবনে স্থায়ী বসবাসের জন্য যেতেন—যার জন্য আচার্যকে অভিরাম গোস্বামীর কাছে বৈরাগ্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আচার্যের বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়কার ঘটনাবলী বিচার করার সময় আমরা দেখব যে তিনিও বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। কাজেই পথের দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলি—বিশেষতঃ যেগুলি চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত—সেগুলো দর্শন করে যাওয়া আচার্যের পক্ষে অযৌক্তিক নয়।

অন্যভাবে হিসাব করেও দেখা যায় যে ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণ অযৌক্তিক নয়। এই গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী আচার্য অগ্রহায়ণ মাসে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন এবং পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন বৈশাখ মাসের শেষের দিকে। অর্থাৎ এই পথে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ মাস। ভক্তিরত্নাকরে তাঁর যাত্রারম্ভের তারিখ সঠিকভাবে বলা হয়ে থাকলে এই দীর্ঘ পথে এসব দর্শনীয় স্থানগুলো দর্শন করে যেতে এসময় লাগতে পারে।

ভক্তিরত্নাকরের পূর্বে কোনও গ্রন্থে শ্রীনিবাসের যাত্রাপথের কোন বিবরণ দেওয়া না থাকলেও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। পূর্বোক্ত কারণগুলো ছাড়াও অপর প্রধান কারণ হলো—যে সব তীর্থের নাম এই প্রসঙ্গে করা হয়েছে সেগুলো বহু প্রাচীন তীর্থ এবং প্রাচীনকাল থেকে এসব স্থানে যাতায়াতের পথও নিশ্চয় ছিল। আলোচ্য পথগুলি ছাড়া সেকালে অন্য কোন পথ না থাকাই সম্ভব। কাজেই শ্রীনিবাস সেকালের প্রচলিত পথে বৃন্দাবন রওনা হয়েছিলেন এবং পথে যে সব তীর্থ—বিশেষতঃ যেগুলো চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত—সেগুলো দর্শন করেছিলেন, একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থকার নিজেও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন। মনে হয় তিনি এই পথে যাতায়াত করেছিলেন বলে স্থানগুলির এবং এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতায় শ্রীনিবাসের

পথের বর্ণনা বাস্তবানুগ হয়েছে। আচার্যের যাত্রারম্ভের তারিখ সম্বন্ধে হয়তো নিশ্চিত হয়েই তিনি আচার্যের যাত্রাপথের এই বিস্তৃত বিবরণ দিতে পেরেছেন।

প্রেমবিলাসেও শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাওয়ার পথের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণের প্রথমাংশের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের কোন সামঞ্জস্য নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস যাজিগ্রাম থেকে রওনা হয়ে পঞ্চম দিনে সোজা রাজমহল পৌঁছালেন। সেখান থেকে গড়িদ্বার হয়ে গেলেন পাটনায়। পাটনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে তিনি গেলেন বারাণসী। সেখান থেকে দ্বিতীয় দিবসে প্রয়াগ। এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বৃন্দাবন পৌঁছানোর চারদিনের পথ থাকতে তিনি সনাতনের তিরোধানের সংবাদ পেলেন। এরপর শ্রীনিবাস পৌঁছালেন আগ্রা। আগ্রা থেকে রাজপথ ত্যাগ করে তিনি যমুনা পার হয়ে নন্দালয় গোকুলে গেলেন। এরপর শ্রীনিবাস এলেন মথুরাতে। সেখানে এসে তিনি আবার রূপ গোস্বামীর তিরোধানের সংবাদ পেলেন।

দেখা যাচ্ছে নিত্যানন্দদাস বর্ণিত কাশী পর্য্যন্ত পথ পূর্ববর্ণিত সমস্ত পথ থেকেই ভিন্ন। এই গ্রন্থে বর্ণিত পথকে স্বীকার করে নিলে ধরে নিতে হবে শ্রীনিবাস যাজিগ্রাম থেকে বার হয়ে সোজা উত্তরে রাজমহল হয়ে গড়িদ্বারে গঙ্গার কাছে পৌঁছান, তারপর সেখান থেকে গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে গেলেন পাটনা এবং সেখান থেকে বারাণসী। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই বিবরণকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয়। প্রথমতঃ সেকালে এরকম কোন পথ ছিল বলে জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ গয়া হয়ে বারাণসীর যে পথের সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় সেই পথে বৃন্দাবন যেতে প্রেমবিলাসে বর্ণিত পথ অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগার কথা। গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন বলে প্রেমবিলাসে দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁর বৃন্দাবনের পথ বর্ণনায় সেরকম অভিজ্ঞতার কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই পথকে অস্বীকার করার আরও কারণ আছে। রাজমহল, পাটনা প্রভৃতি স্থানগুলি তীর্থান্বেষীদের প্রচলিত পথ থেকে অনেকদূরে অবস্থিত। তীর্থগুলির মধ্য দিয়ে সোজা পথ থাকতে শ্রীনিবাস বিনা কারণে দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথে ঝুঁকি নিয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করা যায় না।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রার শেষ পর্যায়ে প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে তিনি সনাতনের দেহত্যাগের খবর পেয়েও আগ্রা এলেন এবং সেখানে থেকে

যমুনা পার হয়ে গেলেন গোকুলে। তারপর তিনি মথুরাতে প্রবেশ করলেন। এই বিবরণকেও যুক্তিসঙ্গত বলা চলে না। কারণ এই গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে আগ্রা পেঁাছানোর আগেই আচার্য সনাতনের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়েছিলেন। একথা ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায় নি। তাছাড়া এতবড় দুঃসংবাদ পেয়েও তিনি বৃন্দাবনে তাড়াতাড়ি পেঁাছানোর পরিবর্তে আগে গোকুলে গেলেন। একথাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বার হন নি। তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। সেক্ষেত্রে এঁদের একজনের তিরোধানের সংবাদে তঁার সর্বাগ্রে বৃন্দাবন পেঁাছানোর চেষ্টা করার কথা।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনের পথের যে দুটি বিবরণ পাওয়া গিয়েছে সেগুলির বিচার বিশ্লেষণের পর দেখা যাচ্ছে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত পথটি বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু প্রেমবিলাসে বর্ণিত পথ গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনপর্ব—শ্রীনিবাসাচার্য মোট তিন বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। বর্তমান পর্বে তঁার প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রা আমাদের আলোচ্য বিষয়। তঁার এই বৃন্দাবনপর্বকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে তঁার বৃন্দাবন প্রবেশ, দ্বিতীয়ভাগে সেখানকার তৎকালীন বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গে তঁার সাক্ষাৎকার, দীক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন ও আচার্য উপাধি লাভ এবং তৃতীয়ভাগে তঁার গৌড় প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনপর্বের প্রথম ভাগ অর্থাৎ তঁার বৃন্দাবন প্রবেশ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন মুখ্যতঃ কাল নির্ণয়ের জন্য। দেখা গিয়েছে তৎকালীন জীবনীকাররা কালের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তিথি-নক্ষত্রের উল্লেখ কোথাও কোথাও করলেও সে সম্বন্ধে এত অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন যে তা থেকে কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন প্রবেশের সময় সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তথ্য এই জীবনীগ্রন্থগুলিতে পরিবেশিত হয়েছে যা থেকে তঁার বৃন্দাবন প্রবেশের সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে প্রবেশের কালনির্ণয়ের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আচার্যের প্রত্যেক জীবনীকারই বলেছেন যে তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবনে আগমনের অল্পকাল পূর্বে রূপ গোস্বামী দেহত্যাগ করেছেন। কাজেই তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় করতে পারলে ষোড়শ শতাব্দীর একটি

অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

কর্ণপূর কবিরাজের শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকের ১৯তম শ্লোক থেকে ৩২তম শ্লোক পর্যন্ত চৌদ্দটি শ্লোকে আচার্যের বৃন্দাবন প্রবেশ এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। অত্যন্ত সংক্ষেপে—প্রায় সাংকেতিক ভাষায় প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় এই শ্লোকগুলির বক্তব্য বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সূচকের ১৯তম শ্লোকে বলা হয়েছে (অভিরাম গোস্বামীর আশীর্বাদ লাভের পর) শ্রীনিবাস শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতনেরও (স্তুজ্‌জ্যেষ্ঠস্য সনাতনস্য চ) পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করে আনন্দিত মনে সত্বর ব্রজে যাচ্ছিলেন। মথুরা নগরে তাঁর তিরোধান (তদ্‌গোপনং) শুনে তিনি ভূপাতিত হলেন।

আলোচ্য শ্লোকটিতে লক্ষ্য করার বিষয় আচার্য শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করে সত্বর ব্রজে যাচ্ছিলেন এবং মথুরা নগরে তাঁর অর্থাৎ শ্রীরূপের তিরোধান-সংবাদ পেয়েছিলেন। হরিদাস বাবাজী তাঁর গ্রন্থে এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন যে শ্রীরূপসনাতনের পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ব্রজে প্রবেশ করিলেন, মথুরানগরে রূপসনাতনের অপ্রকটবার্তা শুনিয়া মূর্ছিত হইয়াছিলেন।[১০০] কিন্তু শ্লোকটি ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে এখানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতনের গৌণ উল্লেখ আছে এবং 'তদ্‌গোপনং' বলতে রূপ গোস্বামীর কথাই বোঝানো হচ্ছে। 'তদ্‌' শব্দটি একবচন, দ্বিবচন কিংবা বহুবচন নয়। হরিদাস দাস বাবাজীর অন্যান্য শ্লোকের অনুবাদেরও এরকম ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে ১১শ শ্লোকের অভিরাম গোস্বামীর বাসস্থান হিসাবে বীরলোকের কথা উল্লেখ করা হলেও তিনি তাঁর অনুবাদে এই স্থানকে 'খানাকুল কৃষ্ণনগর' বলেছেন।[১০১] বর্তমানে অভিরাম গোস্বামার পাট 'খানাকুল কৃষ্ণনগর' বলে প্রচলিত থাকলেও ভক্তিরত্নাকর ও রামগোপালদাসের পাটনির্ণয়ে এই স্থানকে স্পষ্টভাষায় 'বীরলোক কৃষ্ণনগর' বলা হয়েছে (এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি)। পরবর্তী আলোচনায় তাঁর আরও কয়েকটি ত্রুটি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এগুলো থেকে মনে হয় বাবাজী

---

[১০০] শ্রীনি গু সূ—পৃ. ৪৩। [১০১] ঐ—পৃ. ৪২।

বিশেষ যত্ন নিয়ে অনুবাদ করেন নি এবং এই ভুল অনুবাদের ওপর নির্ভর করে রূপসনাতনের তিরোধান বিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার[১০২] ও ডঃ নরেশচন্দ্র জানা[১০৩] ভুল সিদ্ধান্তে এসেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করছি।

সূচকের পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাচ্ছে শ্রীরূপের তিরোধান-বার্তা শুনে শ্রীনিবাস বিলাপ করে বলছেন "হায় হায় রূপ কোথায় গেলেন, তাঁর অগ্রজই বা কোথায় গেলেন। ধিক আমাকে যে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করেও জীবিত আছে। হে বিধাতা তুমি দুর্বলের হত্যাকারী, তোমাকে ধিক", একথা বলে অশ্রু দ্বারা ভুবন সিঞ্চন করতে লাগলেন।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে আচার্যের বিলাপের মুখ্য লক্ষ্য হলেন শ্রীরূপ। প্রসঙ্গক্রমে সনাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। শুধুমাত্র এই শ্লোকটির একমাত্র এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও, পূর্ববর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাচ্ছে বার বার এভাবে বিলাপ করে শ্রীনিবাস একবার উঠছেন আবার শুয়ে পড়ছেন। 'এই বৃথা শরীর নিয়ে বৃন্দাবনদর্শন করে কি করব। 'ব্রজে যাবো না' মনে মনে এরূপ স্থির করে তিনি বিমুখ হলেন।

এরপর ২২তম থেকে ২৬তম শ্লোক পর্যন্ত বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের আগমনের পটভূমি প্রস্তুতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২২তম শ্লোকের বিবরণানুসারে শ্রীরূপ কর্তৃক বৃন্দাবনে আনীত কৃতবিদ্য শিশু শ্রীজীব গোস্বামীকে সনাতন কালিন্দীর জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধতনু করলেন, তারপর তাঁকে আপনার শক্তি সঞ্চার করলেন। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাচ্ছে সনাতন গোস্বামী শ্রীজীবকে বলছেন—"বৎস, তোমাকে ব্রজে স্থাপনের উদ্দেশ্য শোন। আমার রচিত গ্রন্থগুলির সহজবোধ্য টীকা প্রস্তুত কর। এই গ্রন্থগুলিতে এবং মুরারি-পদে তোমার সদ্‌ভক্তি স্থাপন করে পাষণ্ড নিবারণ কর এবং গোবিন্দসেবা কর।" পরবর্তী শ্লোকের বিবরণে দেখা যায় শ্রীজীব এর উত্তরে বলছেন "আমি শিশু তথা অল্পমতি। আমার শক্তিই বা কোথায়। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আমাকে একজন সঙ্গী দান করুন।" এর পরবর্তী শ্লোকের বক্তব্য—একথা শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী একটু চিন্তা করে বললেন "শোন, আমি তোমাকে একজন

---

[১০২] ষো শ প. সা—পৃ ১১৮। [১০৩] বৃ. ছ. গো.—পৃ. ৮৯।

সঙ্গী দিচ্ছি। গৌড় থেকে কোন একজন কৃশতনু ব্রাহ্মণকুমার বৈশাখ মাসের বিশ তারিখে মথুরাতে আসবেন। তিনি বৃন্দাবনে এসে তোমার সঙ্গী হবেন।"

বরানগর পাটবাড়িতে রক্ষিত পুথিতে এই শ্লোকটির তারিখের অংশটি লেখা হয়েছে "বৈশাখমাসেংশকে বিশেদ"। এই পুথিটি জীর্ণ। লেখাতেও ত্রুটি ও ভ্রান্তির কথা হরিদাস দাস বাবাজী স্বীকার করেছেন।[১০৪] 'বিশেদ' শব্দটি সম্বন্ধে তাঁরও সন্দেহ ছিল। সেজন্য শ্লোকটির এই শব্দের পাশে তিনি (?) চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। বৃন্দাবনস্থিত পুথিতে তিনি এই অংশের পাঠ পেয়েছেন "শকে বিংশে।" তৎসত্ত্বেও এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ফলে তিনি এর অনুবাদ দিয়েছেন "আগামী বৈশাখ মাসে কৃশতনু এক ব্রাহ্মণকুমার" ইত্যাদি।[১০৫] ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারও শ্লোকটির এই অনুবাদ গ্রহণ করেছিলেন।[১০৬] তিনিও শ্লোকের মধ্যে যে ভুল আছে সেদিকে লক্ষ্য করেন নি। প্রকৃত পক্ষে এই অংশটির নির্ভুল পাঠ হলো—"বৈশাখমাসেঽংশকে বিংশে"। পুথিতে লুপ্ত 'অ' কারের চিহ্ন না থাকা দুর্বোধ্যতার কারণ। এর অর্থ পরিষ্কারভাবে দাঁড়ায়—"বৈশাখ মাসের বিশ তারিখে"। ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের বৃন্দাবনে আগমন উপলক্ষে এই তারিখের উল্লেখ আছে।[১০৭] মনে হয় নরহরি চক্রবর্তী তারিখটি কর্ণপূর কবিরাজের এই রচনা থেকেই পেয়েছিলেন।

পরবর্তী অর্থাৎ ২৬তম শ্লোকে দেখা যায় রূপ গোস্বামীর এই কথা মনে রেখে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের আগমন প্রতীক্ষা করে বৃন্দাবনে দিন যাপন করতে লাগলেন। তৎপ্রেরিত দূত মথুরাতে গিয়ে তাঁকে সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।

এরপর ২৭তম শ্লোকের বক্তব্য হলো—মথুরাতে শ্রীনিবাস যখন শোকাভিভূত হয়েছিলেন সেসময়ে লোকমুখে তিনি গোস্বামীর এই কথা (অর্থাৎ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমনের ভবিষ্যদ্বার্তা) শুনতে পেলেন। একথা শুনে তিনি লুব্ধমতি হয়ে তাড়াতাড়ি ব্রজে যেতে মন স্থির করলেন। তিনি আরও শুনলেন যে ব্রজমণ্ডলে ভট্টগোস্বামীও প্রকট আছেন।

পরবর্তী ২৮ থেকে ৩২তম শ্লোকগুলির মোট বক্তব্য হলো—শ্রীনিবাস যমুনায় স্নান করে বৃন্দাবনে প্রবেশ করার সময় ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

---

[১০৪] শ্রীনি. গ্র. মা—পৃ. ২৫। [১০৫] ঐ—পৃ. ৪৪। [১০৬] শ্লো শ প. সা.—পৃ. ১১১।
[১০৭] ভ র. ৪ ।২৩৪।

তারপর একটি কদম্ববৃক্ষের তলায় বসে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভায় মন্দির, ব্রজবাসীদের গৃহ ও গোস্বামীদের কুটির দর্শন করে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছিলেন।

হরিদাস দাস বাবাজীর গ্রন্থের আদেশামৃত-স্তোত্রে দেখা যায় শ্রীনিবাস স্বয়ং চৈতন্যদেব কর্তৃক বৃন্দাবনে যেতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এই রচনার তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেব শ্রীনিবাসকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন “তুমি আমারই নিজ শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেছ। শীঘ্র বৃন্দাবনে গমন কর। সেখানে শ্রীরূপ শ্রীজীব প্রভৃতি কৃতী পুরুষ আছেন। আমি পূর্বেই তাঁদের গ্রন্থরাজি তোমাকে অর্পণ করতে আদেশ দিয়েছি। তুমি নিঃসন্দেহে সেগুলি গ্রহণ কর এবং গৌড়দেশের জনগণকে শিক্ষা দাও।”

চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেবের এই আদেশ শুনে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের কুঞ্জসমূহের সৌন্দর্যদর্শনে মনোযোগ করলেন। পরে গোস্বামীদের দেহত্যাগের সংবাদ শুনে শোকে হাহাকার করে আকুল হয়ে পথিমধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীসনাতনের সঙ্গে শ্রীরূপ প্রভৃতি গোস্বামীগণ (শ্রীলসনাতনোঽপি সহ তৈঃ শ্রীরূপনামাদিভিঃ) স্বপ্নে তাঁকে বললেন ‘এখন তোমার বিষাদের সময় নয়। যেহেতু গোপালভট্ট জীবিত আছেন। তাঁর কাছ থেকে পরমমন্ত্র গ্রহণ কর। গৌড়দেশে গমন করে তুমি বিশেষভাবে মত প্রচার কর। বৈষ্ণবদের শিক্ষা দাও।’

আদেশামৃতের এই শ্লোক তিনটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে শ্রীনিবাস যখন চৈতন্যদেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হচ্ছেন তখন তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের প্রকট থাকার কথাই বলেছেন। সনাতনের কোন উল্লেখ এখানে নেই। এথেকে অনুমান করা যায় তখন সনাতন জীবিত ছিলেন না। এরপর চতুর্থ শ্লোকে গোস্বামীদের দেহত্যাগের কথায় শ্রীরূপ ও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীদের কথা বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে যে বৃন্দাবনে প্রবেশের পূর্বে শ্রীনিবাস এঁদের তিরোধানের সংবাদ পেয়েছিলেন। এই সঙ্গে আলোচ্য পঞ্চম শ্লোকের বর্ণনা লক্ষ্য করার বিষয়। এখানে দেখা যাচ্ছে রূপ গোস্বামী শ্রীনিবাসকে আদেশ দিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সনাতন গোস্বামী আছেন। এই বর্ণনাগুলি থেকে স্বপ্নাদেশের বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করলেও একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবন

রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি জানতেন যে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী জীবিত আছেন। বৃন্দাবনে আসার পর তিনি রূপ গোস্বামীর তিরোধানে বিস্মিত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্তে রূপ গোস্বামীর প্রাধান্য থেকেও আমাদের এই অভিমতের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এদিক থেকে আচার্যের দুই শিষ্য—কর্ণপূর কবিরাজ ও নৃসিংহ কবিরাজের (হরিদাস দাস বাবাজীর মতে তাঁর অপর শিষ্য কলানিধি চট্টরাজ) রচনার সাদৃশ্য বর্তমান।

অনুরাগবল্লীর রচনায় আচার্যের শিষ্যদ্বয়ের রচনার প্রভাব বর্তমান। মনোহর দাসের বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রবেশ করে যখন বিশ্রাম করছেন তখন কয়েকজন মথুরানিবাসীর আলাপ থেকে জানতে পারলেন যে শ্রীরূপ দেহত্যাগ করেছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি সংবাদ পেলেন যে সনাতন গোস্বামী অনেকদিন আগে অপ্রকট হয়েছেন ("সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস")। তারপর রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান হয়েছে। সম্প্রতি কিছুদিন আগে রূপ গোস্বামীও দেহত্যাগ করেছেন। একথা শুনে শ্রীনিবাস বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন—

"বৃন্দাবনে আইলাঙ করিয়া নিশ্চয়। গতমাত্র করিব রূপ চরণাশ্রয়॥
রঘুনাথ স্থানে করিব ভাগবত পঠন। কায়মনোবাক্যে সনাতনের সেবন॥[১০৮]

এরপর বৃন্দাবনে গিয়ে কোন কাজ নেই—এই ভেবে শ্রীনিবাস ফিরে চললেন। রাতে রূপ গোস্বামী তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং গোপালভট্টের কাছে উপাসনা করতে আদেশ দিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে মনোহরদাস রূপ গোস্বামীর বহুপূর্বে সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের কথা স্বীকার করেছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি আচার্যকে দিয়ে বিলাপ করাচ্ছেন এই বলে যে তিনি রূপের চরণাশ্রয় করতে এবং সনাতনের সেবা করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মনোহরদাসের মতে আচার্য জানতেন না যে সনাতন ইতিপূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। মনে হয় রূপসনাতনের তিরোধানকাল সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ আছে তা মনোহরদাসের সময় থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এখানে নূতন যে তথ্য সংযোজিত হয়েছে সেটি হলো রঘুনাথ ভট্টের তিরোধানের সংবাদ। আলোচ্য বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে তিনি সনাতন গোস্বামীর তিরোধানের পর এবং রূপ গোস্বামীর

---

১০৮. অ. ব. ৩য় ম.।

তিরোধানের পূর্বে দেহত্যাগ করেছিলেন ।

অনুরাগবল্লীতে আরও একটি নূতন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । শ্রীরূপের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর শ্রীনিবাস পরদিন বৃন্দাবন যাত্রা করলেন । এদিকে শ্রীজীব সেরাত্রে শ্রীরূপকে স্বপ্নে দেখলেন । তিনি শ্রীজীবকে বললেন—"বৈশাখী পূর্ণিমা সন্ধ্যা আরতির কালে গৌড়দেশ থেকে এক বিপ্র আসবে । তার নাম শ্রীনিবাস । আমার আজ্ঞায় তারে করিহ বিশ্বাস ।" কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস ২০শে বৈশাখ মথুরা পৌঁছেছিলেন । সেখানে তিনি রূপগোস্বামীর শোকে অধীর হয়ে পড়েন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তিনি বৃন্দাবন আসেন । অনুরাগবল্লীর বিবরণে দেখা যাচ্ছে তিনি রূপ গোস্বামীর তিরোধানের কথা শুনে দেশে ফিরে আসতে মনস্থ করেন । কিন্তু রাত্রে রূপ গোস্বামী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পরদিন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন । যেদিন তিনি বৃন্দাবনে শ্রীজীবের সঙ্গে দেখা করেন সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা । কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণানুসারে তিনি যদি ২০শে বৈশাখ মথুরাতে প্রবেশ করে থাকেন তবে অনুরাগবল্লীর বিবরণানুযায়ী স্বীকার করতে হয় শ্রীনিবাস ২১শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে বৃন্দাবনে এসে শ্রীজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন । তারিখ এবং তিথি থেকে সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন নয় । তবে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তারিখ ও তিথির সমাবেশ হওয়া সম্ভব ।

এখন সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কোন্ বৎসরে এই তিথি ও তারিখে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ? সনাতন গোস্বামী ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে ভাগবতের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণীর টীকা রচনা করেছিলেন । অর্থাৎ তিনি এসময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় স্বামী কানু পিল্লাই-এর ইণ্ডিয়ান এফিমেরিস নামক গ্রন্থ থেকে দেখেছেন যে ১৫৫৪-৫৫ খৃস্টাব্দের পর ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বাংলা ২১ শে বৈশাখ ছিল এবং সেদিন বেলা এগারোটার কিছু পরে পূর্ণিমা তিথি আরম্ভ হয়েছিল ।[১০৯] মনোহরদাসের বিবরণকে যথার্থ বলে গ্রহণ করলে এই তারিখ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না ।

এই তারিখ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার আরও কারণ আছে । ভক্তিরত্নাকরের কয়েকটি বিবরণ এই তারিখের ও তিথির অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে মিলে যায় । এই গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীনিবাস মথুরাতে প্রবেশ করে কাশীশ্বর গোস্বামী,

[১০৯] ম যু বা সা. ত. কা.—পৃ. ১২৫ ।

রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের কথা শুনলেন। এই বার্তায় তিনি শোকাহত হয়ে দেশের দিকে ফিরে চললেন। পথে রাত হলো, তখন তিনি "পথে এক বৃক্ষ দেখি তথায় রহিল।" সেখানে ঘুমের মধ্যে রূপ সনাতন তাঁকে বৃন্দাবন ফিরে যেতে বললেন। সেই রাত্রেই রূপ সনাতন জীব গোস্বামীকে দেখা দিয়ে বললেন "বৈশাখ মাসের এই বিংশতি দিনেতে। হইবে অপূর্ব সঙ্গ কহিল পূর্বেতে।"[১১০] অর্থাৎ শ্রীজীবের স্বপ্নাদেশের তারিখ হলো ২০শে বৈশাখ। সে রাত্রে গোপাল ভট্টও এঁদের স্বপ্নে দেখলেন এবং শ্রীনিবাসের কথা শুনলেন।

পরদিন অর্থাৎ ২১শে বৈশাখ শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট—পরস্পরের স্বপ্নের কথা পরস্পরকে বললেন। আলোচনার পর গোপালভট্ট রাধারমণের সিংহাসন যাত্রার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ "শ্রীবৈশাখমাসে শ্রীপূর্ণিমা শুভক্ষণে"[১১১] রাধারমণকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। এদিকে শ্রীনিবাস সেদিন বৃন্দাবন পৌঁছুলেন এবং সন্ধ্যায় গোবিন্দ মন্দিরে গেলেন। শ্রীজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি শ্রীনিবাসের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমা রাত—"বৈশাখী পূর্ণিমা-নিশি শোভা চমৎকার।"[১১২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৫৫২ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বেলা ১১টায় পূর্ণিমা তিথি পড়েছিল। কাজেই তারপর রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা এবং তার পূর্ব পর্যন্ত গোপালভট্টের প্রস্তুতির কথা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়। কাজেই এই তারিখ ও অন্যান্য বিবরণসমূহের সামঞ্জস্য থেকে এটিকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন প্রবেশের সঠিক তারিখ বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-পর্বের প্রথমভাগের যে বিবরণ প্রেমবিলাসে দেখা যায় তা থেকে বোঝা যায় যে প্রয়াগ ও মথুরার মধ্যবর্তী কোনও একস্থানে শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত পাঁচজন ব্রজবাসীর দেখা হয়। এঁদের কাছে শ্রীনিবাস প্রথম শুনতে পেলেন যে চার মাস পূর্বে সনাতন গোস্বামী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। একথা শুনে শ্রীনিবাস ব্যথিত হলেন। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি পরদিন আগ্রা উপস্থিত হলেন। এখান থেকে গোকুল দর্শন করে তিনি মথুরাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে কৃষ্ণ-বিশ্রামের

---

[১১০] ভ. র. ৪।২৩৪। [১১১] ঐ ৭।৩২৪। [১১২] ঐ ৪।২৭৯।

ঘাটে যখন তিনি বিশ্রাম করছেন তখন তিনজন ব্রজবাসী সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের কাছে শ্রীনিবাস সংবাদ পেলেন যে রূপ গোস্বামী মাত্র তিন দিন পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। একথা শুনে তিনি দেশের দিকে রওনা হলেন। সেই রাত্রে রূপ সনাতন স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালভট্ট ও শ্রীজীবের আশ্রয় গ্রহণ করতে পরামর্শ দান করেন। এদিকে তাঁরা শ্রীজীবকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে পরের দিন সন্ধ্যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবন আসছেন। গোবিন্দ আরতির সময় তিনি মন্দিরে আসবেন এবং তাঁর রূপ দেখে ভাবাবেশে দ্বারের বামদিকে গিয়ে পড়বেন। সে সময়ে দ্বারের দক্ষিণবামে খোঁজ করলে তাঁকে পাওয়া যাবে।

প্রেমবিলাসের বর্ণনা পূর্বালোচিত গ্রন্থগুলির অনুরূপ হলেও কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সনাতনের দেহত্যাগের কাল স্পষ্টভাবে এখানে বলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থে বলা হয় নি। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে প্রবেশের কাল এই গ্রন্থে বলা হয় নি। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে প্রবেশের কাল এই গ্রন্থে বলা না হলেও কর্ণপূর কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে ভক্তিরত্নাকর পর্যন্ত সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। সেই হিসাবে প্রেমবিলাসের বক্তব্য অনুযায়ী সনাতন গোস্বামী পৌষ মাসে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের মাস বৈশাখ। কিন্তু এই হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন যে ব্রজমণ্ডলে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সনাতন গোস্বামীর ও শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রূপ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।[১১৩] প্রচলিত এই উৎসব থেকে অনুমান করা যায় এঁদের তিরোভাবকাল সঠিক ভাবে নির্ণীত না হলেও তিথির হিসাবে বোধহয় কোনও ভুল নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রেমবিলাসের উক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে রচনাকে প্রামাণিক করে তোলার জন্য প্রেমবিলাসে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দুই ক্ষেত্রে কোথায় এবং কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তা'ও যেমন বলা হয়েছে তেমনি গোবিন্দমন্দিরের দ্বারের কোন্‌দিকে তিনি ভাবাবেশে পড়বেন তা'ও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বর্ণনার কোনও ভিত্তি আছে বলে জানা নেই। কাজেই এসব বিবরণকে

---

[১১৩] ষো. সা. প. সা.—পৃ. ১১৮।

সত্য বলে গ্রহণ করারও কোন কারণ নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে প্রবেশের তারিখ থেকে রূপ গোস্বামীর তিরোধানের তারিখ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অনুমান করা যায় আচার্যের বৃন্দাবন আগমনের প্রায় নয় মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের যে তারিখে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ছিল সেদিন তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ অনুযায়ী শ্রীনিবাস অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন।[১১৪] অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের প্রায় চার মাস পর তাঁর যাত্রারম্ভ হয়েছিল। ততদিনে এদেশে রূপ গোস্বামীর তিরোধানবার্তা না পৌঁছানোর কথা। কারণ একে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে এদেশের বৈষ্ণবসমাজের যোগাযোগ তত ঘনিষ্ঠ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গম ছিল বলে এই দুই জায়গার মধ্যে যাতায়াতও বেশী ছিল না। তাছাড়া এদেশ থেকে বৃন্দাবনে যাঁরা যেতেন তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন বিবাগী। দেশে তাঁরা আর ফিরতেন না। এসব নানা কারণে রূপ গোস্বামীর তিরোধানবার্তা শ্রীনিবাসের যাত্রারম্ভের আগে না পৌঁছানোই সম্ভব। বৃন্দাবনের পথের দুর্গমতার কথা অনুরাগবল্লীতে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে রূপ গোস্বামীর সংবাদ গৌড়ে না পৌঁছানোর কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে "সে সময়ে বৃন্দাবন গমনাগমন। কেহ নাহি চলে পথ বড়ই বিষম।[১১৫]" দস্যু আর পশুর ভয় ছিল। সামান্য পয়সার জন্যও দস্যুরা প্রাণ হরণ করত। বৃন্দাবন দর্শনের একান্ত উৎকণ্ঠা যাদের ছিল একমাত্র তারাই ঈশ্বর ভরসা করে এপথে যাতায়াত করত। সেজন্য "এই ক্রমে সমাচার পাওয়া নাহি যায়। সব তত্ত্ব মথুরা কেহ আইলে বার্তা পায়।[১১৬]" কাজেই প্রাপ্ত সকল বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে রূপ গোস্বামী ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসের যে তারিখে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ছিল সেদিন দেহত্যাগ করেন। কিন্তু দুর্গম পথ ও যোগাযোগের অভাবে সে কথা গৌড়ে এসে পৌঁছায় নি, সেজন্য শ্রীনিবাস এই ঘটনার প্রায় চারমাস পরে রওনা হলেও তিনি এই সংবাদ পান নি। রূপ গোস্বামী জীবিত আছেন—এবিষয়ে একরূপ নিশ্চিত হয়েই তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে গৌড় অভিমুখে কেউ আসে নি বলে পথে তিনি বৃন্দাবনের

---

[১১৪] ভ. র. ৪।১৬১। [১১৫] অ. ব. ৩য় ম। [১১৬] ঐ।

কোন সংবাদ পান নি। সেজন্য সমস্ত পথে এসংবাদ না পেয়ে পেলেন মথুরা এসে।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে। এঁদের স্থিরীকৃত কালগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন কাল হলো ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ এবং সর্বোর্ধ কাল হলো ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ। কর্ণপুর কবিরাজ এবং অন্যান্য রচনার ওপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে রূপ গোস্বামীর তিরোধানকাল ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কিংবা পরে হওয়া সম্ভব নয়। এখন সমস্যা থেকে যায় সনাতন গোস্বামী কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।

সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষিণী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা সমাপ্ত করেন ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে। এরপর তাঁর কোন রচনা পাওয়া যায় না। এ থেকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্তে এসেছেন, "১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাইতেছে যে রূপ ও সনাতন প্রায় একই সময়ে অপ্রকট হন। ব্রজমণ্ডলে অদ্যাপি আষাঢ়ী-পূর্ণিমা বা গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে সনাতন গোস্বামীর ও উহার ২৭ দিন পরে শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তাঁহারা দুই ভাই খুব সম্ভব ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করেন।[১১৭]"

ডঃ নরেশচন্দ্র জানাও ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। তিনি ভক্তিরত্নাকর, কর্ণপুর কবিরাজ ও নৃসিংহ কবিরাজের উদ্ধৃতি থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এঁরা অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে তিরোধান করেছিলেন।[১১৮]

ডঃ জানা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কর্ণপুর কবিরাজের ১১তম শ্লোক ও হরিদাস দাস বাবাজীকৃত তার অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্লোকের সঠিক অনুবাদ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি এবং বাবাজীর অনুবাদে ভুল কোথায় ছিল তাও আলোচনা করে দেখিয়েছি। নৃসিংহ কবিরাজের যে শ্লোকটির উল্লেখ তিনি করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সনাতন প্রভু সহ শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে আদেশ করলেন। এ থেকে তাঁদের অল্পদিনের ব্যবধানে তিরোধানের সিদ্ধান্ত কিভাবে করা যেতে পারে বোঝা গেল না। বরং এই শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি থেকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এঁদের তিরোধানের মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান ছিল।

---

[১১৭] ষো. শ. প. সা.—পৃ. ১১৮। [১১৮] বৃ. হ. গো.—পৃ. ৮৮-৯

ডঃ জানা ভক্তিরত্নাকরের যে অংশ উদ্ধৃত করে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অল্পকালের ব্যবধানে তিরোধানের কথা বলেছেন সেই অংশটিতে দেখা যায় মথুরাবাসীদের কাছ থেকে শ্রীনিবাস জানলেন যে "এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন। মো সবার নেত্র হৈতে হইলা অদর্শন॥ এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।"[১১৯] এখানে "এই কথোদিন" কথাটির অর্থ ধরা হয়েছে "দিনকতক আগে"। কিন্তু এসময়কার রচনাগুলি থেকে দেখা যায় এই কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করা হতো না। বেশ কিছুদিনের ব্যবধানের অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করা হতো। কাজেই ডঃ জানার উদ্ধৃত কোন রচনাই তাঁর স্বপক্ষে যায় না।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনা থেকে দেখানো যেতে পারে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের মধ্যে বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধান আছে। এই রচনার ষষ্ঠ শ্লোকে দেখা যাচ্ছে নীলাচল থেকে ফিরে এসে শ্রীনিবাস যখন গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি বলছেন যে ব্রজে গমন করে রূপ ও সনাতনের শরণাপন্ন হও (তস্মাদ্‌গচ্ছ ব্রজং সনাতন-যুতং রূপং প্রপন্নো ভবেঃ)। অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত গৌড়ে সকলে জানেন যে এঁরা দু'ভাই জীবিত আছেন। এর কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন তখন তিনি রূপগোস্বামীর পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন (কৃত্বা যো হৃদি পাদপদ্মযুগলং শ্রীরূপগোস্বামিনঃ)। যাত্রার পূর্বেই তিনি রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের খবর পান নি বলে তাঁর কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের খবর জানা ছিল বলে তিনি তাঁর কথা গৌণভাবে চিন্তা করেছিলেন।[১২০] মথুরাতে প্রবেশ করে তিনি রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদই পেয়েছিলেন (তদ্‌গোপনং)। সেজন্য তিনি "হা হা রূপঃ কুতো গতঃ" বলে শোক প্রকাশ করেছিলেন। এখানেও অগ্রজের উল্লেখ পরে ও গৌণভাবে করা হয়েছে। কাজেই এই রচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শ্রীনিবাস নীলাচল থেকে আসার পরও গৌড়বাসীরা জানতেন যে তাঁরা দুই ভাই জীবিত। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে সনাতনের দেহত্যাগের সংবাদ এদেশে আসে এবং শ্রীনিবাস এ সংবাদ পেয়ে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। তাঁর রওনা হওয়ার চার মাস

---

[১১৯] ভ র. ৪। ১৯৭-৮। [১২০] শ্রীনি. গু. সূ ১১তম শ্লোক।

পূর্বে রূপ গোস্বামী দেহত্যাগ করলেও সে সংবাদ তখনও দেশে এসে পৌঁছায় নি বলে তিনি সে খবর পান নি। রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের বেশ কিছুকাল পূর্বেই যে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান হয়েছিল এবং শ্রীনিবাস যে সে সংবাদ রাখতেন তার আরও প্রমাণ হলো শ্রীরূপের তিরোধানের (তদ্‌গোপনং) সংবাদে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিলাপেও দেখা যাচ্ছে যে তিনি রূপেব তিরোধানে বিলাপ করছেন (এবং সে সঙ্গে সনাতনের তিরোধানের কথা উল্লেখ করছেন মাত্র)।

রূপ গোস্বামীর তিরোধানের বেশ কিছুকাল আগে সনাতনের তিরোধানেব অপর প্রমাণ হলো শ্রীনিবাসের সঙ্গীর প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামীর উত্তর। লক্ষ্য করার বিষয় সনাতন গোস্বামীর আদেশেব উত্তরে শ্রীজীব যে প্রার্থনা করেছিলেন তার জবাব দিচ্ছেন শ্রীরূপ। সনাতন সে সময়ে বেঁচে থাকলে একথা হয়ত তাঁর মুখ থেকেই পাওয়া যেত।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানের মধ্যে যে বেশ খানিকটা সময়েব ব্যবধান ছিল তা অনুরাগবল্লীর বিবরণ থেকেও অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থের তৃতীয় মঞ্জরীতে আছে যে মথুরায় এসে শ্রীনিবাস শুনলেন যে "সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস। তারপর রঘুনাথ ভট্ট স্বেচ্ছাবস॥ সম্প্রতি কথোদিন রূপ অদর্শন।" এখানে "অনেক দিবস" কথাটি লক্ষ্য করার বিষয়। রূপের অদর্শনের ক্ষেত্রেও "কথোদিন" ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীনিবাস বৈশাখ মাসে রূপের অদর্শনের কথা শুনেছেন। তিনি দেহত্যাগ করেছেন তার নয় মাস আগে। কাজেই "কথোদিন" শব্দটির প্রয়োগও যথাযথ হয়েছে। এই নয় মাসের "অনেক দিবস" আগে সনাতনের তিরোধান হয়েছে। কাজেই এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে মাত্র ২৭ দিনের ব্যবধানে এঁদের তিরোধান হয়েছিল বলে ডঃ মজুমদার ও ডঃ জানা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধান যে এত অল্পসময়ের ব্যবধানে হয় নি তার আরও একটি প্রমাণ দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করে সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবকাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করব। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আছে যে বৃদ্ধকালে রূপ গোস্বামী গোবর্ধন পর্বতের গোপালকে দর্শন করার জন্য মথুরাতে এসেছিলেন। চৈতন্যদেবের মত তাঁরাও গোবর্ধন পর্বতে আরোহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। সেজন্য

তাঁদের সেখানে গিয়ে গোপাল দর্শন করা হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে রূপ গোস্বামীর একবার গোপাল দর্শনের ইচ্ছা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেবার ম্লেচ্ছভয়ে গোপালকে গোবর্ধন থেকে সরিয়ে মথুরানগরে বিট্‌ঠলেশ্বরের ঘরে এনে রাখা হয়েছিল। সে সময় তিনি সেখানে একমাস থেকে গোপাল দর্শন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের নাম দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর নাম নেই। সনাতন গোস্বামী সে সময় পরলোকে না থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই গোপাল দর্শনে যেতেন আবার তিনি জীবিত থাকলে রূপ গোস্বামী তাঁকে একা ফেলে রেখে মথুরাতে সদলে এসে একমাস থাকতে পারতেন না। আবার সনাতন গোস্বামীর ২৭ দিন পরে রূপ গোস্বামীর তিরোধান হলে একমাস ধরে মথুরাতে থেকে গোপাল দর্শন সম্ভব হতো না। এঁদের যে ২৭ দিনের ব্যবধানে দেহত্যাগ হয় নি কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বিবরণও তার বড় প্রমাণ। এবার সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন শ্রীনিবাস গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখনও গৌড়ে সকলে জানেন যে সনাতন জীবিত আছেন। তার কয়েকমাসের মধ্যে তাঁর রওনা হওয়ার পূর্বে সনাতনের দেহত্যাগের সংবাদ পৌঁছেছিল বলে এই রচনা থেকে অনুমান করছি। কিন্তু সে সংবাদ যখন এসে পৌঁছেছে তার পূর্বে আবার রূপ গোস্বামীরও দেহত্যাগ হয়েছে, কিন্তু সে সংবাদ এসে পৌঁছায় নি। এ থেকে মনে হয় এঁদের দুজনের তিরোধানকাল খুব বেশী নয়। কারণ বেশী হলে গদাধর দাসের সঙ্গে আলোচনাকালের পূর্বেই সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ এদেশে এসে যেত এবং তিনিও তাঁর কথার উল্লেখ না করে শ্রীনিবাসকে শুধুমাত্র রূপ গোস্বামীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলতেন। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় এঁদের তিরোধানকালের ব্যবধান এক বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। সেই হিসাবে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে রূপ গোস্বামীর তিরোধান হয়ে থাকলে সনাতন গোস্বামী ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসের যেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা ছিল সেদিন দেহত্যাগ করেছিলেন বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

অনুরাগবল্লীর বিবরণ অনুযায়ী রঘুনাথ ভট্ট সনাতন গোস্বামীর দেহ-

ত্যাগের পর পরলোকগমন করেন।[১২১] ভক্তিরত্নাকরে এঁদের তিরোধানের যে ক্রম দেওয়া হয়েছে তাতে অনুমান হয় কাশীশ্বর গোস্বামী প্রথমে দেহত্যাগ করেন। তারপর রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর দেহান্ত হয়। এরপর যথাক্রমে সনাতন ও রূপ তিরোধান করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণ আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ চৈতন্যচরিতামৃতে রূপ গোস্বামীর মথুরায় গোপালদর্শন প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গী হিসেবে যে সব বৈষ্ণব মহাজনদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ ভট্টের নাম আছে কিন্তু কাশীশ্বর গোস্বামীর নাম নেই। অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা পরে দেহত্যাগ করেছিলেন কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের পরেও কিছুকাল বর্তমান ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবনে আগমনের পূর্বে রঘুনাথ ভট্টের দেহত্যাগ হয়েছিল, অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণ যদি স্বীকার করতে হয় তবে চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একথা স্বীকার করতে হবে যে তিনি রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেই পরলোকগমন করেছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন প্রসঙ্গের প্রথম পর্ব অর্থাৎ বৃন্দাবনে প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা গেল, এযাবৎ যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বলা চলে যে তিনি ১৫৬২ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল প্রথম বৃন্দাবন প্রবেশ করেছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ এবং অনুরাগবল্লী কর্তৃক প্রদত্ত ও ভক্তিরত্নাকর কর্তৃক সমর্থিত তিথির সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ তারিখটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। কর্ণপুর কবিরাজ বিশেষভাবে এই তারিখটি কি করে দিলেন এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে। তিনি এই তারিখ তাঁর গুরু স্বয়ং শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই তারিখ তাঁর মনে রাখার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ এটি তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, দ্বিতীয়তঃ এই তিথি তাঁর জন্মতিথি। এই দুই অপূর্ব যোগাযোগের জন্য এই বিশেষ তারিখটি হয়তো তাঁর মনে বিশেষভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল এবং সেটি কর্ণপুর কবিরাজ তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মনোহরদাসও তাঁর গুরুর কাছ থেকে এই কথা শুনে, তারিখটি না-দিলেও তিথি-সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং

---

[১২১] অ. ব. ৩য় মঞ্জরী।

নরহরি চক্রবর্তীও এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তারিখ ও তিথি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য তারিখ শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে প্রবেশের তারিখ হিসাবে যতটা মূল্যবান তার চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশী রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানকাল নির্ণয় করার জন্য। যদিও এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলতে গেলে আরও তথ্যের প্রয়োজন তবুও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী যতটা পাওয়া যায় তা থেকে আনুমানিকভাবে সিদ্ধান্তে আসা চলে যে তাঁরা ১৫৬০ থেকে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন-পর্বের দ্বিতীয়ভাগে তাঁর দীক্ষা, অধ্যয়ন, আচার্য উপাধিলাভ প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য বিষয়। কর্ণপূর কবিরাজকৃত গুণলেশসূচকে এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৩৩তম থেকে ৪৮তম শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে এসে প্রথম যখন শ্রীজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তখন তিনি বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনায় রত ছিলেন। এখানে এসে শ্রীনিবাস শুনলেন শ্রীজীব সমবেত বৈষ্ণবদের জিজ্ঞাসা করছেন—"শ্রীগোবিন্দের মথুরা গমনকালে গোকুলে লোকগণ যে যেভাবে অবস্থিত ছিলেন এখনও তাঁরা সেভাবেই অবস্থান করছেন। অথচ তাঁর রোপিত কদম্ববৃক্ষের চারাটিকে আজও প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছে। আপনারা এর কারণ নির্দেশ করুন।" শ্রীনিবাস তখন আনন্দিত হয়ে বললেন, "আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত শুনুন। গোবিন্দের মনোভাব হলো এই যে ব্রজের বস্তুনিচয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে না। তাঁদের পক্ষে গোবিন্দের বাক্য ও মনোবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তাঁর স্বহস্তরোপিত বলে কদম্বতরুটি তাঁর প্রিয়। এজন্য তিনি মথুরায় থাকলেও এর কথা স্মরণ করতেন বলে এই বৃক্ষটিকে প্রফুল্ল দেখায়।" শ্রীনিবাসের এই উত্তর শুনে জীব পরম প্রীতিলাভ করলেন। তারপর দূতমুখে তাঁর পরিচয় শুনে তিনি সসম্ভ্রমে উঠে প্রেমভরে শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গন করে তাঁর সামনে আনলেন এবং শ্রীগোস্বামীকর্তৃক সকল বৃত্তান্ত তাঁকে বললেন। তারপর জীব শ্রীনিবাসকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনি আমার আচার্যের কাজ করেছেন অতএব আজ থেকে আপনি আচার্য নামে অভিহিত হবেন।" জীব যখন সমবেত বৈষ্ণবদের একথা বলছেন তখন শ্রীনিবাস কাতরভাবে নিবেদন করলেন "শ্রীভট্টপাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।" জীব গোস্বামী তাঁকে গোপালভট্টের কাছে নিয়ে

গেলেন। গৌরবর্ণ, পদ্মবদন, সুনয়ন, বিশালবক্ষ গোপালভট্ট তখন নানা শাস্ত্র মন্থন করে সমবেত বৈষ্ণবদের অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। আচার্য তাঁর চরণে প্রণাম করলে তিনি প্রীতিভরে তাঁকে দুই বাহুদ্বারা উঠিয়ে বললেন "হে বান্ধব, তুমি আমার জন্মজন্মের দাস। আমার আনন্দের জন্য বিধাতা আজ তোমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।" এই বলে তিনি আনন্দাশ্রু-দ্বারা শ্রীনিবাসকে স্নান করিয়ে দিলেন। এরপর ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের সঙ্গে গোপালভট্ট শ্রীনিবাসাচার্যকে যমুনাতটে নিয়ে গেলেন। সেখানে রাধাগোবিন্দের কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে শ্রীনিবাসাচার্যকে যমুনায় স্নান করিয়ে দীক্ষাদান করলেন। এরপর আচার্য ব্রজের বৈষ্ণবগণ ও গোপালভট্টের আনুগত্যে গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করে আনন্দ-লাভ করলেন। তারপর তিনি অন্যান্য বৈষ্ণবগণ কর্তৃক লোকনাথ গোস্বামীর কাছে নীত হলেন। সেখানে নরোত্তম ঠাকুর তাঁকে প্রণাম করলে আচার্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, "বিধাতা আজ আমাকে কি নয়নই না দিলেন? তিনি আমাকে বহুমূল্য রত্ন দিলেন, না মন দিলেন, না প্রাণ দিলেন? তিনি সদয় হয়ে আমাকে এই অদ্বিতীয় সঙ্গী দিয়েছেন।" এরপর তিনি প্রত্যহ শ্রীগোবিন্দ ও ভট্টগোস্বামীর দর্শন করতেন এবং ব্রজবাসীদের সেবা ও দর্শন করতেন। সেই সঙ্গে জীব গোস্বামীর সেবা করতেন ও গ্রন্থাভ্যাস করতেন।

অনুরাগবল্লীতেও শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে অবস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণের কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। কর্ণপূর কবিরাজের মতে শ্রীজীবের সঙ্গে আচার্যের প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের নিয়ে কৃষ্ণকথায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু মনোহরদাসের মতে তাঁদের এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল সন্ধ্যা-বেলায় গোবিন্দমন্দিরে। আরতির সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে না পেরে আচার্য কোন রকমে গোবিন্দ দর্শন করে একপাশে বসে ছিলেন। রূপ গোস্বামীর বাক্য স্মরণ করে শ্রীজীব তাঁর অনুসন্ধান করতে লাগলেন কিন্তু ভীড়ের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলেন না। ভীড় কমলে তিনি দেখলেন দ্বারের কাছে একজন বসে আছেন। দুজনে দুজনের পরিচয় পেয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন। শ্রীজীব আচার্যকে বার বার গোস্বামী-বাক্য ও স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন। তারপর শ্রীনিবাস গোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করলে শ্রীজীব তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে এসে সেই রাত্রি সেখানে রাখলেন।

পরদিন সকালে যমুনায় স্নানাদি শেষ করে শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে সঙ্গে করে গোপালভট্টের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি শ্রীনিবাসের পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন। রূপ গোস্বামীর বিরহে ভট্ট গোস্বামী অপার দুঃখে ছিলেন তথাপি তিনি রূপ গোস্বামীর আজ্ঞা অমান্য করতে চাইলেন না। পরদিন দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীনিবাসের দীক্ষার অনুমতি দিয়ে ভট্ট গোস্বামী গৌড়ের সংবাদ শুনলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নান করে শ্রীনিবাস শ্রীজীবের সঙ্গে সঙ্গে গোপাল ভট্টের নিকট উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি শ্রীনিবাসকে হরিনাম দিয়ে কৃপা করলেন, তারপর রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র দিলেন। এরপর কৃষ্ণনাম শুনিয়ে সিদ্ধি নাম দিলেন। এরপর রাধাকৃষ্ণলীলার সম্বন্ধে তিনি শ্রীনিবাসকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে মনোহরদাস তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় মঞ্জরী শেষ করেছেন।

অনুরাগবল্লীর চতুর্থ মঞ্জরীর বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস জীবের কাছে কয়েক বৎসর ধরে নিয়মিতভাবে রসামৃতসিন্ধু. ভাগবতার্থাদি পাঠ করে সিদ্ধান্তসার, রসসার ইত্যাদি জেনে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন শ্রীনিবাস যমুনায় স্নান করতে গিয়েছেন। এদিকে জীব উজ্জ্বলনীলমণি পড়াচ্ছেন। পড়ানোর সময় তিনি একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। গুণলেশসূচকে বিবৃত সমস্যাটি মনোহরদাস এখানে উল্লেখ করেছেন। স্নানান্তে শ্রীনিবাস ফিরে এসে জীবকে চিন্তামগ্ন দেখলেন। তাঁর সমস্যাটি শুনে শ্রীনিবাস তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করে দেওয়ায় জীব বিস্মিত হলেন। তখন তিনি শ্রীনিবাসকে আচার্য পদবী দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সে সময়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তাঁকে এই পদবী দেওয়া হয়েছিল বৃন্দাবন ত্যাগ করার অব্যবহিত পূর্বে। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে জীবের সমস্যা ও সমাধান গুণলেশসূচক থেকে গ্রহণ করা হলেও জীব কর্তৃক শ্রীনিবাসকে আচার্য পদবী দান প্রসঙ্গে বর্ণনার পার্থক্য আছে।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণও কর্ণপূর কবিরাজের অনুরূপ নয় বরং এখানে অনুরাগবল্লীর বিবরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই বিবরণে দেখা যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে সন্ধ্যাকালে গোবিন্দমন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। গোবিন্দদর্শনে আনন্দলাভ করে তিনি মন্দিরের একপাশে পড়ে রইলেন। আরতির সময় ভীড়ের মধ্যে জীব তাঁকে খুঁজে

পেলেন না। পরে শ্রীনিবাসকে এত ভীড়ে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং পরিচয় পেয়ে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। সে সময়ে গোবিন্দের অধিকারী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত। তিনি শ্রীনিবাসকে প্রসাদী তাম্বুলমালা দিলেন এবং প্রসাদ খাওয়ালেন। জীব শ্রীনিবাসকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় রাধাদামোদর শয়ন করেছিলেন, সেজন্য সেরাত্রে এই বিগ্রহ দর্শন করা হলো না। বৈশাখী পূর্ণিমার নিশিতে বৃন্দাবনের শোভা দেখে জীবের গৃহে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হলো।

প্রভাতে উঠে শ্রীনিবাস জীব গোস্বামীকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর সঙ্গে রাধাদামোদর দর্শন করলেন। এরপর রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শন করে তিনি জীবের সঙ্গে গোপাল ভট্টের কাছে গেলেন। সেখানে দ্বিতীয়ায় শ্রীনিবাসের দীক্ষার আজ্ঞা হলো। এখানে তিনি রাধারমণকে দর্শন করে জীবের সঙ্গে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীদের দর্শন করতে চললেন। রাধাবিনোদ দর্শনের পর শ্রীনিবাস পরমানন্দ পুরী ও মধু পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর মদনমোহন বিগ্রহ ও সনাতন গোস্বামীর সমাধি দর্শন করলেন।

পরের দিন গোপালভট্ট শ্রীনিবাসকে দীক্ষাদান করলেন। তার পরের দিন জীব শ্রীনিবাসকে শ্রীকুণ্ডে রঘুনাথ দর্শনে পাঠালেন। সেখানে রাঘব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনদিন সেখানে থেকে রাধাকুণ্ড-গোবর্ধন দর্শন করে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে ফিরে এলেন এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন।

শ্রীনিবাসকে আচার্য পদবীদান প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে যে একদিন জীব উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপনভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে গুণলেশসূচকে বিবৃত শ্লোকটির সমাধান না করতে পেরে শ্রীনিবাসের কাছে সমাধান চাইলেন। শ্রীনিবাস সহজে তার মীমাংসা করে দিলেন দেখে জীব আনন্দিত হয়ে সবাকার অনুমতি নিয়ে শ্রীনিবাসকে আচার্য পদবীতে ভূষিত করলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের অন্যতম সঙ্গী নরোত্তম সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলির দুটিতে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেওয়া আছে এবং একটিতে এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। গুণলেশসূচকে দেখা যায় আচার্য যখন প্রথমবার বৃন্দাবন যান তখন লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নরোত্তমের সঙ্গে আলাপ হয়। অনুরাগবল্লীতে এসময়ে নরোত্তমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে

কিছু বলা হয় নি। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে মনে হয় নরোত্তম আচার্যের পর বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থের মতে তিনিও জীবের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবনে আগমন প্রসঙ্গে অনুরাগবল্লীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মঞ্জরীতে তাঁর বৃন্দাবন পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণের প্রভাব দেখা যায় ভক্তিরত্নাকরে। এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের বৃন্দাবন ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে এই তরঙ্গটিই বৃহত্তম তরঙ্গ। এই তরঙ্গে এঁদের বৃন্দাবন ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ এখানকার প্রতিটি তীর্থের যে ইতিহাস দেওয়া আছে তা থেকে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তরঙ্গের অপর বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। তিনি যে কতবড় সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন তা এই তরঙ্গ পাঠ করলে অনুমান করা যায়।

প্রেমবিলাসের ষষ্ঠ বিলাসে শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন প্রবেশ থেকে দীক্ষাগ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। সপ্তম থেকে একাদশ বিলাসে লোকনাথ গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসাচার্যের আচার্য পদবীলাভের বিবরণ পাওয়া যায় দ্বাদশ বিলাসে।

প্রেমবিলাসের ষষ্ঠ বিলাসের বিবরণানুযায়ী শ্রীনিবাস সন্ধ্যাকালে গোবিন্দমন্দিরে উপস্থিত হলেন। জগমোহন থেকে গোবিন্দ দর্শন করে তিনি ভাবাবেশে দ্বারের বামদিকে পড়ে রইলেন। রূপ গোস্বামীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী জীব দ্বারের বামদিকে তাঁকে আবিষ্কার করে সযত্নে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আচার্যের ভাবাবেশ শেষ হলে জীব তাঁর পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়ে আলিঙ্গন করলেন।

পরের দিন জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্টের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে এত দেরীতে বৃন্দাবনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীনিবাস পূর্ববৃত্তান্ত বিবৃত করলেন। গোপালভট্ট তারপর অদ্বৈতাচার্য, জাহ্নবাদেবী ও সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। এরপর গণনা করিয়ে শ্রীনিবাসের দীক্ষার দিন স্থির করা হলো।

দীক্ষার দিনে জীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাস ভট্টের কাছে উপস্থিত হলেন। রাধারমণের মন্দিরে এই দীক্ষার কাজ আরম্ভ হলো। শ্রীনিবাস

পূর্বমুখ হয়ে গুরুর বাম পার্শ্বে বসলেন। ভট্ট গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস প্রথমে ব্রজেন্দ্রকুমারের ও তাঁর বামপার্শ্বে রাধিকার ধ্যান করলেন। তারপর রাধারমণের পূজা করিয়ে গোপালভট্ট তাঁকে হরিনাম দিলেন। এরপর রাধাকৃষ্ণ পঞ্চনামের বিধান, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ও বীজমন্ত্র দান করলেন। তারপর ভট্ট গোস্বামী তাঁর সঙ্গে মঞ্জরী সাধনার রহস্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেন।

দ্বাদশ বিলাসে নিত্যানন্দ দাস প্রথমে নরোত্তম ঠাকুরের উপাধিলাভ ও পরে শ্রীনিবাসাচার্যের আচার্য পদবী লাভের বিবরণ দিয়েছেন। আচার্যের পদবীলাভের বিবরণের আগে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণও এই বিলাসে বর্ণনা করা হয়েছে। নরোত্তমের ঠাকুর মহাশয় উপাধি পাওয়ার বর্ণনার পর দেখা যায় শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিনে শ্রীনিবাস লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি প্রথম নরোত্তমের দেখা পেয়ে বন্ধু বলে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। পরে আলাপের সময় শোনেন যে তিনি প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ সেখানে আছেন। লোকনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন প্রায় এক বৎসর তিন মাস পূর্বে।

শ্রীনিবাসের আচার্য পদবীলাভ প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ দাস বলেছেন একদিন জীব গোস্বামী ললিতমাধব পাঠ করার সময় একটি সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি যখন সমাধানের চিন্তায় মগ্ন আছেন সে সময়ে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত হন। জীব তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর যোগ্যতা বিচারের জন্য এই সমস্যার কথা বলেন। শ্রীনিবাস এক প্রহর সময় নিয়ে নিজ গৃহে চলে যান। নিভৃতে চিন্তা করার পর সমাধানের কথা তাঁর মনে এলো। শ্রীনিবাস ফিরে এসে দেখেন জীব তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। শ্রীনিবাসের মুখে সমাধান শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন যে আজ থেকে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য নামে পরিচিত হবেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীনিবাসকে নিয়ে জীব গোবিন্দ মন্দিরে দর্শনে গেলেন। আরতির পর গোবিন্দের প্রসাদমালা শ্রীনিবাসকে দিয়ে সমবেত বৈষ্ণবদের কাছে তাঁর যোগ্যতা বর্ণনা করে জীব শ্রীনিবাসকে আচার্য পদবী দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। সমবেত বৈষ্ণবরা তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলে শ্রীনিবাসকে কুসুম তিলক দেওয়া হলো, কুঙ্কুম লেপন করা হলো, সকলেই আনন্দধ্বনি দিলেন। আচার্য আনন্দিত হয়ে সকলকে প্রণাম করলেন এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করলেন। সেদিন থেকে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন-পর্বের আলোচ্য ভাগের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী হলো শ্রীনিবাসের সঙ্গে জীব গোস্বামী আদি বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং আচার্য পদবী লাভ। বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা মোটামুটি এক হলেও কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি ঘটনা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল জীব গোস্বামীর সঙ্গে। কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাচ্ছে এসময়ে জীব শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলেন। শাস্ত্রের একটি সমাধানের সূত্রে তিনি নবাগত শ্রীনিবাসের পরিচয় পান এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির মতে এঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল গোবিন্দ মন্দিরে। এই বিষয়ে অনুরাগবল্লীতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে তারই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনানুসারে শ্রীনিবাস সন্ধ্যাকালে চক্রবেড়ে গোবিন্দমন্দিরে এসে উপস্থিত হন। তখন আরতি চলছিল। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে শ্রীনিবাস পেছন থেকে গোবিন্দ দর্শন করেন এবং একপাশে বসে থাকেন। জীব গোস্বামী জানতেন যে তিনি এসময় গোবিন্দ মন্দিরে আসবেন। কাজেই সময়মত এসে তিনি খোঁজ খবর করে শ্রীনিবাসকে বার করেন এবং নিজ বাসায় নিয়ে যান।

গুণলেশসূচক থেকে প্রেমবিলাস পর্যন্ত সকল গ্রন্থেই দেখা যাচ্ছে জীব শ্রীনিবাসের আগমনবার্তা জানতেন এবং রূপগোস্বামী তাঁকে এঁর কথা পূর্বেই বলেছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ এমনও বলেছেন যে শ্রীনিবাসকে আনবার জন্য তিনি মথুরায় দূত প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁর সঙ্গেই বৃন্দাবন এসে জীবের কাছে উপস্থিত হন। এই প্রসঙ্গে গোপালভট্টের প্রসঙ্গও স্মরণ করা যেতে পারে। কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস গোপালভট্টের কথা স্মরণ করে বৃন্দাবন আসতে প্রস্তুত হলেন এবং জীবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভট্ট গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিও শ্রীনিবাসকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা দিতে সম্মত হন।

এখানে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভট্ট গোস্বামী সাধারণতঃ বাঙ্গালীকে দীক্ষা দিতেন না। শ্রীনিবাসই বোধহয় একমাত্র বাঙ্গালী যিনি ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।[১২২]

---

[১২২] অ. ব. ২য় মঞ্জরী

গুণলেশসূচক ভট্ট গোস্বামীর শ্রীনিবাসকে সাদরে গ্রহণ এবং একবাক্যে তাঁকে দীক্ষা দিতে স্বীকার করার স্পষ্ট কারণ কিছু উল্লেখ না করলেও অনুরাগবল্লীতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনিও রূপ গোস্বামী কর্তৃক শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। অনুরাগবল্লীর বিবরণ ও ভক্তিরত্নাকরে তার সমর্থন থেকে মনে হয় এর মধ্যে কোনও সত্য আছে যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মনে হয় রূপ গোস্বামী শ্রীনিবাসের আগমন-বার্তা জানতেন এবং হয়ত তিনি এমন সূত্র থেকে এ খবর ও শ্রীনিবাস সম্বন্ধে অনুরোধ পেয়েছিলেন যাতে তাঁর সম্বন্ধে রূপের উচ্চ ধারণা হয়েছিল এবং দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর জন্য সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। গৌড় থেকেই যে এই অনুরোধ এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নীলাচল থেকে গদাধর পণ্ডিত বৃন্দাবনে যোগাযোগ করিয়ে দিলে তিনি আবার পত্র দিয়ে শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাতেন না।

গৌড়েও শ্রীনিবাসের জন্য এই ব্যবস্থা গদাধর দাসই করে থাকবেন। একথা মনে হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনিই প্রথম বৃন্দাবনের কথা তোলেন এবং সেখানে অবস্থিত রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কথা বলেন। এঁদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ না থাকলে তিনি এঁদের কথা বলতেন না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে গৌড়ের অনেক বৈষ্ণব মহান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু ফিরে এসে দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে জীবনীগ্রন্থগুলিতে উল্লেখ আছে। এঁদের একজন হলেন নরহরি সরকার ঠাকুর ও অপরজন হলেন গদাধর দাস। সরকার ঠাকুরের সঙ্গে আচার্যের পূর্ব পরিচয় ছিল, কিন্তু গদাধরদাসের তাঁর পরিচয় নীলাচল থেকে ফেরার পর। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর এঁর সঙ্গে বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ করা থেকে মনে হয় বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি হয়তো এঁর সঙ্গে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করে থাকবেন।

এ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে শ্রীনিবাস যখন গদাধরদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন সনাতন গোস্বামী দেহত্যাগ করলেও সে সংবাদ এদেশে এসে পৌঁছায় নি। সেজন্য গদাধর দাস এঁদের দুজনের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং হয়তো এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দূত বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শ্রীনিবাস সম্বন্ধে তাঁর সম্মতি ও সনাতনের দেহত্যাগের বার্তা নিয়ে

আসেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হওয়ার আগেই রূপ গোস্বামী দেহত্যাগ করলেও সে বার্তা তখনও এদেশে এসে পৌঁছায় নি। কাজেই তাঁর কথা স্মরণ করে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। এ সংবাদ প্রথম মথুরাতে পেয়েও তিনি বোধহয় বিফলমনোরথ হয়ে দেশে ফেরার কথা ভেবেছিলেন। জীবের দূতের সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো ফিরেও আসতেন। দেশে আর কিছুদিন দেরী করলে হয়তো রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ দেশে বসেই পেয়ে যেতেন। সেক্ষেত্রে তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার কথা হয়তো আর চিন্তা করতেন না। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হতো।

কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ ও অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ থেকে আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে মথুরায় রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদে শ্রীনিবাস বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে রূপ গোস্বামীর তিরোধানের জন্য তাঁর শোক যতটা হয়েছিল তার চেয়েও বেশী হয়েছিল বোধ হয় এই কথা ভেবে যে যিনি বৃন্দাবনে তাঁর জন্য ব্যবস্থা করবেন তিনিই আজ নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাঁর এভাবে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় আছে যে এসময়ে তিনি শোনেন রূপ গোস্বামী কর্তৃক স্বপ্নাদেশের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকেও অনুমান করা যায় শ্রীনিবাসের সম্ভাব্য আগমন সম্বন্ধে প্রস্তুত হয়ে জীব যে দূত তাঁকে বৃন্দাবনে আনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন তাঁর মুখে রূপ গোস্বামী কর্তৃক ব্যবস্থার কথা শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

অনুরাগবল্লীতে লেখা আছে যে রূপ ও সনাতনের ব্যবস্থানুযায়ী রঘুনাথ ভট্ট গৌড় থেকে আগত বৈষ্ণবদের এবং গোপাল ভট্ট পশ্চিমা বৈষ্ণবদের দীক্ষা দিতেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। একমাত্র না হলেও শ্রীনিবাসই বোধ হয় প্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণব যিনি গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। এর কারণ বোধহয় রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পূর্বেই রঘুনাথ ভট্টের দেহত্যাগ। এর ফলে রূপ গোস্বামীর ইচ্ছানুযায়ী গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। গৌড় থেকে রওনা হওয়ার পূর্বেই বোধহয় এসংবাদও শ্রীনিবাস পেয়ে থাকবেন, যার জন্য তিনি মথুরায় রূপ গোস্বামীর তিরোধানের সংবাদ পেয়েও ভট্ট গোস্বামীর কথা স্মরণ করে শোক সংবরণ করেছিলেন। অবশ্য গৌড়ে থাকতেই যে তিনি এই সংবাদ

পেয়েছিলেন এমন না হতেও পারে। মথুরায় দূতমুখে রূপ গোস্বামীর এই ব্যবস্থার কথাও তিনি শুনে থাকতে পারেন। গৌড়ে বসে রঘুনাথের তিরোধান-বার্তা শুনলে তাঁর ও সনাতনের তিরোধানকাল খুব কাছাকাছি হয়। কিন্তু রূপ গোস্বামীর গোপালদর্শনের যে বিবরণ চরিতামৃতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় রূপের দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে রঘুনাথ ভট্ট দেহত্যাগ করেন। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রূপ গোস্বামী গোপাল ভট্টের কাছে তাঁর দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

অনুরাগবল্লী ও অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীনিবাসের সঙ্গে জীবের গোবিন্দ-মন্দিরে সাক্ষাতের বিবরণে খানিকটা নাটকীয়তা আছে। সেদিক থেকে-কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বিশেষতঃ এঁদের যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা পূর্বে হয়েছিল বলে আমরা যা অনুমান করছি সেকথা সত্য হলে কবিরাজের বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করতেও কোন বাধা নেই। প্রথম থেকে ব্যবস্থা না থাকলে গোপালভট্ট কর্তৃক শ্রীনিবাসকে সাদরে গ্রহণ এবং একবাক্যে তাঁকে দীক্ষা দানের কথাও বিশ্বাস করা কঠিন।

কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় নরোত্তম শ্রীনিবাসের পূর্বেই বৃন্দাবন এসেছিলেন কারণ তিনি প্রথম যখন লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন নরোত্তমের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অনুরাগবল্লীতেও সেকথা আছে। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে মনে হয় নরোত্তম শ্রীনিবাসের পরবর্তী কালে বৃন্দাবন এসে থাকবেন। প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে তিনি শ্রীনিবাসের আগে বৃন্দাবন এসে থাকলেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরবর্তী-কালে। বোঝা যাচ্ছে পূর্ববর্তী মত ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একথা বলা হয়েছে যদিও বাস্তবে এরকম হওয়া সম্ভব নয়। নরোত্তমবিলাসেও নরহরি চক্রবর্তী যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে নরোত্তম শ্রীনিবাসের পর বৃন্দাবনে আসেন। মনোহরদাস কর্ণপূর কবিরাজের মত অনুসারে লিখলেও নরহরি চক্রবর্তী দুটি গ্রন্থেই পরিষ্কারভাবে কর্ণপূর কবিরাজের মত লঙ্ঘন করে শ্রীনিবাসের পর নরোত্তমের বৃন্দাবন যাওয়ার কথা কেন লিখলেন বোঝা গেল না। তবে আচার্যশিষ্যের বিবরণ সমসাময়িক বলে এই বিবরণকেই স্বীকার করতে হয়।

অন্যান্য গ্রন্থে না থাকলেও একমাত্র ভক্তিরত্নাকরে এসময়ে লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে। এঁরা শ্রীনিবাসের বহু পূর্বে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং সে সময় জীবিত ছিলেন, কাজেই এই সাক্ষাৎকার অস্বাভাবিক নয়।

কর্ণপূর কবিরাজ দীক্ষার দিন প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি, তবে বর্ণনায় মনে হয় এই কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়েছিল। অনুরাগবল্লীতে দীক্ষার দিন বলা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরেও সেই দিন সমর্থিত হয়েছে। এসম্বন্ধে অন্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, কাজেই এই তথ্য নির্ভরযোগ্য কি না বলা কঠিন। তবুও উপযুক্ত তথ্যাভাবে এই দুই গ্রন্থের বর্ণনাকে স্বীকার করতে বাধা নেই।

দীক্ষার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে অনুরাগবল্লীতে। সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করে বিস্তৃততর বর্ণনা দেওয়া আছে প্রেমবিলাসে। ভক্তিরত্নাকরে এসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। মনোহরদাস শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কাজেই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য—একথা বলা যেতে পারে।

শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-পর্বের এই ভাগের অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তাঁর আচার্য উপাধিলাভ। এসম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা ভিন্নরকম। তবে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণকে গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণও কবিরাজের বিবরণের বিরোধী নয়। তবে সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। সেক্ষেত্রে কবিরাজের বিবরণই গ্রহণযোগ্য কারণ এই বিবরণ একে সমসাময়িক তদুপরি স্বাভাবিক।

আচার্য উপাধি লাভের বর্ণনায় প্রেমবিলাসে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। প্রথমতঃ যেখানে মনোহরদাস ও নরহরি চক্রবর্তী দুরূহ শ্লোকটি উজ্জ্বলনীলমণির বলেছেন সেখানে প্রেমবিলাসের বক্তব্য এটি ললিতমাধবের—একথা গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীনিবাস উত্তর দিতে এক প্রহর সময় নিয়েছিলেন একথাও পূর্ববর্তী কেউ বলেন নি, বরং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া জীবের কাছে যতটা বিস্ময়জনক হয়েছিল এক প্রহর পরে উত্তর দেওয়ায় তা থাকে না। আচার্য উপাধি দানের ব্যাপারে এই গ্রন্থে যে নাটকীয়তা আছে তা'ও স্বীকার করা যায় না। জীবের মত সেকালের একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রীতিভরে যাঁকে আচার্য বলে সম্বোধন করতে স্বীকার করেছেন সেখানে অন্যান্যদের স্বীকৃতির কোনও প্রয়োজন থাকে না। শ্রীনিবাসকে সমাবর্তন উৎসব করে আচার্য উপাধিতে সমাবৃত্ত করা হয়েছিল—একথা সমর্থন করা যায় না। এই গ্রন্থের এই বর্ণনায় অবশ্য অনুরাগবল্লীর প্রভাব বর্তমান। কিন্তু এই দুই গ্রন্থে এ বিষয়ে যে নাটকীয়তার অবতারণা করা হয়েছে—তা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রীনিবাস কতকাল বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছিলেন ? গুণলেশসূচকে কর্ণপূর কবিরাজ বলছেন "বহুকালমাত্রম্"। এসময়ে তিনি কিভাবে দিন কাটাতেন তার একটি বিবরণও কবিরাজ দিয়েছেন। এতে দেখা যায় যে—।

ইনি তখন কৌপীন, বহির্বাস ও তুলসীমালা ধারণ করতেন। শ্রীরাধা-কুণ্ডের রাজতিলক ও গায়ে নামাক্ষর লিখতেন। তাঁর নেত্রদ্বয় ও মন গ্রন্থে এবং হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্রে রেখে আনন্দে বৈষ্ণবদের সঙ্গে লোমের আসনে বসে কাল কাটাতেন।[১২৩]

আলোচ্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তিনি বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনে বহু বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। এই বহু বৎসর যে কত বৎসর—তা নির্ণয় করার কোনও উপায় নেই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে তিনি প্রায় ৪ | ৫ বৎসর সেখানে ছিলেন। এই অনুমানের কারণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন—"যদি শ্রীনিবাস ৪ | ৫ বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন অনুমান করা যায়, তাহা হইলে ১৫৬০ | ৬১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর তখন গৌড়ে ফেরেন ও বিবাহ করেন। ৪ | ৫ বৎসরের বেশী তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন অনুমান করিলে একদিকে যেমন তাঁহার বিবাহের বয়স পার হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রকট থাকা ও শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়া কঠিন হয়। যদি সরকার ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যের সমবয়সী বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৭৪ | ৭৫ হয়।[১২৪]

ডঃ মজুমদার এখানে যে হিসেব দিয়েছেন তা তাঁকে অনুমান করতে হয়েছে। আমাদেরও অনুমান করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। তবে তিনি প্রথম দিকে অর্থাৎ শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের যে সময় অনুমান করেছেন আমাদের হিসেবে সেই সময় আরও পিছিয়ে আসছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিবাসের জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে যতটা সম্ভব কাল নির্ধারণ করে এই জীবনী ও তৎকালীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে নূতনভাবে কালনির্ণয় করতে হয়েছে। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাস শুধু পরবর্তী কালে প্রথমবার বৃন্দাবন যান নি, তাঁর হিসাবের চেয়েও বেশীকাল বৃন্দাবনে ছিলেন এবং আরও বেশী বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছে। এবিষয়ে পরবর্তী হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে

---

[১২৩] শ্রীনি. গু. সূ. ৩২তম শ্লোক। [১২৪]. ষো. শ. প. সা.—পৃ. ১২০

আমাদের অনুমান যে আচার্য প্রায় আট বৎসর বৃন্দাবনে কাটিয়ে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দেশে ফিরে এসেছিলেন। আচার্যের প্রথম দিককার এবং পরবর্তী জীবনের যে সব কাল নির্ণয় করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে দেখা যায় যে তিনি এর চেয়ে বেশী সময় বৃন্দাবনে থাকতে পারেন না।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন-পর্বের তৃতীয় ভাগে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন। আলোচনাকালে দেখা যাবে পরবর্তী কালের গ্রন্থগুলিতে এবিষয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

আচার্যের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় ৪৯তম শ্লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায় বৃন্দাবনে বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন জীব শ্রীনিবাসকে বললেন, "প্রতিদিন তুমি আমার একমাত্র সহায়। দয়া করে আমার একটি কথা শোন। আমার গুরু আমাকে যে আজ্ঞা করেছেন তা পালন কর। গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থসমূহ নিয়ে তুমি অবিলম্বে গৌড়দেশে ফিরে যাও। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত দেশসমূহে পাষণ্ডমতের প্রসার না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হও। সেখানে এসব গ্রন্থের সাহায্যে বিশুদ্ধা ভক্তি ও মুকুন্দ বিষয়ক প্রেম প্রদান কর।"

৫২ থেকে ৫৪ তম শ্লোকে দেখা যাচ্ছে একথা শুনে আচার্য প্রথমে মনস্থির করতে পারলেন না। জীবের একথা শুনে তিনি গোপালভট্টের কাছে সমস্ত নিবেদন করলেন। তিনিও বললেন—"শ্রীরূপের আজ্ঞা পালন কর। আমারও আজ্ঞা তুমি গৌড়ে যাও এবং তাঁদের নির্দেশানুযায়ী সকল কাজ কর।" গুরুর আজ্ঞা পেয়ে তিনি গোবিন্দ-মন্দিরে প্রদোষকালে দেব দর্শন করলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁকে এই আদেশ প্রতিপালন করতে বললে তিনি জীবের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে গৌড়ে গমনের জন্য মন স্থির করলেন।

৫৫ থেকে ৫৮তম শ্লোকে শ্রীনিবাসাচার্যের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। এই পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে তিনি ব্রজস্থিত সকল বৈষ্ণবের আদেশ নিয়ে রূপ, সনাতন, গোপালভট্ট, জীব, দাস গোস্বামী এবং কবিরাজের গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করলেন। তারপর শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। এরপর ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের ও বৃন্দাবনকে প্রণাম করে যমুনা ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করে অগ্রসর হলেন। রাধাকুণ্ডে এসে তিনি সেখানকার বৈষ্ণবদের প্রণাম করলেন। লোকনাথ গোস্বামীকে প্রণাম করলে তিনি আচার্যের হাতে নরোত্তমকে সমর্পণ করে বললেন, "হে আচার্য, নরোত্তমকে

আজ তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। নরোত্তম এখন তোমার।"

৫৯ থেকে ৬৪তম শ্লোকে শ্রীনিবাসাচার্যের গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দেওয়া আছে। নরোত্তমকে সঙ্গে নিয়ে আচার্য শ্রীজীবকুঞ্জে ফিরে এলেন এবং চার ভার গ্রন্থ নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলেন। শ্রীজীবও বহু বৈষ্ণব নিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন।

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কর্ণপূর কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন ত্যাগ ও গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই শ্লোকগুলিতে দেখা যাচ্ছে আচার্য এবং ব্রজবাসী বৈষ্ণবরা আসন্ন বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আচার্য অশ্রু বিসর্জন করতে করতে জীব গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে প্রণাম করলেন এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের প্রণাম করলেন। নরোত্তম শ্রীনিবাসের চরণদ্বয় বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভূমিতে পড়ে রোদন করতে থাকলে তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে করতে নরোত্তমকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করেন। এরপর জীব মথুরা থেকে বৈষ্ণবদের সঙ্গে আচার্যের প্রতি শোকাকুল দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর বার বার জীবের চরণে প্রণাম করে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলেন এবং বার বার পিছন ফিরে দেখতে লাগলেন।

আদেশামৃতেও শ্রীনিবাসাচার্যের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য কর্ণপূর কবিরাজ প্রদত্ত তথ্যের অনুরূপ। এই রচনার ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্লোকে বলা হয়েছে যে গোপালভট্ট আচার্যকে গৌড়ে গিয়ে প্রচার করতে বলায় তিনি বললেন—"আপনার অনুগ্রহে যদি আমার সাহচর্যে আগত পুরুষদিগের রাধাকৃষ্ণচরণযুগল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তবে আমি যাব। নচেৎ আমার যাওয়ার প্রয়োজন কি?" এরপর তিনি গোবিন্দের এই আদেশ প্রাপ্ত হলেন, "গোস্বামীদের আদেশ সফল হবে, বিশেষতঃ শ্রীনিবাসের ওপর যখন সেই আদেশ অর্পিত হয়েছে। এই গ্রন্থসমূহ প্রচারের জন্য শ্রীনিবাস আমাকর্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন, অতএব তিনি গৌড়ে যান। তাঁর চিন্তার কি প্রয়োজন?"

অনুরাগবল্লীর পঞ্চম মঞ্জরীতে শ্রীনিবাসাচার্যের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া আছে। মনোহরদাসের বিবরণে দেখা যায় জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্যকে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের কথা প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলেন নি। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে গোপালভট্টের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁকে দিয়ে আচার্যের

কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করান। আচার্য ভট্ট গোস্বামীর মুখে এই প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর বলেন যে তাঁর বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বাস করা এবং ভট্টগোস্বামীকে সেবা করাই একমাত্র বাসনা। উত্তরে ভট্টগোস্বামী বলেন গৌড়দেশে শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করলেই তাঁর সেবা করা হবে। একথা শুনে শ্রীনিবাসাচার্য ব্যাকুল চিত্তে মৌন হয়ে রইলেন। এদিকে জীব ব্রজবাসী সকল বৈষ্ণব মহান্তদের বলে রাখলেন যে তাঁরা যেন সুযোগমত আচার্যকে গৌড়ে ফিরে গিয়ে শাস্ত্র প্রচার করার পরামর্শ দেন। ফলে এরপর আচার্য যাঁর কাছেই পরামর্শ চান তিনি ফিরে যেতে বলেন। এমনকি জিজ্ঞাসা করার পূর্বেও অনেকে অযাচিতভাবে পরামর্শ দিতে থাকেন। আচার্য যখন সকলের কাছ থেকে একই পরামর্শ পেয়ে বিমনা আছেন তখন সুযোগ বুঝে জীব তাঁকে এরকম বিমর্ষ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আচার্য তখন সকল ঘটনা বিবৃত করে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। জীব গোস্বামী তখন রূপ গোস্বামীর আজ্ঞা স্মরণ করিয়ে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। অবশেষে আচার্য দেশে ফিরে আসতে মন স্থির করলেন। জীব সকল মহান্তকে আচার্যের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন এবং সকলেই এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

এরপর একদিন গোবিন্দ-মন্দিরে রাজভোগ দিয়ে আরতি দেওয়া হলো, তারপর আচার্যকে একজোড়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরানো হলো এরং গোবিন্দের প্রসাদীবস্ত্র ও তিলক দিয়ে তাকে সর্বসমক্ষে আচার্য উপাধি দেওয়া হলো। তিনি গোবিন্দকে প্রণাম করে একটি পদ রচনা করে শোনালেন। এটি হলো তাঁর রচিত বিখ্যাত পদ—"বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দালো গো।"

অনুরাগবল্লীর ষষ্ঠ মঞ্জরীতে এরপর নরোত্তম ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে গোপালভট্ট যেভাবে আচার্যকে দেশে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে লোকনাথ গোস্বামীও নরোত্তম ঠাকুরকে আচার্যের সঙ্গে দেশে ফিরে গিয়ে কীর্ত্তন প্রচার করতে আদেশ দেন। নরোত্তম ঠাকুর ব্রজে থাকবার অনুমতি ভিক্ষা করলেন কিন্তু তিনি তা অনুমোদন করলেন না। দিনান্তে আচার্য এলে তাঁর গৌড়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুনে নরোত্তমকে এনে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর তাঁরা দুজনে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে বৃন্দাবনে ফিরে এলে তাঁদের যাত্রার আয়োজন হতে লাগল।

শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে দেওয়ার জন্য অনেক গ্রন্থ একত্র করা হলো। এগুলো পাঠানোর জন্য খরচের প্রয়োজন। উপায় চিন্তা করতে গিয়ে জীব

একজন মহাজনকে ধরলেন। তাঁর গাড়ী আগ্রা যাচ্ছিল। জীব তাঁর সঙ্গে কথা বলে আচার্যদের গৌড়ে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের দেশে প্রত্যাবর্তনের বৃত্তান্ত ভক্তিরত্নাকরে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে নরোত্তম নন, শ্যামানন্দও এসেছিলেন। তাছাড়া এপর্যন্ত সকল রচনায় শ্রীনিবাসের ব্রজভূমি ত্যাগ করার যে অনিচ্ছা বিবৃত করা হয়েছে তার কোনও লক্ষণ এই গ্রন্থে বলা হয় নি। এখানে দেখা যাচ্ছে একদিন জীব আদি মহান্তগণ গোবিন্দমন্দিরে একত্র হয়ে গোবিন্দের কাছে শ্রীনিবাসাচার্যকে গ্রন্থবিতরণ-শক্তি দেওয়ার প্রার্থনা জানালেন। এসময় গোবিন্দের গলা থেকে একটি মালা খসে পড়ল। এটিকে গোবিন্দের সম্মতির লক্ষণ স্বীকার করে সমবেত সকলে তাঁর গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের দিন স্থির করলেন। অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমী যাত্রার দিন স্থির করা হলো।

বৃন্দাবন থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে শ্রীনিবাসাচার্য যাঁদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়েছিলেন বলে ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, দ্বিজ হরিদাস, কানাই ও ভূগর্ভ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বৃন্দাবন ত্যাগের আগে তাঁরা মদনগোপাল, রাধাদামোদর গোপীনাথ, গোপীশ্বর প্রভৃতি মন্দির দর্শন করেন। গোবিন্দমন্দির দর্শনের সময় শ্রীনিবাসাচার্য তাঁর নিজকৃত গীত—"বদন চান্দ কুন কুন্দানো কুন্দিল গো" পদটি গান করেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের গৌড়ে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করেন জীব। তিনি এক মগাজনকে ধরে গ্রন্থ নিয়ে আচার্যের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। মহাজনও এঁদের রাজপাত্র, পদাতিক, গাড়ি ও মুদ্রা দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীজীব গ্রন্থভারচতুষ্টয় বর্ষাভয় নিবারণের জন্য কাষ্ঠসম্পুটে ভরে দিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন থেকে বিদায় গ্রহণকালে যে সব মহান্ত উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নামের তালিকাও ভক্তিরত্নাকরে দেওয়া আছে। এঁদের মধ্যে গোপালভট্ট, ভূগর্ভ গোস্বামী, মাধব, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, মধু পণ্ডিত, প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, রাঘব পণ্ডিত, যাদব আচার্য, নারায়ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ গোস্বামী, গোবিন্দ, ঈশান, শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস, উদ্ধব, দ্বিজ হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোপালদাসের নাম অন্যতম। জীব সকলের অনুমতি গ্রহণ করে গ্রন্থসম্পুট গাড়ীতে তুললেন। গাড়ী মথুরা অভিমুখে রওনা হলো। জীব গোস্বামী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আচার্যদের অনুগমন করলেন। মথুরায়

এক রাত্রি থেকে শ্রীনিবাসাচার্যে'রা অগ্রসর হলে জীবাদি বৈষ্ণবরা কিছুদূর তাঁদের বিদায় জানিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

প্রেমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীনিবাসকে আচার্য উপাধি দান করার পর সেই রাত্রে জীব গ্রন্থভার দিয়ে তাঁকে দেশে পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন। সেই সঙ্গে স্থির করলেন আচার্যের সঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরকেও দেশে পাঠানো হবে। এই স্থির করে জীব কার্ত্তিক ব্রত মহোৎসব সম্পূর্ণ করবার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। গাড়ীভরা দ্রব্য আসতে লাগল, তিনি চতুর্দিকে পত্র পাঠিয়ে বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করলেন। দশমী একাদশীর দিন সকলে এসে উপস্থিত হলেন। মহোৎসবের দিন প্রসাদ গ্রহণের পর সমবেত বৈষ্ণবদের শ্রীনিবাসাচার্যের পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে তাঁর এবং নরোত্তম ঠাকুরের দেশে ফিরে গিয়ে প্রচারের কাজ গ্রহণ করার প্রস্তাব করলেন জীব গোস্বামী। তাঁরা দুজন বৃন্দাবনে থাকার অনুমতি চাইলেও, তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার পক্ষেই সকলে মত দেওয়ায় সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। জীব মথুরার এক মহাজনকে ডাকিয়ে আনিয়ে চারটি বলিষ্ঠবলদ-যুক্ত 'মোমজামা' দিয়ে ঘেরা গাড়ী ও সেইসঙ্গে দশজন লোক দশদিনের মধ্যে পাঠাতে বলে দিলেন। এরপর নরোত্তম ঠাকুরকে ডেকে জীব শ্যামানন্দের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।

যাত্রার দিন জীব শ্রীনিবাসাচার্যকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে সিন্ধুকে গ্রন্থাদি সাজিয়ে দিলেন। তারপর সেটিকে ধরাধরি করে গাড়ীতে তোলা হলো। সবার সাক্ষাতে তাতে কুলুপ লাগিয়ে মোমজামা দিয়ে সিন্ধুকটিকে জড়িয়ে দেওয়া হলো। এরপর গাড়ী গোবিন্দ-মন্দিরের সামনে আনা হলো। এরপর যাত্রা আরম্ভ হলো। জীব এঁদের সঙ্গে মথুরা পর্যন্ত এলেন। সেখানে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে উপদেশ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। দশজন অস্ত্রধারী ও দুইজন গাড়োয়ান নিয়ে তাঁরা দেশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণের প্রতি পদে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে আচার্যের কাছে এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক সম্বন্ধে মতপার্থক্য। কর্ণপূর কবিরাজের মতে জীব নিজে আচার্যকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি এসম্বন্ধে মত স্থির করতে না পেরে ভট্টগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও জীবের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তখনও তিনি স্থির করতে না পেরে গোবিন্দের শরণাপন্ন হন। তাঁর স্বপ্নাদেশ

পেয়ে তিনি মনস্থির করেন। এই বিবরণের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় আদেশামৃত স্তোত্রে। কিন্তু অনুরাগবল্লীতে দেখা যাচ্ছে জীব গোস্বামী আচার্যকে সরাসরি এসম্বন্ধে কিছু না বলে ব্রজবাসী সকল মহান্তকে দিয়ে বলিয়ে দিলেন। এখানে জীব গোস্বামীর ছলনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা সম্ভব বলে মনে হয়না। প্রথমতঃ শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তিনি সোজাসুজি আচার্যকে এই প্রস্তাব দিলে আচার্যের এই প্রস্তাবকে একেবারে অগ্রাহ্য করার সাধ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ রূপ সনাতনের পর তিনি ব্রজবাসী মহান্তদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁর পক্ষে মনোহরদাস বর্ণিত ছলনার আশ্রয় নেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। ভক্তিরত্নাকরে অনুরাগবল্লীর এই বিবরণকে গ্রহণ করা হয় নি। কাজেই অনুরাগবল্লীর এই বিবরণের কোনও মূল্য আছে বলে মনে হয় না। ধরে নেওয়া যেতে পারে এবিষয়ে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ নির্ভরযোগ্য।

শ্রীনিবাসাচার্য দেশে আসার সময় যে সব গ্রন্থকারের গ্রন্থ সঙ্গে এনেছিলেন তার একটি বিবরণ কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনও গ্রন্থে এসম্বন্ধে আলোচনা করা না হলেও পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি রচনা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কমূলক আলোচনা হয়েছে। কাজেই আচার্য এসময়ে কোন্ কোন্ গ্রন্থ দেশে এনেছিলেন সে সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা নিয়েই পরবর্তীকালে বহু বিতর্কের অবতারণা হয়েছে, সেই হেতু এসময় পর্যন্ত তিনি কোন্ কোন্ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করা যেতে পারে।

এযাবৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং অপরটি বাংলায়। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থ দুটির নাম হলো সারঙ্গরঙ্গদা ও গোবিন্দলীলামৃত। বাংলায় রচিত গ্রন্থটি হলো বিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থ তিনটির রচনাকাল নির্ণয় করা গেলে নির্ণয় করা যেতে পারে যে কবিরাজ রচিত কোন্ কোন্ গ্রন্থ আচার্য এযাত্রায় এদেশে এনেছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থ দুটিতে গ্রন্থসমাপ্তিকাল লেখা নেই। চৈতন্যচরিতামৃতেও এই সমাপ্তিকাল আদৌ লেখা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে ডঃ

সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১২৫] তবে চরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা প্রামাণ্য সূত্রে সিদ্ধান্তে আসা গেলেও সংস্কৃত গ্রন্থ দুটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে আলোচ্য সংস্কৃত গ্রন্থ দুটির মধ্যে গোবিন্দলীলামৃতের পুষ্পিকা থেকে এই গ্রন্থের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। এই শ্লোকটি হলো—

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশকঃ ॥

এই শ্লোক থেকে ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্তে এসেছেন "ছয় গোস্বামীর মধ্যে একটির—গোপাল ভট্টের উল্লেখ নাই। মনে হয় গোপাল ভট্টের বৃন্দাবনে আগমনের আগেই কাব্যটি লেখা হইয়াছিল।"[১২৬]

শুধু গোপাল ভট্টই নয়, এই শ্লোকে সনাতন গোস্বামীর নামও নেই। ডঃ সুশীলকুমার দে সনাতন সম্বন্ধে কবিরাজের নীরবতা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন—"As Sanatana is not directly mentioned, it is probable that he was dead at the time of composition of the work."[১২৭]

গ্রন্থে কোনও নামের অনুল্লেখে যদি ব্যক্তির অনুপস্থিতি প্রমাণ করে তবে এমন কোনও একটি নির্দিষ্ট সময় অনুমান করা কঠিন যখন গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসেন নি এবং সনাতন গোস্বামী দেহত্যাগ করেছিলেন অথচ রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট জীবিত ছিলেন। কাজেই ধরে নিতে হবে এখানে এই নাম দুটির অনুল্লেখের কারণ অন্য কিছু। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকার এঁদের দুজনের কাছে ঋণী নন, সেজন্যই নাম দুটি উল্লেখ করা হয় নি। গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকার যাঁদের কাছে ঋণী, গ্রন্থে শুধুমাত্র তাঁদের নামই উল্লেখ করার প্রথা বর্তমান যুগেও প্রচলিত আছে। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃত রচনার সময় রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্টের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্য গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় এঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে একথা বলা কঠিন সে সময় সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন কি না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রচনাকালে রূপ

---

[১২৫] বা. সা. ই. —পৃ ৩৪৬ [১২৬]. ঐ—পৃ ৩১। [১২৭] E. F. V. H. —পৃ ৬০৫

গোস্বামী এবং রঘুনাথ ভট্ট জীবিত ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবনে আগমনের পূর্বে তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কাজেই অনুমান করা যায় যে গোবিন্দলীলামৃত আচার্যের আগমনের পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

সারঙ্গরঙ্গদা লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা। রচনাকাল বলা কঠিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পরবর্তী যুগের রচনা। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামীকৃত গোপালচম্পূর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থ রচনার সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[১২৮] কাজেই আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে দেশে আসার সময় এই গ্রন্থ নিয়ে আসার প্রশ্ন ওঠে না।

আলোচ্য গ্রন্থগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে যতটুকু অনুমান করা যায় তা থেকে মনে হয় কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য সংস্কৃত রচিত গ্রন্থ দুটি এনেছিলেন। তিনি প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে আসার সময় কোন্ কোন্ গ্রন্থ এনেছিলেন সে সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একটি আনুমানিক তালিকা দিয়েছেন।[১২৯] এই তালিকায় তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত একমাত্র গোবিন্দলীলামৃতের উল্লেখ করেছেন। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এসম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

বৃন্দাবন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নরোত্তম ঠাকুরও যে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন একথা সকল গ্রন্থেই স্বীকার করা হয়েছে। তবে ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে এইসঙ্গে শ্যামানন্দের নামও যুক্ত করা হয়েছে। তিনি আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সঙ্গী ছিলেন কি না তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রত্যাবর্তনের সময় শ্যামানন্দের আসা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় নানা কারণে। প্রথমতঃ কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় একথার অনুল্লেখ। তিনি এবারের সঙ্গী হিসেবে যখন নরোত্তম ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন তখন শ্যামানন্দ এবারে সঙ্গী থাকলে নিশ্চয় তাঁর কথা বলতেন। এখানে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে তাঁর অনুল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় শ্যামানন্দ প্রথম-

---

[১২৮] ম. মু. বা. সা. ত. কা. —পৃ. ১৯৬-২০৪ । [১২৯] ষো. শ. প. সা. —পৃ ১২৯-৩০

বার আচার্যের সঙ্গে আসেন নি।

অনুরাগবল্লীতে দেখা যায় শ্যামানন্দ আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যান তখন তিনি জীব গোস্বামীর কাছে শ্যামানন্দকে দেখেন। আচার্যের প্রত্যাবর্তনের সময় জীব তাঁর সঙ্গে শ্যামানন্দকে পাঠিয়ে দেন।

অনুরাগবল্লীর এই বিবরণকে স্বীকার করা যেতে পারে কারণ এই বর্ণনায় যুক্তি আছে। ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবনে অবস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। শ্যামানন্দ যদি আচার্যের পূর্বে বৃন্দাবনে এসে থাকতেন তবে নরোত্তমের মতন সে প্রসঙ্গ স্পষ্ট করে বলা থাকত। তাছাড়া আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের বৃন্দাবন-পরিক্রমার বর্ণনায় তাঁর কথারও উল্লেখ থাকত। নরহরি চক্রবর্তী এসম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। আচার্যের আগে শ্যামানন্দ জীব গোস্বামীর কাছে এসে থাকলে ধরে নিতে হয় আচার্যের সঙ্গে ইনিও গোস্বামীর কাছে একত্রে অধ্যয়ন করেছেন। সেক্ষেত্রেও কোনও না কোনও ক্রমে এঁদের একত্রে উল্লেখ পাওয়া যেত। কিন্তু সেরকম কোন উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরে নেই। আচার্যের পরবর্তী কালে এসে থাকলে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার আগে দেশে ফেরার প্রশ্ন ওঠে না।

প্রেমবিলাসে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে উক্তি আরও পরের ঘটনা। এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে আচার্যদের দেশে ফেরার সময় জীব গোস্বামী শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। শ্যামানন্দ এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবার পর বিদায়-কালে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

শ্যামানন্দ প্রসঙ্গে এই তিন গ্রন্থের আলোচনা থেকে মনে হয় অনুরাগবল্লীর বর্ণনা সঠিক। অন্য গ্রন্থ দুটির বর্ণনার অসঙ্গতির জন্য এই গ্রন্থগুলিব বক্তব্যকে গ্রাহ্য করা যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের দেশে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। পরবর্তী রচনাগুলি কল্পনার আশ্রয় করে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই বিস্তৃতির ক্রমবিকাশও বিভিন্ন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। চার ভার গ্রন্থ কিভাবে আচার্য দেশে আনলেন তার বিবরণ কর্ণপূর কবিরাজ দেন নি। মনোহরদাস এখানে মহাজনের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই মহাজন ও গাড়ীর সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে লোকজন ও পেটিকার যোজনা হয়েছে।

প্রেমবিলাসে এই কল্পনা আরও বিস্তারলাভ করে মোমজামা দিয়ে ঘেরা এবং কুলুপ লাগানো অর্থাৎ বিশেষভাবে সংরক্ষিত পেটিকা এবং ভক্তিরত্নাকরে লোকজন প্রহরী ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। যাত্রার এই সমারোহের অংশটুকু বাদ দিয়ে আমরা কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ এবং বেশীপক্ষে অনুরাগবল্লীর বিবরণকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীনিবাসাচার্যের দেশে প্রত্যাবর্তনের পথ সম্বন্ধে আলোচনা আছে ভক্তিরত্নাকর এবং প্রেমবিলাসে। পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা নেই। নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণ অনুযায়ী শ্রীনিবাসাচার্য নীলাচলের পথ হয়ে দেশে এসেছিলেন।[১৩০] এই বিবরণ অনুযায়ী তাঁরা বনপথে নীলাচলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে বিষ্ণুপুর অতিক্রম করার সময় গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল।

ভক্তিরত্নাকরে যে পথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করার সর্বপ্রধান যুক্তি হলো এর অবাস্তবতা। প্রথমতঃ এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে আচার্যরা নীলাচলের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ তাঁদের গন্তব্যস্থল ছিল গৌড়। প্রচলিত যে পথে তিনি গৌড় থেকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন সেই পথ ছেড়ে তাঁরা নীলাচলের পথে অগ্রসর হলেন কেন বোঝা কঠিন। সোজা পথ এড়িয়ে এপথে আসার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

এই বর্ণনা অগ্রাহ্য করার দ্বিতীয় কারণ হলো বৃন্দাবন থেকে নীলাচল আসতে গেলে কোন দিক থেকেই বিষ্ণুপুর পার হওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এখানকার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে গ্রন্থকারের বক্তব্য হলো চৈতন্যদেব যে বনপথে নীলাচল থেকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন আচার্যরা সেই পথেই নীলাচলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চৈতন্যদেব প্রথমবার জননী ও জাহ্নবী দেখে বৃন্দাবন যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং রেমুণা, পিছলদা, কুমারহট্ট ও শান্তিপুর হয়ে মাতৃদেবীকে দর্শন করে কানাইএর নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।[১৩১]

দ্বিতীয়বার তিনি গিয়েছিলেন ঝারিখণ্ডের পথ দিয়ে, মল্লভূমিকে পূর্ব দিকে ফেলে রেখে। এবার তিনি এই পথে সোজা পৌঁছেছিলেন কাশী। কাজেই আচার্যরা যদি সেপথেও নীলাচল আসেন তবে কাশী হয়ে ঝারিখণ্ডের জঙ্গলে গিয়ে মল্লভূমিকে বাঁ দিকে ফেলে রেখে দক্ষিণে নেমে আসতে হয়। সেদিক

---

১৩০. ভ. র. ৭।১৬-২১ ১৩১. চৈ. চ. ২।১৬

থেকেও তাঁদের বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি আসার কোনও সম্ভাবনা নেই।

চৈতন্যদেব যে পথ দিয়েই গিয়েছেন তিনি সে পথের জনপদের বিরাট অংশকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন বলে সকল জীবনীকার বলেছেন। তিনি যদি কোনও একসময় মল্লভূমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেন তবে তাঁর প্রভাব সেই-খানকার অধিবাসীদের ওপর নিশ্চয়ই খানিকটা পড়ত। কিন্তু পরে দেখা যাবে আচার্য মল্লভূমির রাজার কাছে চৈতন্যদেবের পরিচয় দিচ্ছেন। চৈতন্যদেব এপথ দিয়ে গেলে তাঁর পরিচয় নূতন করে দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

সবদিক থেকে বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে নরহরি চক্রবর্তী যে পথের কথা বলেছেন তাকে সঠিক বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। তাছাড়া গৌড়ের পথে আসতে গেলে বিষ্ণুপুর দিয়ে আসার কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কাজেই কোনও দিক থেকেই ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাকে স্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে তিনি সোজা পথে গৌড়ে এসেছিলেন এবং এবারে আসার সময় গ্রন্থ অপহৃত হয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ যদি প্রকৃত ঘটনা হয় এবং তিনি যদি এযাত্রায় এপথে না এসে থাকেন তবে নরহরি এই বর্ণনা এখানে দিলেন কেন? এর উত্তরে প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে নরহরি এই জীবনী লিখেছেন ঘটনার অন্ততঃ একশত বৎসর পরে। এসম্বন্ধে সঠিক তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করা ছিল না। কাজেই নানা তথ্য থেকে কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে তাঁকে জীবনীর ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। উপযুক্ত তথ্যাভাবে ঘটনার ক্রম গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক।

গ্রন্থ অপহরণ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে কর্ণপূর কবিরাজের ৮৭তম শ্লোকে। সেখানে শুধুমাত্র পুরুষোত্তম যাওয়ার পথে গ্রন্থ অপহরণের কথা বলা হয়েছে। কবে কখন তিনি কি প্রয়োজনে কোথায় গ্রন্থ নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই এই রচনায় বলা হয় নি। অনুরাগবল্লীতে গ্রন্থ অপহরণ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। কাজেই এটি কোন্ সময়ে হয়েছিল তা আজও সম্পূর্ণ-ভাবে অনুমানসাপেক্ষ। নরহরি চক্রবর্তীও অনুমানের উপর নির্ভর করেই এই যাত্রার সঙ্গে একে একত্র করে নিয়েছেন।

এই যাত্রায় এই ঘটনাকে একত্র করে নেওয়ার স্বপক্ষে বিরাট যুক্তি হলো আচার্যের গ্রন্থভার নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে। এছাড়া তাঁর গ্রন্থ নিয়ে যাতায়াতের কোনও

বিবরণ পূর্বের কোনও গ্রন্থে নেই। কাজেই কর্ণপূর কবিরাজের গ্রন্থভার নিয়ে আচার্যের বৃন্দাবন থেকে প্রত্যবর্তন এবং পুরুষোত্তমের পথে গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ—এই দুটি ঘটনাকে নরহরি একত্র করে নিয়ে থাকবেন।

তিনি যে এই ঘটনা দুটিকে একত্র করে নিয়েছেন তার সবচেয়ে বড প্রমাণ হলো বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথকে নীলাচল যাওয়ার পথ বলে উল্লেখ করায়—"নীলাচল যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া" এবং "সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন। নীলাচল যাঁয় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন॥" গ্রন্থকার প্রথম থেকেই বলেছেন আচার্য গৌড়ে আসছেন। গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথ তিনি আচার্যের বৃন্দাবন যাত্রার সময় বিবৃত করেছেন। গৌড়ের পথ জানা সত্ত্বেও গৌড়ে প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনি কমপক্ষে দুবার নীলাচল-যাত্রী বলেছেন একমাত্র কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনার প্রভাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই পথ সম্বন্ধে যে তাঁর সন্দেহ ছিল তার প্রমাণও তাঁর রচনায় দেখা যাচ্ছে। এসম্বন্ধে সঠিক জানতেন না বলেই তিনি লিখেছেন আচার্যরা 'যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না লিখিল॥" ইতিপূর্বে বাহুল্য হলেও তিনি বর্ণনা দিতে কার্পণ্য করেন নি। তবে এখানে বাহুল্যের ভয় হওয়ার কারণ হলো এই পথ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না থাকা।

প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসাচার্যের যাত্রাপথের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা একেবারে অবাস্তব। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তাঁরা আগ্রায় একরাত্রি বাস করে রাজপত্র দেখাতে দেখাতে "ক্রিটা নগরী" পর্যন্ত এলেন। এরপর কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা "ঝারিখণ্ডের পথে" যাওয়া স্থির করলেন। এরপর ঝারিখণ্ড ছাড়িয়ে তাঁরা তমলুকে পৌঁছলেন। এরপর তাঁরা বিষ্ণুপুরের কাছে এসে পৌঁছান।

ঝারিখণ্ড ছাড়িয়ে বিষ্ণুপুরকে পূর্বদিকে রেখে দক্ষিণে তমলুকে কেন গেলেন আবার সেখান থেকে কেনই বা উত্তরদিকে ভ্রমণ করে বিষ্ণুপুর ফিরে এলেন তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। মনে হয় গ্রন্থকারের এদিককার পথ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। তিনি সেজন্য পথ বর্ণনায় কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কতকগুলি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র।

দেখা যাচ্ছে শ্যামানন্দ প্রসঙ্গে এবং শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে যা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রেমবিলাসের বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় এতে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাকে অনুসরণ করা হয়েছে

এবং ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনার ওপর কাল্পনিক ঘটনা যোগ করায় বিবরণ আরও অবাস্তব হয়ে উঠেছে।

বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ হলো। বস্তুতঃ তাঁর জীবনে সাফল্যের যে শিখরে তিনি আরোহণ করেছিলেন সেই পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি হলো এই পর্যায়ে। এখানে দেখা গেল তাঁর ভাগ্য তাঁকে কিভাবে সত্যের সন্ধানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে শেষ কালে এমন স্থানে এনে উপস্থিত করল যেখানে তাঁর অন্বেষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁর যে কি বিরাট কাজ পড়ে আছে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে তিনি বাকী জীবন বৃন্দাবনে অধ্যয়ন আর বৈরাগ্য নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাকে আবার টেনে নিয়ে এলো আরও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর এই জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের পরবর্তী পর্যায়—বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীনিবাসাচার্যের মুখ্য কাজ ছিল প্রচারকার্য। প্রচারের অর্থ এই নয় যে তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর এই প্রচারকার্য ছিল পরোক্ষ। এসময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে একদল পণ্ডিত শিষ্যগোষ্ঠী গঠিত হয় যাঁরা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত দর্শনগ্রন্থগুলির বক্তব্য প্রচার করেন। এঁদের এই প্রচারের দুটি দিক ছিল—একটি হলো শিষ্য-গোষ্ঠী গঠন করা, অপরটি পদাবলী রচনা করা। পদাবলী রচনায়ও মুখ্য উদ্দেশ্য কীর্তন গানের জন্য। সে সময়ে এখানে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে সব গোষ্ঠী ছিলেন তাঁরা নিজেদের মত পদরচনা ও কীর্তন করে চলেছিলেন, কিন্তু নূতন গোষ্ঠীর এই পদরচনার প্রধান প্রয়োজন হলো গোস্বামীদের প্রদর্শিত পথকে অবলম্বন কবে নামগান করা। এসম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, কাজেই এখানে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের এই পর্যায়ে দেখতে পাব যে তিনি এসময়ে আরও একটি বিরাট কাজ করেছিলেন। সেই কাজটি হলো এদেশে চৈতন্যদেবের নামে যে সব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে সংহতি সাধন করা। আমরা বর্তমান আলোচনায় সেই ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করলেও এসম্বন্ধে তাঁর কৃতিত্বের কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

কর্ণপূর কবিরাজের রচনায় শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের এই পর্যায়ের

সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। এই রচনার ৬৫ থেকে ৯১তম পর্যন্ত শ্লোকে তাঁর শিষ্যদের তালিকা দেওয়া আছে। এর মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিশদ বিববণ দেওয়া আছে। এই বিবরণ পরবর্তী সকল গ্রন্থেই পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। কাজেই কবিরাজের এই রচনা থেকে আচার্যের পরবর্তী জীবনের সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।

বৃন্দাবন থেকে প্রথমবার ফেরার পর শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের তথ্যাবলী অনুরাগবল্লীতে প্রায় সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। এই রচনায় কালের ক্রম অনুসরণ করা হয় নি। যেমন পরবর্তী দুবারের বৃন্দাবন যাওয়ার কথা একই সঙ্গে বলা হয়েছে। অথচ এই দুই ঘটনার মধ্যে বহু কালের পার্থক্য বিরাজমান। শুধু তাই নয় আচার্যের জীবনে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

প্রেমবিলাসেও আচার্যের জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী সুসমঞ্জসভাবে বিবৃত করা নেই। ঘটনাব কালক্রম অনুযায়ী বিস্তৃত বিবরণ একমাত্র ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়। কাজেই শ্রীনিবাসাচার্যের পরবর্তী জীবনের আলোচনাকালে আমাদের মুখ্যতঃ এই গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থে সামান্য যা তথ্য পাওয়া যায় তার সাহায্যে নরহরি চক্রবর্তীর বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার করার চেষ্টা করতে হবে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে বৃন্দাবন থেকে আচার্যের প্রত্যাবর্তনেব বিবরণে নরহরি চক্রবর্তী কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত দুটি ঘটনাকে একত্র করে নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ফলে গ্রন্থ অপহরণের ঘটনা পরবর্তী কোনও কালের হলেও কালের ক্রম ঠিক করে নিতে না পারায় স্বীকার করে নিতে হয়েছে যে দেশে ফেরার আগেই বীর হাম্বীরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল এবং তিনি বিষ্ণুপুরে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর এই বিবরণে যে জটিলতা আছে সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখন এখানে যা বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ তিনি প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরে কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন, এটিকেও আমরা পূর্বের আলোচনা অনুসারে স্বীকার করতে পারছি না। তাছাড়া তাঁর ওপর আদেশ ছিল দেশে ফিরে গ্রন্থ প্রচার করা। তিনি সেই কাজ ছেড়ে এতকাল পরে দেশে ফেরার পথে অন্যত্র কালক্ষেপ করেন, একথাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কাজেই আমরা সঙ্গতভাবে অনুমান করতে

পারি যে তিনি বৃন্দাবন থেকে সোজাসুজি দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং অন্যত্র কালব্যয় না করে নিজগ্রামে পৌঁছেছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের সপ্তম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের যাজিগ্রামে পৌঁছানোর বিবরণ দেওয়া আছে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে যে আচার্য যখন দেশে পৌঁছলেন তখনও তাঁর মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বর্তমান। মাতাপুত্রের মিলনের বর্ণনার পর নরহরি চক্রবর্তী স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কুশলসংবাদ বিনিময় ও তাঁর বৃন্দাবনের কাহিনী শোনানোর পর আচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহান্তদের সংবাদ জিজ্ঞাসার কথা বিবৃত করলেন। দেখা যাচ্ছে তার উত্তরে আচার্য জানতে পারলেন যে "মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি।" এছাড়া তিনি শুনলেন তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিরোধান করেছেন এবং গদাধর দাস নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় এসে বসতিস্থাপন করেছেন।[১৩২]

ভক্তিরত্নাকরের পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায় যাজিগ্রামে থাকতেই শ্রীনিবাসাচার্য একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন অদ্বৈতাচার্য তাঁকে বিবাহ করতে আদেশ দিচ্ছেন। এর কিছুকাল বাদে তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ডে যান। সেখানে রঘুনন্দন ও নরহরি ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। কথাপ্রসঙ্গে সরকার ঠাকুর তাঁকে জানান যে আচার্য-জননীর ইচ্ছা যে আচার্য বিবাহ করেন। এই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর বিবাহ করা উচিত বলে সরকার ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করলেন।[১৩৩]

এরপর সরকার ঠাকুর এসম্বন্ধে রঘুনন্দনের মত জানতে চাইলেন। তিনিও সরকার ঠাকুরের প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। সরকার ঠাকুর যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। আচার্যের অদ্বৈতপ্রভুর স্বপ্নাদেশের কথা মনে পড়ল। তিনি তখন "মৌন ছাড়ি কহে আজ্ঞা নারি লঙ্ঘিবারে।"

ভক্তিরত্নাকরের এই অংশের বিবৃত ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যাচ্ছে দেশে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধান-সংবাদ শোনা, নরহরি সরকার ঠাকুর ও গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং আচার্যের বিবাহের উদ্যোগ। এর মধ্যে তাঁর মায়ের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পূর্ববর্তী কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। একমাত্র প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্য বিষ্ণুপুর থেকে মহাসমারোহে দেশে ফিরে

---

[১৩২] ভ. র. ৭।৫৩৪ ও ৭।৫২৪-২৭। [১৩৩] ভ. র. ৭।৫৮৩-৮৫

এসে যখন মাকে প্রণাম করলেন তখন রাজার লোকজন দেখে ভয় পেয়ে তিনি পুত্রকেই চিনতে পারেন নি। শ্রীনিবাসাচার্য নিজের পরিচয় দিতে তাঁর ভয় দূর হয়। এ কথা একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী বর্ণনার বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখে আসছি যে এই গ্রন্থের কোনও তথ্যকেই ইতিহাস-সম্মত বলা চলে না। এখানেও মাতাপুত্রের মিলন সম্বন্ধে যে অতিশয়োক্তি আছে তাতে পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। আলোচ্য বর্ণনা থেকে মনে হয় প্রেমবিলাসকার যেন ভক্তিরত্নাকরের তথ্যকে আরও বিস্তৃত করতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় করে এই অবাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য যে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের সংবাদ পেয়েছিলেন তার উল্লেখ অনুরাগবল্লীতেও আছে।[১৩৪]

ভক্তিরত্নাকরে এই বিবরণের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এই তথ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কারণ নেই। এখন বিচার করে দেখা যেতে পারে কোন্ সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোভাব ঘটেছিল এবং তখন তাঁর আনুমানিক বয়সই বা কত ?

শ্রীনিবাসাচার্য দেশে যখন এসে পৌঁছলেন তখন দেখেছেন গদাধর দাস কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত। তারও বেশ কিছুদিন পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাব হয়েছে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী আচার্য ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে থাকলে কমপক্ষে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধান হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে দুবছর আগের এতবড় দুঃসংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছালো না কিভাবে ? দুটি কারণে এই সংবাদ বৃন্দাবনে সময়মত না পৌঁছানো সম্ভব। প্রথমতঃ গোড়া থেকেই আমরা দেখছি বৃন্দাবনের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগের কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র তীর্থযাত্রীর মাধ্যম ছাড়া বোধহয় সংবাদ আদানপ্রদানের কোন ব্যবস্থা বা প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ১৫৬৭ ও ১৫৬৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেছিল। ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে সুলতান হলেন সুলেমান কররানি। তিনি ১৫৬৭-৬৮ খৃস্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং খানিকটা হস্তগত করেন। ১৫৬৭ খৃস্টাব্দে বিহারে নিযুক্ত আকবরের অধীনস্থ শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল। কাজেই এসময়ে এদেশ থেকে বার হওয়া কিংবা এদেশে প্রবেশ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ ছিল বলে

---

[১৩৪] অ. ব. ৬ষ্ঠ মঞ্জরী

মনে হয় না। বিশেষতঃ তীর্থযাত্রীদের এমন কোনও তাগিদ থাকতে পারে না যে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল পথ দিয়ে তাঁরা গৌড় এবং বৃন্দাবনের মধ্যে যাতায়াত করবেন। এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইহলোক ত্যাগ করে থাকলে সে সংবাদ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৃন্দাবনে না পৌঁছানো সম্ভব।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধান হয়ে থাকলে সে সময়ে তাঁর বয়স কত হয়েছিল দেখা যেতে পারে। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে। এই গ্রন্থের তথ্য নির্ভরযোগ্য। কাজেই এখানে বিবৃত তথ্যাবলীর সাহায্যে তাঁর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ "প্রথম যৌবনে" হয়েছিল বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৫] এই বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে তখন তাঁর বয়স ১২।১ বৎসর বলে ধরে নেওয়া যায়। চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেছিলেন আনুমানিক ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে,[১৩৬] গৃহত্যাগ করেন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে। বিবাহের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স ১২।১৩ বৎসর হলে চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের সময় তাঁর বয়স ১৫।১৬ বৎসর হয়।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়স হয়ে থাকলে তাঁর জন্মকাল হয় ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। সেই হিসাবে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স প্রায় ৭৪ বৎসর হয়।

নরহরি সরকার ঠাকুর সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে শ্রীনিবাসের দেশে ফেরার আগে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য তিনি শ্রীখণ্ডে গেলে শুধুমাত্র রঘুনন্দনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছেই শ্রীনিবাসাচার্য সরকার ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ পান। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যাচ্ছে আচার্যের তাঁর সঙ্গে শুধু দেখাই হয় নি, আচার্যের বিবাহের পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন। অনুরাগবল্লীতেও বলা হয়েছে—

বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার।
করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার।[১৩৭]

এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে আচার্য দেশে ফেরার পর সরকার ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

---

[১৩৫] চৈ. ম. নদীয়া ৬৩।১-২ । [১৩৬] ম. বা. স. ত. কা. —পৃ. ২৮ ।
[১৩৭] অ ব. ৬ষ্ঠ ম.

অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাকে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। সেক্ষেত্রে প্রেমবিলাসের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে হয়।

গদাধর দাস সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে যে বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা ছাড়া অন্যত্র কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধরে নেওয়া যায় নরহরি চক্রবর্তী বিশেষভাবে না জেনে এসম্বন্ধে কোন তথ্য পরিবেশন করেন নি।

শ্রীনিবাসাচার্যের বিবাহ প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। অনুরাগবল্লীতে এপ্রসঙ্গে যা সামান্য তথ্য পাওয়া যায় তা' নরহরি সরকার ঠাকুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রেমবিলাসে এই প্রসঙ্গে অন্যরকম বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণ অনুযায়ী খেতরীর উৎসবের পর শ্রীনিবাসাচার্য পৌষমাসে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। মাঘমাসে তাঁর মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষ্যে গ্রামে এক বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা হয় এবং নানা স্থান হতে বহু শত বৈষ্ণব এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসব শেষে রঘুনন্দন তাঁকে বিবাহের পরামর্শ দেন। গুরুর আজ্ঞা নেই বলে আচার্য প্রথমে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন। বৈশাখমাসে তাঁর বিবাহ হয় স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে।

প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে আচার্যের বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল খেতরীর উৎসবের পর। এই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় হলো তাঁর মাতার পারলৌকিক কাজের সময় এবং বিবাহকার্য সম্পন্ন হলো মাতার পরলোকগমনের দুমাস পরে। আচার্যের বিবাহ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রেমবিলাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতা আগে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ খেতরীর উৎসব আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের বহু পরবর্তীকালের ঘটনা। বস্তুতঃ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে তিনি দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসার পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির বিবরণ অনুযায়ী এসময়ে আচার্যের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। প্রথম বিবাহ প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই হয়েছিল বলে এই গ্রন্থগুলি অর্থাৎ অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায়। কাজেই প্রেমবিলাসের এই বক্তব্যকে সমর্থন করা যায় না।

আচার্যের প্রথম বিবাহের পরামর্শ দেওয়ার সময় সরকার ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন তাঁর মায়ের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করা কর্তব্য। এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এসময়ে তাঁর মাতা বর্তমান ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের ঘটনাপরম্পরা

থেকে অনুমান করা যেতে পারে বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মাতা বর্তমান ছিলেন। একথা প্রেমবিলাসেও স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই সে সময়ে এই প্রস্তাব সরকার ঠাকুর করে থাকলে সে সময়ে তাঁর মাতার বর্তমান থাকারই কথা। সেদিক থেকেও প্রেমবিলাসের বক্তব্যকে স্বীকার করা যায় না।

মাতার পারলৌকিক কাজের সময় বিবাহের প্রস্তাব এবং মাতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিবাহ হিন্দু সমাজের রীতিবিরুদ্ধ কাজ। এসময়ে রঘুনন্দনের মতন প্রাচীন মহাজন এরকম প্রস্তাব করেছিলেন এবং আচার্যও মায়ের মৃত্যুর দুমাসের মধ্যে বিবাহ করেছিলেন—একথা বিশ্বাস করা যায় না।

প্রেমবিলাসে বর্ণিত গুরুর আজ্ঞা নেই বলে আচার্যের বিবাহ করতে অস্বীকার করার কথাও স্বীকার করা যেতে পারে না। প্রথমতঃ এরূপ আদেশ দেওয়া থাকলে আচার্য সম্ভবত বিবাহ করতেন না। দ্বিতীয়তঃ এজাতীয় নিষেধাজ্ঞা থাকলে সরকার ঠাকুর এবং অন্যান্যরা তাঁকে বিবাহের পরামর্শ দিতেন না। যদি এমন হয়ে থাকে যে এই নিষেধাজ্ঞার পরেও আচার্যকে বিবাহ করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে কি কারণে তিনি এই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও বিবাহ করেছিলেন তার কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু এজাতীয় কোনও তথ্য এযাবৎ পাওয়া যায় নি। অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি গৌড়ীয় মহান্তদের পরামর্শে বিবাহ করতে রাজী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে যে গুরুর নিষেধাজ্ঞার কোন প্রশ্ন ছিল না।

ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গ নরোত্তমের নীলাচল ও গৌড় ভ্রমণ, আচার্যের বিবাহ ও রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে প্রথম বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে। এই তরঙ্গের শেষাংশে আচার্যের বিবাহ ও কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাসাচার্যের বিবাহ প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে ফিরে যাওয়ার পর রঘুনন্দন যাজিগ্রামে এসে আচার্যের বিবাহের উদ্যোগ করতে লাগলেন। যাজিগ্রামে গোপালদাস চক্রবর্তী আচার্যকে তাঁর কন্যাদানে উৎসুক ছিলেন। রঘুনন্দন তাঁর কন্যাকে পাত্রী স্থির করলে বৈশাখের কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবস বিবাহের দিন ধার্য করা হলো। কন্যার বিবাহের পূর্বের নাম ছিল দ্রৌপদী। বিবাহের পর তাঁর নাম হলো ঈশ্বরী। বিবাহকালে আচার্য

কন্যাকে দীক্ষাদান করেন। বিবাহের পর গোপালদাস ও তাঁর পুত্রদ্বয় শ্যামদাস ও রামচরণ আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আচার্যের বিবাহ-বর্ণনা অপর কোনও গ্রন্থে নেই। কাজেই ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণের সত্যাসত্য নিরূপণের কোনও উপায় নেই। বিবাহের পূর্বে আচার্যের পত্নীর কি নাম ছিল তার অন্য কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নেই। তবে কর্ণপূর কবিরাজের রচনা থেকে তাঁর বিবাহের পরের নাম, এবং আচার্যের শ্যালকদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। আচার্যের শ্বশুরের নাম এই রচনায় নেই এবং তিনি যে আচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন সে কথারও উল্লেখ নেই।

গোপালদাস চক্রবর্তীর কোনও পূর্ব-পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় তিনি আচার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কারণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে আচার্য যখন অধীর হয়ে পড়েছিলেন তখন—

> শ্রীগোপালদাস নামে এক মহাশয়।
> শ্রীনিবাসে কোলে করি কত প্রবোধয়॥[১৩৮]

মনে হয় এই গোপালদাস এবং পরবর্তীকালে আচার্যের শ্বশুর গোপালদাস চক্রবর্তী একই ব্যক্তি।

শ্রীনিবাসাচার্যের এই বিবাহের কাল সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট উক্তি কোথাও নেই। তবে ঘটনার কালক্রম থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই বিবাহ হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ডঃ ননীগোপাল গোস্বামীর মতে শ্রীনিবাসাচার্য বিবাহ করে প্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।[১৩৯] এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন সেকথা তিনি উল্লেখ করেন নি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের বিবাহ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ডঃ গোস্বামীর বক্তব্যের হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান।[১৪০] ডঃ মজুমদার পরবর্তী কালে মত পরিবর্তন করেছিলেন।[১৪১] তাঁর দ্বিতীয় মতটিই অধিক প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়ে তাঁর বিবাহের কথা

---

[১৩৮] ভ. র. ৭।৫৩৮ । [১৩৯] চৈ. যু. গৌ. বৈ. —পৃ. ২৬

[১৪০] গো. দা. প. —পৃ. ৪০১ । [১৪১] ষো. শ. প. সা. —পৃ. ১১৫

গোপন করেছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ায় তাঁর কাছ থেকে বিবাহের সংবাদ প্রচার হয়ে যায় বলেও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। আচার্যের বিবাহের প্রসঙ্গে ডঃ গোস্বামীর এই উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে অনুরাগবল্লীর এই বিবরণকে আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের সঙ্গে একত্র করে নেওয়ায় তাঁর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনুরাগবল্লীর ৬ষ্ঠ মঞ্জরী পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটি তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার পরের ঘটনা। তাছাড়া প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার আগে রামচন্দ্র কবিরাজের আচার্যের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এসব কারণে ডঃ গোস্বামীর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় না।

ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে বর্ণিত অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ। এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কর্ণপুর কবিরাজের ‘গুণলেশসূচকে’ দেওয়া আছে। সেই বিবরণে দেখা যায় যে আচার্য একদিন তাঁর বাসগৃহের পশ্চিম দিকে সরোবরতটে বসেছিলেন। সে সময় তিনি দেখলেন সামনের পথ দিয়ে মন্মথতুল্য দিব্যকান্তি এক পুরুষ বিবাহান্তে দোলায় করে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন। তাঁর সুন্দর চেহারা আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে এই যুবার নাম রামচন্দ্র কবিরাজ। এঁর বাড়ী সরজনি নগরে। ইনি বিদ্যায় বৃহস্পতি, ভেষজবিদ্যায় যশস্বী এবং সভাতেও দিগ্বিজয়ী। আচার্য তাঁর পরিচয় লাভ করে আনন্দিত হয়ে বললেন যে, এমন সুন্দর দেহ লাভ করে যে হরির পদযুগল ভজন করতে পারে সে ভাগ্যবান। রামচন্দ্র আচার্যের এই উক্তি শুনতে পেয়ে মনে মনে চিন্তা করতে করতে নিজ বাসগৃহে চলে গেলেন। সমস্ত দিন চিন্তা করে সেই রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন এবং পরদিন প্রাতে আচার্যের চরণাশ্রয় করলেন। আচার্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—“তুমি জন্মে জন্মে আমারই। বিধাতা আজ আমার আনন্দের জন্য মিলিয়ে দিলেন।” এরপর তাঁকে রাধা-গিরিধারীর পাদপদ্মাশ্রয় দান করালেন। যুগলকিশোরের বিবিধ লীলাও তাঁকে শোনালেন এবং গোস্বামী-গ্রন্থ পড়িয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, “তুমি আমার স্বরূপ হও। বৃন্দাবনে তোমার তুল্য এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়েছিলেন। বহুদিন আমি একচক্ষু ছিলাম, তাই বিধাতা আজ আমাকে আর এক চক্ষুও সমর্পণ করলেন।”

অনুরাগবল্লীতে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে সামান্য বলা

হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে এই প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা কর্ণপূর কবিরাজের লেখা শ্লোকগুলির অনুবাদ বলা চলে। কর্ণানন্দেও কর্ণপূর কবিরাজের শ্লোকগুলিকে প্রায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। একে কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ, তার ওপর পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে তাকে অবিকল গ্রহণ করা হয়েছে কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের উদয় হতে পারে না। কিন্তু প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যা বলা আছে তা এসব বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বিলাসে রামচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় গ্রন্থ উদ্ধারের পর আচার্যের নাম দেশের নানাদিকে ছডিয়ে পডল। তাঁর কথা শুনে রামচন্দ্র তাঁকে দেখতে উৎসুক হলেন এবং তাঁকে দেখবার জন্য বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। কাটোয়াতে এসে শুনলেন কেউ বলছে তিনি বিষ্ণুপুরে আছেন কেউ বা বলছেন তিনি যাজিগ্রামে এসেছেন। রামচন্দ্র যাজিগ্রামের সন্ধান করে সেখানে এসে খোঁজ নিয়ে দেখেন কেউ বলছে তিনি মায়ের কাছে আছেন আবার কেউ বলছে তিনি শ্রীখণ্ডে চলে গিয়েছেন। আচার্যকে না দেখতে পেয়ে তিনি সেখানে বাসা কবে থেকে গেলেন। ত্রয়োদশ বিলাসেব বর্ণনা এখানে সমাপ্ত।

চতুর্দশ বিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীখণ্ড থেকে স্বগ্রামে ফিরে আসার পর রামচন্দ্র খবব পেয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। আচার্য তখন একাকী ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে পাঁচটি মুদ্রা সামনে রেখে চুপ করে বসে রইলেন। আচার্য তাঁকে আশীর্বাদ করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে রামচন্দ্র বললেন তাঁর জন্ম অম্বষ্ঠ কুলে এবং জন্মস্থান হলো তেলিয়াবুধরি। আচার্য তাঁকে থাকবার ব্যবস্থা কবে দিলেন। কিছুদিন পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে খেতরী থেকে তাঁর জন্মস্থান চার ক্রোশ দূরে এবং সেখান থেকে আসতে তাঁর চারদিন লেগেছে। আরও জিজ্ঞাসা করে জানলেন রামচন্দ্র অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পডেছেন। অন্য একদিন আচার্য ব্যাসাচার্যকে রামচন্দ্রের সঙ্গে বিচার করতে বললেন। ব্যাসাচার্যকে পরাজিত করে রামচন্দ্রের অহঙ্কার বৃদ্ধি পেল। অপর একদিন আচার্যের সঙ্গে রামচন্দ্রের বিচার হলো। সেদিন স্নানাহার বন্ধ করে দুজনে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচার কবে আচার্য নিবৃত্ত হলেন। সেদিন থেকে তিনি রামচন্দ্রকে অতিশয় মর্যাদা দিতে আরম্ভ করলেন। এরপর অন্য একদিন আচার্যের সঙ্গে রাম ন্দ্রের বিচার হলো। একপ্রহর পর্যন্ত অনেক বিচারের পর আচার্য রাম-

চন্দ্রকে ভাগবত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বিচারে বৃথা কালক্ষেপ না করতে উপদেশ দিলেন। এরপর রামচন্দ্র আচার্যের শিষ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আচার্য তাঁকে দীক্ষা দিয়ে শাস্ত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। একমাসের মধ্যে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হলো, কিন্তু তিনি গুরুপদাশ্রয় করে সেইখানেই থেকে গেলেন।

দেখা যাচ্ছে কর্ণপূর কবিরাজের যে বিবরণ পরবর্তী সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর সঙ্গে প্রেমবিলাসের বিবরণের কোনও সামঞ্জস্য নেই। এই বর্ণনার কোনও প্রামাণ্য ভিত্তি আছে কিনা তাও জানা নেই। কাজেই এই বিবরণের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অন্যান্য জীবনীকার কর্তৃক স্বীকৃত কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণকে গ্রাহ্য করে প্রেমবিলাসের বর্ণনাকে অনৈতিহাসিক বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রেমবিলাসে রামচন্দ্রের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেটিও গ্রহণযোগ্য কি না দেখা যেতে পারে। কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাচ্ছে তাঁকে সরজনিনগরবাসী বলে বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাসাচার্যের অন্যতম শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ রচিত সঙ্গীতমাধব নাটকে রামচন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর পিতা ছিলেন সরজনিনগরবাসী। ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে গোবিন্দদাস কবিরাজ পরবর্তী কালে খেতরীর কাছে তেলিয়াবুধরি গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। মনে হয় রামচন্দ্র খেতরীতে নরোত্তমের কাছে স্থায়িভাবে থাকতে আরম্ভ করলে গোবিন্দদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছাকাছি থাকবার জন্য তাঁর পরামর্শেই খেতরীর কাছে এই স্থান নির্বাচন করেন। কাজেই শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে রামচন্দ্রের তেলিয়াবুধরিতে থাকার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

রামচন্দ্র কবিরাজের দীক্ষাগ্রহণের সময় নিরূপণ করা কঠিন কাজ। তবে কর্ণপূর কবিরাজ, মনোহরদাস এবং নরহরি চক্রবর্তীর রচনায় ঘটনাবলীর যে ক্রম দেওয়া আছে তা থেকে অনুমান করা যায় আচার্যের বিবাহের পর তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যাচ্ছে কবিরাজের আগমনের পূর্বে দ্বিজ হরিদাসের পুত্রদ্বয়—শ্রীদায় ও গোকুলানন্দ দীক্ষা গ্রহণের জন্য আচার্যের কাছে এসেছিলেন। তিনি তখন তাঁদের দীক্ষা না দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করান। এরপর কবিরাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁকে দীক্ষা দেন। গুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী ও কর্ণানন্দের বিবরণেও আচার্যের শিষ্য হিসেবে

রামচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে দেওয়া আছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে রামচন্দ্র কবিরাজই শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথম মন্ত্রশিষ্য। এছাড়া আচার্যের বিবাহের অব্যবহিত পরের ঘটনা হিসেবে এই সকল গ্রন্থে এই দীক্ষাদানের ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আচার্য রামচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে থাকবেন। চৈতন্যচরিতামৃতের নিত্যানন্দ শাখায় রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁরাই পরবর্তীকালে আচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন বলে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৪২] এঁরা ইতিপূর্বে নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকলে স্বীকার কবতে হবে রামচন্দ্রের এবারের দীক্ষা পুনর্দীক্ষা মাত্র।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থচুরির জন্য অনুতাপ। এই বর্ণনানুসারে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্য বনবিষ্ণুপুর থেকে দেশে ফিরে এসে অধ্যাপনা ও দীক্ষাদানের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অদর্শনে রাজার মন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বৃন্দাবন থেকে আচার্য এবং রাজার নামে শ্রীজীবগোস্বামীর লেখা পত্র নিয়ে এক পত্রবাহক বিষ্ণুপুর পৌঁছুল। গোস্বামীর লেখা পত্র পেয়ে রাজার মন শান্ত হলো এবং আচার্যকে একটি পত্র লিখে গোস্বামীর পত্রসমেত আচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উত্তরে আচার্য রাজাকে জানালেন যে বিষ্ণুপুর যেতে তাঁর কিছু বিলম্ব আছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে তিনি সে সময় বিষ্ণুপুরের পথে দেশে আসেন নি এবং সে সময়ে বীর হাম্বীরের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ হয় নি। কাজেই ভক্তিরত্নাকরে এখানে বীরহাম্বীর প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা ইতিহাসসম্মত হয় নি। আচার্যের জীবনীর যতটুকু আমরা এপর্যন্ত আলোচনা করেছি সেখানে বীর হাম্বীরের প্রসঙ্গ আসতে পারে না বলে এই গ্রন্থে বর্ণিত এই অংশটুকু আমরা কাল্পনিক বলে অগ্রাহ্য করতে পারি।

ভক্তিরত্নাকরে এরপর বলা হয়েছে শ্রীক্ষেত্র থেকে দুই ব্রাহ্মণ আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁদের কাছ থেকে আচার্য সংবাদ পেলেন যে সেখানকার চৈতন্যপরিকরদের অধিকাংশই লোকান্তরিত হওয়ায় শ্যামানন্দ

---

[১৪২] ম. মু প. সা. ভ কা. —পৃ. ১৪০

মনোদুঃখে আবার বৃন্দাবন ফিরে গিয়েছেন। এই কথা শুনে আচার্য শোকাভিভূত হন। কিন্তু এই বিবরণও সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে যাওয়ার পর শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। এখানে শ্যামান’ন্দর বৃন্দাবনে যাওয়ার বর্ণনার কারণ অ’ছে। পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্যামানন্দ তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। অনুরাগবল্লীতে বর্ণিত এই তথ্যকে নরহরি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি বলে তিনি আচার্যের বৃন্দাবন গমনের পূর্বে শ্যামানন্দের বৃন্দাবন যাওয়ার কথা এখানে বলেছেন।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদ। এঁদের তিরোভাবের সংবাদে শ্রীনিবাসাচার্য অস্থির হয়ে পড়েন এবং আবার বৃন্দাবন চলে যান। সেখানে যাওয়ার পথে মথুরায় সংবাদ পান যে বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাস পরলোকগমন করেছেন। তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পর শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। আচার্যের এত শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনে সকলে আশ্চর্যান্বিত হন। সংবাদ আদানপ্রদানের পর আচার্য জীব গোস্বামীর বাসস্থানে গমন করেন ও সেখানেই থাকেন। এবার তিনি গোস্বামীর গোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শোনেন।

ভক্তিরত্নাকরের এই বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে বুঝতে হবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচাবী, গদাধর দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুর যে সময়ে লোকান্তরিত হয়েছিলেন তার নিকটবর্তী কোনও সময়ে গোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ হয়েছিল। সেক্ষেত্রে গোপালচম্পূর গ্রন্থারম্ভের কাল হিসাবে আমরা এঁদের লোকান্তরের এবং শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় করতে পারি।

গোপালচম্পূ গ্রন্থটি দুটি ভাগে রচিত হয়েছিল। পূর্ব ভাগ রচনা শেষ হয় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তর ভাগ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরে লেখা ও সংশোধিত হয়েছিল বলে সকলের অনুমান। আচার্যকে লেখা শ্রীজীব গোস্বামীর একটি চিঠি থেকেও এই ধারণা হয়। কাজেই পূর্বভাগ লেখা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হলেও রচনারম্ভ তার অনেক আগে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কত আগে এই রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না, কাজেই এখানেও অনুমান করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে জীব গোস্বামী পূর্ব ভাগ রচনা শেষ করে এবং সংশোধনের

কাজ সমাপ্ত করে উত্তর ভাগ রচনার কাজ আরম্ভ করেন এবং সংশোধনের কাজ সমাপ্ত করেন ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে। সে হিসাবে তাঁর দ্বিতীয় ভাগ রচনার আরম্ভ থেকে সংশোধিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল তিন বৎসর। প্রথম ভাগেও অনুরূপ সময় লেগে থাকলে এই গ্রন্থ রচনার কাজ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীনিবাসাচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়ে এই গ্রন্থ রচনার আরম্ভ শুনে থাকলে স্বীকার করতে হবে তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং এই সময় দিয়েই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস এবং নরহরি সরকারের তিরোভাব হয়েছিল ।

কিন্তু নানা কারণে এই যুক্তি স্বীকাব করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আমাদের হিসাব অনুযায়ী শ্রীনিবাসাচার্য দেশে ফিরেছিলেন ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার গেলে এর মধ্যে দীর্ঘ ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণানুযায়ী তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন । ঘটনার বিবরণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেও সেরকমই অনুমান করা যাচ্ছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার কাল যদি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ ধরা হয় তবে তাঁর পরবর্তী জীবনের অন্যান্য কার্যকলাপের কাল এতটা পিছিয়ে যায় যে তাঁর বয়সের সঙ্গে সে সব কার্যকলাপের সঙ্গতি বজায় রাখা কঠিন। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করেও তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার কালকে এত পরবর্তী কালের ঘটনা বলে স্বীকার করা যায় না।

অনুরাগবল্লীতে আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার কাল হিসেবে বলা হয়েছে দেশে ফিরে এসে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পঠনপাঠনের কাজ করতে লাগলেন। এসময়ে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা হলো।[১৪৩]

ভক্তিরত্নাকরেও দেখা যাচ্ছে বৃন্দাবনে পেঁছুলে—

কেহ কহে শ্রীনিবাসে দেখি কৈলু মনে।
এত শীঘ্র ইঁহার গমন হৈল কেনে ॥[১৪৪]

এই দুটি গ্রন্থের বর্ণনায় সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি প্রথমবার দেশে ফেরার পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে স্বীকার করা যেতে পারে যে আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে

[১৪৩] অ. ব. ৬ষ্ঠ মঞ্জরী

[১৪৪] ভ র ৯।৮৮

তিনি দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার কাল ধরলে গোপালচম্পূ সম্বন্ধে সমস্যা থেকে যায়। এর সমাধান হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আচার্য তৃতীয়বার বৃন্দাবন গেলে এই গ্রন্থারম্ভ শুনেছিলেন। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে আমাদের হিসাব অনুযায়ী আচার্য ঐ সময় অর্থাৎ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তৃতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের বৃন্দাবন গমনের সময় সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস ভক্তিরত্নাকরে দেওয়া আছে। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে নরহরি সরকার ঠাকুর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশীর দিন দেহত্যাগ করেছিলেন। এ সংবাদ পাওয়ার পর তিনি আর শ্রীখণ্ড যান নি—সোজা বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। সেখানে যেদিন পৌঁছেছিলেন তার দশদিন আগে মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন দ্বিজ হরিদাস দেহত্যাগ করেছিলেন। যেদিন তিনি বৃন্দাবন পৌঁছেছিলেন সেদিন বসন্ত পঞ্চমী তিথি বলে ছিল বলে ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন যাওয়ার বর্ণনায় দেখা যায় তিনি অগ্রহায়ণে রওনা হয়ে বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন পেঁীছেছিলেন। পথে নানা তীর্থদর্শন করতে করতে যাওয়ায় তাঁর এ যাত্রায় প্রায় পাঁচ মাস লেগেছিল। এবার যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় তাঁর বৃন্দাবন পেঁীছতে লেগেছিল দুমাস। বৃন্দাবন বর্ধমান থেকে ৭৭০ মাইল। যাজিগ্রাম থেকে বৃন্দাবন হাঁটা পথে যদি ৮০০ মাইলও ধরা যায় তবে দৈনিক ১৪ মাইল হিসেবে অগ্রসর হলে দুমাসে বৃন্দাবন পেঁীছানো সম্ভব। এদিক থেকে বিচার করলে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাকে অবাস্তব বলে অগ্রাহ্য করা যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্‌কালে গৌড়ে তিনজন ও বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পূর্বে সেখানে একজনের তিরোধানের বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া গেল। এঁদের সে সময়ে কত বয়স হতে পারে এবং এসম্বন্ধে যতটুকু তথ্য ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যাচ্ছে তা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। তবে এই আলোচনার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাধা হলো উপযুক্ত তথ্যের অভাব। ভক্তিরত্নাকর এবং অন্যান্য গ্রন্থে যতটুকু তথ্য এঁদের সম্বন্ধে পাওয়া যায় তার ওপর নির্ভর করে আমাদের অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চৈতন্যভাগবতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে যা তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে

অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি চৈতন্যদেব থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কারণ তাঁর জন্মের পূর্বে কৃষ্ণভক্তদের সকলে যখন উপহাস করত তখন এই উপহাস—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইঞা সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়নগোচর॥[১৪৫]

এই বিবরণ অনুসারে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যে চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে অদ্বৈতাচার্যদের মতন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন সে কথা স্বীকার করা যায়। এখানে তাঁর বয়স সর্বাপেক্ষা কম স্বীকার করলেও তা পনেরো বৎসরের নীচে ধরা যায় না। সেক্ষেত্রে তাঁকে চৈতন্যদেবের চেয়ে ১৫|১৬ বৎসরের বড় বলে অনুমান করা যায়। এই হিসাবে তাঁর জন্মকাল ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ হয়। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়ে থাকলে তাঁর সে সময় ১০৫ বৎসর বয়স হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হয়। তাঁব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য না পাওয়ায় তাঁর বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে নরোত্তমের নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে দেখা করার যে বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় তিনি এই বয়সেও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন নি।

গদাধর দাস সম্বন্ধেও সঠিক তথ্যের অপ্রতুলতা তাঁর বয়স নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ বাধা। চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে একজন গদাধরের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে চৈতন্যদেব যখন ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের সঙ্গে নানা বিচারে তাঁদের পরাস্ত করে আনন্দ পেতেন। এসময় তিনি একজন গদাধরকে দেখতে পেয়ে—

হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥

গদাধর স্বীকৃত হলে চৈতন্যদেব তাঁকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করলেন। গদাধর তার জবাব দিলে চৈতন্যদেব সে যুক্তি খণ্ডন করে তাঁকে পরাস্ত করলেন। অন্যান্য ছাত্রদের মত গদাধরও সেদিন কোনওরকমে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

বৃন্দাবন দাস বর্ণিত এই গদাধরের পরিচয় কি? ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি

---

[১৪৫] চৈ. চ ১।২

এঁকে গদাধর পণ্ডিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[১৪৭] ডঃ মাইতির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে গৌরপদতরঙ্গিণীর সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য বর্তমান।[১৪৮] কিন্তু এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ গদাধর পণ্ডিত আবাল্য ভক্তিমান বলে চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ন্যায়ের কুটতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা এবং সে বিষয়ে রুচি হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন বলে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। সেই হিসেবে চৈতন্যদেব যখন ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন তখন গদাধর পণ্ডিতের ন্যায়ের ছাত্র হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের অনুমান আলোচ্য গদাধর গদাধর পণ্ডিত নন ইনি গদাধর দাস। ইনি গদাধর দাস হলে চৈতন্যদেব অপেক্ষা কমপক্ষে ৬।৭ বৎসরের বড় ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। সেই হিসেবে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স অনুমান ৯৬ বৎসর ছিল। ভক্তিরত্নাকরে তাঁর শেষ বয়সের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় যে তিনি শেষ জীবনে বার্ধক্যের ভারে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১৪৯]

নরহরি সরকার ঠাকুরের বয়স সম্বন্ধেও সঠিক বলা সম্ভব নয়। কারণ গদাধর দাস আদি চৈতন্য-পরিকরদের সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় সরকার ঠাকুর সম্বন্ধে তাও নেই। সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী পদকারদের গৌরপদাবলী থেকে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার পরিকরদের অন্যতম ছিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন ১৪৭৮ ও ১৫৪১ খৃষ্টাব্দকে সরকার ঠাকুরের জন্ম ও তিরোভাবকাল বলে নির্ণয় করেছেন।[১৫০] তিনি কোন্ প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে এই কাল নির্ণয় করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। মনে হয় এই কাল দুটি তাঁর অনুমানমাত্র। কারণ জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু না পাওয়া গেলেও তিনি যে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তার প্রমাণ আমরা শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী থেকেই জানতে পারছি। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে নরহরি সরকার আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কমপক্ষে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[১৫১] অর্থাৎ তাঁর হিসাবে সরকার ঠাকুর প্রায় ৯০ বৎসর বয়স

---

১৪৭. চৈ. প. পৃ. ১২৪ । ১৪৮. চৈ. প. পৃ. ৮৬। ১৪৯. ভ. র. ৭।৫৯৮-৬০০
১৫০. H. B. L. পৃ. ৩২ । ১৫১. ম. যু. বা সা. ত. কা.- পৃ. ৫২

পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনিও গদাধর দাসের মতন বার্ধক্যের ভারে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১৫২]

দ্বিজ হরিদাসাচার্যের বয়স নির্ণয় সম্বন্ধেও তথ্যাভাবজনিত সমস্যা বর্তমান। পদাবলী সাহিত্যে তঁার সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা থেকে অনুমান হয় তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলায় কীর্তনীয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই হিসেবে তিনি গদাধরদাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সমবয়সী ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

বর্তমান আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের কাল যদি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ ধরা যায় তবে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত এই চারজন বৈষ্ণব মহাজনের তিরোভাবের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র প্রশ্ন থেকে যায় বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শোনার ঘটনা। কিন্তু সেটি তাঁর তৃতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় বলে সেটিকে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন ভ্রমণেব সময়কার কাহিনী নয় বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে।

আমাদের এই সিদ্ধান্তানুযায়ী দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরা ও দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার মধ্যে দেশে ছিলেন মাত্র ৪।৫ বৎসর। এর মধ্যে তঁার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো প্রথমবার বিবাহ করা এবং রামচন্দ্র কবিরাজকে শিষ্য করা। আমাদের অনুমান এসময়ের মধ্যে তিনি অপর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। সেটি হলো বীর হাম্বীরকে শিষ্য করা।

মল্লরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কোন্ সময়ে এঁদের দেখা হয়েছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ইতিপূর্বে সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করে নিয়েছেন যে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত প্রথমবার বৃন্দাবন প্রত্যাগমনের পথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রেমবিলাসে তার সমর্থন পেয়ে তঁারা এবিষয়ে একরূপ নিশ্চিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র প্রেমবিলাসের কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃতের কাহিনী সকলের মনে সামান্য সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। এই সন্দেহ ইতিপূর্বে

---

[১৫২] ভ. র. ৭।৫৬২-৬৪

হয়েছে যার জন্য এটিকে খণ্ডনের প্রয়াস কর্ণানন্দেও দেখা যায়। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নি। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনায় যে অসঙ্গতি আছে তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। কাজেই প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীনিবাসাচার্য এত বড় কৃতিত্বলাভ করেছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো এঁদের সাক্ষাৎ তবে কোন্ সময়ে হয়েছিল? আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অনেকগুলি ঘটনা পর পর ঘটে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তঁার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ। এই বিবাহ তিনি বিষ্ণুপুরে করেছিলেন বলে সকল গ্রন্থকারের অভিমত। তার আগে তিনি বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—সঙ্গতভাবে একথা অনুমান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠার দুটি সম্ভাব্য সময় থাকতে পারে। তার একটি হলো আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরা এবং দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ১৫৭০ থেকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অপরটি তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফেরা এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করার মধ্যে অর্থাৎ ১৫৭৬ থেকে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই দুটি সময়ের মধ্যে দেখা যাবে যে দ্বিতীয় কালটিতে তিনি কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে কালযাপন করছেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠার মূলে এই রাজশিষ্যের অবদানও অনেকখানি। এ সময়কার জীবনী আলোচনাকালে দেখা যাবে বীর হাম্বীরের মতন একজনকে শিষ্য করার ফলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে শিষ্য করা এবং প্রতিপত্তি লাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় বলে অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই ধরে নিতে হয় এই সাক্ষাৎকার ১৫৭০ থেকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হয়েছিল।

বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইতিপূর্বে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়[১৫৩] ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার[১৫৪] এসম্বন্ধে মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের আনুমানিক সময়ে এঁদের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়। মনে হয় রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর এঁদের এই সাক্ষাৎকার হয়ে থাকবে। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বীর হাম্বীর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের পর এবং

---

[১৫৩] ম. মু. বা. সা. ত. কা.—পৃ. ১১৪-১৬। [১৫৪] যো. শ. বা. সা—পৃ. ১২২

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে বীর হাম্বীরের যোগাযোগ হওয়া সম্বন্ধে কর্ণপূর কবিরাজের যে বর্ণনা আছে তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কর্ণানন্দেও এই বর্ণনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে আচার্য পুরুষোত্তম দর্শনের জন্য বনপথে যাত্রা করলেন। একদিন একটি গ্রামে রাত্রিতে বিশ্রাম করছিলেন। গণনার সাহায্যে দস্যুরা জানতে পারল যে তাঁর সঙ্গে রত্ন আছে। দস্যুরা গ্রন্থ অপহরণ করে নিয়ে গেলে তিনি সেগুলি উদ্ধারের জন্য রাজার কাছে গেলেন।[১৫৫]

ভক্তিরত্নাকরেও ইতিপূর্বে দেখেছি যে নীলাচলের পথে গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ নরহরি চক্রবর্তী একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে আচার্য যখন সদলে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন—

নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥
বিশেষ—শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥
স্থানে স্থানে প্রভুভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখায় সে সব স্থানে অধৈর্য্য হইয়া॥[১৫৬]

শুধুমাত্র এই নয়। এরপরেও তিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন॥[১৫৭]

তিনটি গ্রন্থে, বিশেষতঃ কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় যখন নীলাচলে যাওয়ার পথে গ্রন্থ অপহরণের কথা বলা হয়েছে তখন এই বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

নীলাচলে যাওয়ার পথে গ্রন্থ অপহরণের বিবরণকে গ্রহণযোগ্য মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে বৃন্দাবন থেকে নীলাচল যাতায়াতের পথে বিষ্ণুপুর অতিক্রম করার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু গৌড় থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে নীলাচল যাওয়া সম্ভব ছিল।

---

১৫৫. ক. ১ম নির্য্যাস। ১৫৬. ভ. র. ৭।১৭-১৯। ১৫৭. ঐ ৭।২২

এই প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তীর দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি গ্রন্থ অপহরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্যের বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে গ্রন্থ অপহরণের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে নীলাচলের পথে গ্রন্থ অপহৃত হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেছেন। মনে হয় তাঁর এই দুটি বর্ণনাকে একসঙ্গে স্বীকার করে নেওয়ার মূলে ছিল এসম্বন্ধে তৎকালীন জনশ্রুতি ও কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ। লক্ষ্য করার বিষয় যে বনবিষ্ণুপুরের কাছে গ্রন্থ অপহরণ সম্বন্ধে তৎকালীন জীবনীকাররা নীরব ছিলেন। এমনকি অনুরাগবল্লীতেও এসম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত বিবরণ নেই। এর কারণ সুস্পষ্ট। আচার্যশিষ্য ও বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর সম্বন্ধে সাধারণের মনে যাতে কোনও বিরূপ ধারণা না জন্মায় সেজন্য এঁরা সকলেই হয়তো নীরব ছিলেন। একমাত্র কর্ণপূর কবিরাজ এসম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। এই ঘটনা কোথাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না থাকায় ঘটনাটি জনশ্রুতিতে পরিণত হয়ে থাকবে এবং সে সময়ে এর স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। নরহরি চক্রবর্তী এই জনশ্রুতিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি আবার কর্ণপূর কবিরাজের রচনাকেও অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কাজেই এই দুটি বিবরণকে একত্র করে নিয়ে তিনি এভাবে বর্ণনা দিয়ে থাকবেন। তিনি সে সময় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নি যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়ে গিয়েছে।

গ্রন্থরাজি নিয়ে আচার্যের নীলাচল গমন সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথম প্রশ্ন হলো—গ্রন্থরাজি নিয়ে তাঁর নীলাচল যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রথমতঃ নীলাচলের বৈষ্ণবসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কোন পরিচয় আমরা এযাবৎ পাই নি। দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে নীলাচলে গ্রন্থগুলি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও কোন তথ্যের সন্ধান আমরা পাই নি। সেক্ষেত্রে গ্রন্থ নিয়ে তাঁর নীলাচল গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

আচার্যের নীলাচল গমন সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তাঁর ভ্রমণ-পথ সম্বন্ধে। ইতিপূর্বে চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এদেশ থেকে যে পথে নীলাচল যেতেন বলে আমরা জানি সেই চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে তিনি বনপথে বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়ে নীলাচল যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কেন? অপরিচিত পথের—বিশেষতঃ বনপথে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এপথে নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে সে কথা জেনেও তিনি এই বনপথে কেন [illegible]—এ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

প্রথম প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর এই হতে পারে যে গদাধর গোস্বামীর কাছে ভাগবত পড়ার জন্য আচার্য যখন নীলাচল গিয়েছিলেন তখন তিনি দীর্ঘকাল নীলাচলে বাস করেছিলেন বলে আমরা অনুমান করছি। সে সময়ে তাঁর সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে নীলাচলে গ্রন্থ পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও যেমন কোন তথ্য আমাদের জানা নেই তেমনি তাঁরা এরূপ নির্দেশ দেন নি—এরকম কোন তথ্যও আমাদের জানা নেই। তাঁর নীলাচল যাওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ যখন নেই তখন অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে নীলাচলের বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে আচার্যের পূর্ব-পরিচয় থাকার জন্য তিনি হয়তো বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা এই গ্রন্থগুলি সেখানে পৌঁছে দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য এবং নীলাচলের পূর্ব-পরিচিত বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থরাজি নিয়ে এই সময়ে নীলাচলে গিয়ে থাকবেন।

আচার্য যে সময়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন সে সময়ে চৈতন্যপরিকরদের সকলের বর্তমান থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে এসময়ে নীলাচলে কোন্ কোন্ বৈষ্ণব মহাজন থাকতে পারেন যাঁদের সঙ্গে আচার্যের দেখা করার আগ্রহ থাকতে পারে এবং যাঁরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে উৎসুক থাকতে পারেন।

আমাদের আলোচ্য সময়ে শ্রীনিবাসাচার্যের নীলাচল ভ্রমণের কথা আচার্যের জীবনীগ্রন্থগুলিতে না থাকলেও নরোত্তম ঠাকুরের নীলাচল ভ্রমণের বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে দেওয়া আছে। বিশেষতঃ নরোত্তম ঠাকুরের নীলাচল ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে নরোত্তমবিলাসের চতুর্থ বিলাসে। এই অংশের বর্ণনায় দেখা যায় ঠাকুর মহাশয় জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে প্রথমে গেলেন গোপীনাথাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর তখন জীর্ণ অবস্থা। সেখান থেকে তিনি গেলেন পণ্ডিত গোস্বামীর আসন দর্শন করতে। সেখানে ছিলেন মামু গোস্বামী। তাঁর অবস্থাও গোপীনাথাচার্যের অনুরূপ। সেখান থেকে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করে ঠাকুর মহাশয় গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ফিরে এলেন। সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কানাই খুঁটিয়ার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করে এলেন। পরদিন নরোত্তম ঠাকুর শিখি মাহিতির সঙ্গে জগন্নাথের মঙ্গলারতি দর্শন করে গৌড়ে ফিরে এলেন।

এখানে যে কয়জন বৈষ্ণবের সঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের সাক্ষাতের কথা

বলা হয়েছে তা ছাড়া যাঁদের উল্লেখ এই বিলাসে করা হয়েছে তাঁরা হলেন বাণীনাথ ও মঙ্গরাজ। গোপালগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ নরোত্তমবিলাসে নেই কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে আছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে কাশী মিশ্রের ভবনে গোপালগুরুর সঙ্গে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

নরোত্তমবিলাসে এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম পাওয়া যাচ্ছে এঁদের মধ্যে মামু ঠাকুর ও গোপালগুরু ছাড়া আর সকলেই চৈতন্য-সমসাময়িক। এঁদের মধ্যে গোপীনাথ আচার্য্য চৈতন্যদেবের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর সেজন্য তাঁকে অতি জীর্ণ অবস্থায় দেখে থাকবেন। এই বর্ণনা থেকে আরও অনুমান করা যায় মামু ঠাকুরও বয়স্ক ছিলেন। অন্যান্য যাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরাও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং আলোচ্য সময়ে তাঁরা যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। তবে এসময়ে তাঁদের এত বয়স না হওয়া সম্ভব যে সময়ে এঁদের বর্তমান থাকা সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হতে পারে। কাজেই আচার্য এসময়ে নীলাচল গিয়ে থাকলে এঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা এবং তাঁদের স্বাভাবিকভাবে গোস্বামীদের গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে আগ্রহ থাকার কথা।

শ্রীনিবাসাচার্যের বিষ্ণুপুরের পথে নীলাচল যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ১৫৭২ থেকে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে বায়াজিদ কররানী ও দাউদ কররানীর রাজত্ব ছিল। সুলেমান কররানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে হত্যা করে সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল।

তরুণ দাউদের রাজত্বকালে মোগলদের সঙ্গে বাংলার শাসকদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মোগলদের আক্রমণে পরাজিত হয়ে দাউদ সাতগাঁও থেকে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করে শুনল দাউদের অন্যতম পরামর্শদাতা ও প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি যশোরের দিকে পলায়ন করেছেন। মোগল সেনাধ্যক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এদিকে রাজা তোড়রমল্ল বর্ধমান থেকে মান্দারণ উপস্থিত হলেন। এভাবে মোঘল ও আফগানদের যুদ্ধ গৌড়ের এই প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই অনুমান করা যায় যে এদিককার পথ বেশী পরিচিত হলেও যুদ্ধবিগ্রহের বিপদ এড়িয়ে চলার জন্য খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আচার্য বিষ্ণুপুরের বনপথে নীলাচল অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের বর্ণনা থেকে স্বীকার করা যায় যে শ্রীনিবাসাচার্যের যে সময়ে গোস্বামীগ্রন্থ নিয়ে নীলাচল যাওয়া সম্বন্ধে আমরা অনুমান করছি সে সময়ে সেখানে চৈতন্য-পরিকরদের এমন অনেকের থাকা সম্ভব ছিল যাঁদের বৃন্দাবনে রচিত এসব গ্রন্থ সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া সম্ভব হতে পারে। কাজেই সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে শ্রীনিবাসাচার্য গৌড়ে গোস্বামীদের গ্রন্থ এনেছেন শুনে এঁরা সেই গ্রন্থের প্রতিলিপি পেতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং আচার্যও তাঁর প্রথম সুযোগে এই গ্রন্থরাজি নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। প্রচলিত পথে যুদ্ধবিগ্রহ থাকায় তিনি বিষ্ণুপুরের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বীর হাম্বীরের[১৫৮] আচার্যের শিষ্য হওয়া প্রসঙ্গেও ভক্তিরত্নাকরে খানিকটা বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রন্থ অপহরণকে কেন্দ্র করে এঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। এবার রাজা আচার্যের আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে শুধু হরিনাম উপদেশ দেন। নবম তরঙ্গে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে তিনি তাঁকে দীক্ষা দান করে তাঁর নাম রাখেন চৈতন্যদাস। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা পড়ে মনে হয় না আচার্য রাজাকে দীক্ষা দিতে এত বিলম্ব করেছিলেন। বিলম্ব করার সঙ্গত কারণও নেই। রাজা অপহারক হলেও বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন—তাঁর রাজসভায় নিত্য ভাগবত পাঠ হতো। তৎসত্ত্বেও নরহরি চক্রবর্তীর এই জাতীয় বর্ণনার মূলে বোধহয় অনুরাগবল্লীর বর্ণনা। সেখানে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়বার আচার্যের বৃন্দাবন থেকে ফেরার প্রসঙ্গে শ্যামানন্দের ফেরার কথা বলা হয়েছে এবং আকস্মিক ভাবে এর পরই বীর হাম্বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কাজেই প্রথমবার গ্রন্থ আনয়নের সঙ্গে গ্রন্থ অপহরণ

---

[১৫৮] "The word Hammira or Hamvira is a corrupt Indian form of the Arabic administrative term Amir. The first numismatic reference to this term ts found by the begining of the thirteenth century A. D. on the coins of Mu'iz ud-Din Mohammad ibn Sam (death in 1206 A. D.) who came to India first as his brother's viceroy to Ghazni and India and later as the Sultan. The Hammira or the Maslim chief, who was defeatcd by Govindachandra befoer V. S. 1166 appears to have been some officer of the contemporary Yamini Sultan of Ghazni and Lahore, Mas'ud (III) ibn Ibrahim (c. 1099-1115 A. D.)." —Roma Niyogi, History of the Gahadavala Dynasty. Calcutta. Calcutta Oriental Book Agency. 1959. pp. 57-58.

যুক্ত করে নিয়ে বীর হাম্বীরের সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাৎ বিবৃত করেও নরহরি সেখানে তাঁর দীক্ষা দানের কথা বলেন নি। এ ব্যাপারে অনুরাগবল্লীর বর্ণনাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে রাজার দীক্ষা দানের কথা বলতে হয়েছে। অনুরাগবল্লীর বর্ণনার এই ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও করেছেন যদিও তিনি গ্রন্থ অপহরণের ঘটনাটা অন্য সময়ে হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন।[১৫৯] কিন্তু অনুরাগবল্লীর এখানকার বর্ণনায় যে ঘটনার কোনও ক্রম অনুসরণ করা হয় নি তা আগেই আলোচনা করেছি।

ভক্তিরত্নাকরের এই দুই স্থানের বিবরণ একত্র করে আচার্যের কাছে রাজার দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে।

ভক্তিরত্নাকরের সপ্তম তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে আচার্য নীলাচলে যাওয়ার পথে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল "এক মহাজন। নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন॥"[১৬০] মল্লরাজ্যে প্রবেশ করার পর চরের মুখে মল্লরাজ বীর হাম্বীর একথা শুনলেন। রাজার আদেশে তাঁর দস্যুদল সবার অলক্ষ্যে আচার্যদের সঙ্গ নিল। তাঁরা পঞ্চবটী পার হয়ে মল্লরাজধানী বনবিষ্ণুপুরের নিকটস্থ বনমধ্যে এক বৃহৎ গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। আচার্যরা রাত্রে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, গ্রামবাসীদের তাঁদের সম্বন্ধে ভয় ছিল কিন্তু রাজরোষের ভয়ে কিছু বলতেও পারছিলেন না। এদিকে দস্যুদল আচার্যদের সঙ্গে থাকলেও অপহরণের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তামড়গ্রামের নিকটে প্রস্তুত হয়েও কার্যসিদ্ধি হলো না। রঘুনাথপুরের কাছে এসেও তারা অকৃতকার্য হয়েছিল। অবশেষে বনবিষ্ণুপুরের কাছে এসে তারা কৃতকার্য হলো। আচার্যরা যখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন তারা আচার্যদের গাড়ীসমেত গ্রন্থরাজি অপহরণ করে রাত্রিশেষে বিষ্ণুপুরে রাজার কাছে উপস্থিত হলো। রাজা আনন্দিত মনে গ্রন্থের সম্পুট খুলে রত্নের পরিবর্তে গ্রন্থরাজি দেখে বিস্মিত হলেন। দস্যুসর্দারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে তারা গ্রন্থ অপহরণ করেছে মাত্র। দলের কারো কোন ক্ষতি করে নি।

সকালে উঠে আচার্যরা গ্রন্থ অপহৃত হয়েছে দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আচার্য তখন মনস্থির করে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমকে খেতরীতে পাঠিয়ে দিয়ে

---

১৫৯. ষো. শ. প. সা. —পৃ. ১১৪ । ১৬০. ভ. র. ৭।২২

এবং অন্যান্য সঙ্গীদের অন্যত্র রেখে একাকী বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সৌন্দর্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেউলীর কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। রাজার সম্বন্ধে আচার্য তাঁর কাছে বিস্তারিত সব শুনলেন। তিনি ভাগবত শুনে আচার্য কৃষ্ণবল্লভকে সঙ্গে করে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। আচার্যকে দেখে রাজা আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম করে অপূর্ব আসন দিলেন। আচার্য ভাগবত প্রসঙ্গের পূর্বে রাজার সঙ্গে অন্য কোনও কথা বলতে রাজী হলেন না। রাজা তখন তাঁর কাছে ভ্রমরগীতা শুনতে চাইলে আচার্য তাঁর অপূর্ব পাঠ ও ব্যাখ্যায় রাজার মন হরণ করলেন। সন্ধ্যাকালে আচার্যের বাসভবনে হাজির হয়ে রাজা তাঁর বিষ্ণুপুর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আচার্য চৈতন্যদেবের জীবনী, বৃন্দাবন উদ্ধার, রূপসনাতনের কাহিনী ও নিজ বৃত্তান্ত বলে দেশে ফেরার পথে গ্রন্থ অপহরণের কথা বললে রাজা নিজ অপরাধ স্বীকার করলেন; আচার্যকে রম্য বাসস্থান দিয়ে তাঁকে গ্রন্থরাজি দেখালেন, তারপরে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

এরপর রাজা শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে হরিনাম মহামন্ত্র উপদেশ করে গ্রন্থাস্বাদনের পর রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে খেতরীতে নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কাছে এবং বৃন্দাবনে গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

খেতরীতে গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার পর শ্যামানন্দ উৎকলের পথে অম্বিকা কালনা যাত্রা করলেন। এদিকে রাজাকে গোস্বামী-গ্রন্থ পাঠ করিয়ে শ্রীনিবাসাচার্যও বনবিষ্ণুপুর থেকে দেশে ফেরার উদ্যোগ করলেন। রাজা ও রাণীকে প্রবোধ দিয়ে তিনি সসম্মানে দেশে ফিরে এলেন।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীনিবাসাচার্য রামচন্দ্র ও শ্যামানন্দকে নিয়ে বিষ্ণুপুর উপস্থিত হলেন। সেখানে দশদিন থেকে শ্যামানন্দ উৎকল অভিমুখে রওনা হলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্যের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে দুমাস থাকলেন। এই সময়ে আচার্য রাজা বীর হাম্বীর, রানী সুলক্ষণা ও রাজপুত্র ধাড়ি হাম্বীরকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে রাজার নাম হলো চৈতন্যদাস। এরপর আচার্য রাজাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে গোস্বামী-গ্রন্থাদি থেকে উপদেশ দেওয়ার ভার দিলেন রামচন্দ্রের উপর।

বীর হাম্বীরের সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা প্রেম-

বিলাসে দেওয়া আছে তা থেকে মনে হয় ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাকে ভিত্তি করে এটি রচিত। একটি ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেটি হলো ভক্তিরত্নাকরে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও দীক্ষাদানের প্রসঙ্গকে দুঃসময়ের ঘটনা বলে দুভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেমবিলাসের বর্ণনায় আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার কোনও কথা নেই। কাজেই এই দুটি ঘটনাকে এখানে একসঙ্গে বলা হয়েছে। এছাড়া সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

প্রেমবিলাসে ত্রয়োদশ বিলাসে এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় গ্রন্থ অপহরণের পর নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে খেতরীতে পাঠিয়ে শ্রীনিবাসাচার্য "বাউলের প্রায়" বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন এবং দশদিন যাবৎ নগরমধ্যে ভিক্ষা করে দিন কাটালেন। এরপর একদিন একটি গাছতলায় বসে আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে আচার্য জানলেন যে তাঁর নাম কৃষ্ণবল্লভ এবং সেখান থেকে অর্ধক্রোশ দূরে নদীপারে দেউলিতে তিনি থাকেন। কৃষ্ণবল্লভের কাছে আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—

কহ দেখি কেবা রাজা কিবা নাম হয়।
ধার্মিক কি অন্য মন তাহার আশয়॥[১৬১]

উত্তরে কৃষ্ণবল্লভ জানালেন যে রাজা অতি দুরাচার। সর্বদা দস্যুবৃত্তি করা তাঁর কাজ—

মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট
বীর হাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট॥[১৬২]

এক ব্রাহ্মণ রাজাকে পুরাণ শোনায়। রাজার সঙ্গে প্রজারাও শোনে, তবে দুর্জন পাষণ্ডকে বিশ্বাস নেই সেজন্য তারা বেশীক্ষণ সেখানে থাকে না। এরপর আচার্য জিজ্ঞাসা করে জানলেন কৃষ্ণবল্লভ ব্যাকরণ পর্যন্ত পড়েছেন। দুজনে কিছুক্ষণ বিচার হলো। কৃষ্ণবল্লভের অনুরোধে আচার্য তাঁকে পড়াতে রাজী হয়ে তাঁর বাসায় গেলেন। সেখানে রান্না করে খাওয়াদাওয়ার পর আচার্য তাঁকে পড়ালেন। তারপর কৃষ্ণবল্লভ রাজদ্বারে গেলেন। তিনি ফিরে আসার পর আচার্য জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে সেদিন রাজসভায় ভাগবত পাঠ হয়েছে। রাজা অন্তঃপুরে চলে যাওয়ার পর তিনি ঘরে ফিরে এসেছেন।

---

[১৬১] প্রে. বি. ১৩শ বি. । [১৬২] ঐ ১৩শ বি

আচার্য পরদিন তাঁর সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে দেখলেন রাসপঞ্চাধ্যায় পড়া হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত অর্থ করা হচ্ছে না। সেদিন আচার্য কিছু না বলে ঘরে ফিরে এলেন। পরদিন আবার যখন রাসপঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যা হচ্ছে তখন আচার্য পণ্ডিতকে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা করতে বললেন। এরপর রাজার অনুরোধে আচার্য ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলে সভাস্থ সকলে বিস্মিত হলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঠ হলো। আচার্য রাজাকে নিজ পরিচয় দিলে আচার্যকে প্রাসাদের কাছে বাসস্থান দেওয়া হলো। সেদিন রাত্রে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে আচার্যের সেবা করলেন।

পরদিন সকালে উঠে রাজা আবার শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। সভাপণ্ডিতকে নিয়ে এসে এবার আবার আচার্যের মুখে ভাগবত শুনলেন। ব্যাখ্যা শুনে রাজার হৃদয় বিগলিত হয়ে অশ্রুধারায় পর্যবসিত হলো। রাজা আবার আচার্যের পরিচয় এবং তাঁর সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। আচার্য সব খুলে বললে রাজা নিজের কাজ স্বীকার করলেন এবং নিয়ে গিয়ে আচার্যকে অপহৃত গ্রন্থগুলি দেখালেন। আচার্য সেদিন পূজার পর রাজাকে হরিনাম মন্ত্র দিলেন। রাজপণ্ডিতকে দীক্ষা দিয়ে "আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া দিবসে" রাজার দীক্ষার আয়োজন করলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে রাজাকে দীক্ষা দিয়ে নামকরণ করলেন "হরিচরণ" দাস।

প্রেমবিলাসের এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সেটি কাঠামোয় ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের অনুরূপ। বরং সেই বর্ণনাকে আরও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গতিরক্ষা হয় নি। প্রথমতঃ শ্রীনিবাসাচার্য নগরের মধ্যে দশদিন ধরে ঘুরলেন অথচ সেদেশ সম্বন্ধে কোনও খবর পেলেন না—এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এখানে কৃষ্ণবল্লভের মুখ দিয়ে রাজা সম্বন্ধে যা বলানো হয়েছে তাতে তাঁকে রাজা না বলে অত্যাচারী দস্যু বলা সঙ্গত। সেকালের ছোটোখাটো ছোটাখাটো রাজারা নিজ রাজত্ব সম্বন্ধে সকলকর্তব্য পালন করলেও সম্পদবৃদ্ধির জন্য দস্যুদলের পৃষ্ঠপোষতা করতেন। এই ব্যবস্থা চিরকালের নিয়ম। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যখন এদেশে জমিদারী প্রথা বর্তমান ছিল তখনও জমিদারদের অনেকেই এরকম দস্যুদলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাই বলে তাঁদের নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী বলা যেত না। কাজেই এখানে যে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের আচরণের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে তাতেও অতিশয়োক্তি আছে। গ্রন্থ অপহৃত হওয়ায় ক্ষিপ্ত বাউলের মতন ঘুরে

বেড়াচ্ছেন তিনি সাহিত্য ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করলেন, তারপর রাজসভায় ভুল ব্যাখ্যা শুনেও প্রথমদিন কিছু না বলে চলে এলেন—এসব ঘটনা আচার্যের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শুধু আচার্যের নয় রাজার চরিত্রের বর্ণনাতেও যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভাব দেখা যাচ্ছে তাকে বাস্তবানুগ বলা চলে না।

তাছাড়া কিছু তথ্যগত পার্থক্যও দেখা যাচ্ছে। রাজসভায় আচার্য ভ্রমরগীতা পাঠ করেছিলেন বলে কর্ণপুর কবিরাজের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে। দীক্ষান্তে রাজার নাম রাখা হয়েছিল চৈতন্যদাস বলে নরহরি বর্ণনা করেছেন। এখানে সেই নাম বলা হয়েছে হরিচরণ দাস। যে গ্রন্থের কোন বর্ণনাকেই আমরা ইতিহাসসম্মত বলতে পারছি না সেই গ্রন্থ কর্তৃক পরিবেশিত এই তথ্য দুটিকেও সত্য বলে স্বীকার করা যায় না।

প্রেমবিলাসের বিষ্ণুপুর সংক্রান্ত অপর বিতর্কমূলক তথ্য হলো শ্রীনিবাসাচার্য কর্তৃক আনীত গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতের অবস্থিতি এবং সেই গ্রন্থ অপহরণের সংবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক আত্মহত্যা। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের ত্রয়োদশ বিলাসে বলা হয়েছে যে গ্রন্থ অপহরণের পর সেই সংবাদ লিখে সঙ্গের লোকজনদের আচার্য বৃন্দাবন পাঠিয়ে বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। এদিকে আচার্য বৃন্দাবনে পৌঁছুলে সেখানে হাহাকার পড়ে গেল। কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে ॥
কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ ॥

এরপর রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন তাঁর জন্য খেদ করতে লাগলেন তখন—

নিজনেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে।
চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে ॥
* * * * * * * * * * * * * *
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন।
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রমণ ॥

প্রথম গ্রন্থের প্রসঙ্গ ধরা যাক। চৈতন্যচরিতামৃত যে বহু পরবর্তী কালের

রচনা সে সম্বন্ধে বর্তমানে কোনও দ্বিমত নেই। কাজেই বিষ্ণুপুরের ঘটনা ১৫৭০-৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হয়ে থাকলে চরিতামৃত অপহৃত হওয়ার কোনও প্রশ্ন আসতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ এসময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জরাপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের অনেক জায়গায় তিনি নিজেকে জরাগ্রস্ত বলেছেন। তারই প্রভাবে এখানে এসময়ে কবিরাজকে জরাগ্রস্ত বলা হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স ৮৫ বৎসরের উপর ছিল বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন[১৬৩]। সেখানে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স ৪০ বৎসরের কিছু বেশী হয়। এই বয়সের কোনও ব্যক্তিকে জরাগ্রস্ত বলা চলে না। কাজেই কোন দিক থেকে প্রেমবিলাসের এই বর্ণনাকে ইতিহাসসম্মত তো দূরের কথা যুক্তিসম্মতও বলা চলে না।

প্রেমবিলাসের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহরণের কাহিনী অনুরাগবল্লীর সময়ে ততখানি প্রাধান্য লাভ না করলেও পরবর্তী কালে যথেষ্ট প্রচারলাভ করেছিল। ভক্তিরত্নাকর রচনাকালে এই ঘটনার কাল সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এটিকে আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং গুণলেশসূচকে বর্ণিত আচার্য কর্তৃক আনীত গ্রন্থের তালিকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের নাম থাকায় সেই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম যুক্ত হয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই কিংবদন্তীর যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন এতটা কাল অতিবাহিত হয়েছে যে গ্রন্থ অপহরণ ও চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার কালের মধ্যের ব্যবধান সম্বন্ধে সকল ধারণাই লুপ্ত হয়েছে। কাজেই এই কাহিনীর উৎপত্তি যে ভক্তিরত্নাকর রচনারও বহু পরে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেও এসম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল বলে ভক্তিরত্নাকরে এই শ্রেণীর অমূলক বর্ণনা নেই।

বীর হাম্বীরের সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেল তা থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে ১৫৭২-৭৪ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে গ্রন্থ নিয়ে যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুরের কাছে গ্রন্থাদি অপহৃত হওয়ায় শ্রীনিবাসাচার্য তার খোঁজে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন। সেখানে দেউলির কৃষ্ণ-

---

[১৬৩] ব. বৃ. বা. সা. ত. কা. — পৃ. ১৯৯

বল্লভের গৃহে আশ্রয় নেন এবং রাজা কর্তৃক গ্রন্থ অপহৃত হয়েছে সেকথা জানতে পারেন। রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি রাজসভায় উপস্থিত হন এবং সেখানে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে তিনি হেসে ওঠেন। তখন রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর অনুরোধে তিনি যখন গোস্বামীদের আদর্শানুযায়ী ভ্রমরগীতা ব্যাখ্যা করেন তখন সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। আচার্যের চেহারা ও পাণ্ডিত্য রাজাকে মুগ্ধ করে থাকবে, কারণ তিনি তারপর আচার্যকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। অপহৃত গ্রন্থগুলি যে তাঁর, সেকথা রাজা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। সেজন্য রাত্রে নিভৃতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর কাছে সব শুনে রাজা নিজের অপরাধ স্বীকার করে আচার্যের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আচার্যও তাঁকে সপরিবারে দীক্ষা দান করেন। আচার্যের সঙ্গে এযাত্রায় রামচন্দ্র ছিলেন। তাঁর ওপর আচার্য রাজাকে গোস্বামী-গ্রন্থ উপদেশের ভার দিয়েছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে গ্রন্থসম্ভার নিয়ে আচার্য বিষ্ণুপুর থেকে নীলাচলে চলে গিয়েছিলেন বলেই বোধহয় তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের ওপর রাজাকে বৃন্দাবনের গোস্বামীর রচিত বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপনার ভার দিয়ে থাকবেন।

বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালে শ্রীনিবাসাচার্যের অপর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণকে কৃপা করা। তিনি আচার্যের শিষ্য হতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু রাজা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বলে তিনি নিজে তাঁকে দীক্ষা না দিয়ে রঙ্গক্ষেত্রের ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে পত্রদ্বারা আনিয়ে দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভট্টপুত্র পঞ্চকুটীতে এসে রাজাকে দীক্ষা দেওয়ার পর আচার্য রাজাকে বৈষ্ণব তত্ত্ব জ্ঞাত করালেন। রাজা বীর হাম্বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণে আচার্যের খ্যাতি ও প্রভাব কতখানি বিস্তৃতিলাভ করেছিল এই ঘটনা থেকে তা খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের আগে এখানে তিনি কি কি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা গেল ১৫৭১ থেকে ১৫৭৫ এর মধ্যে বিবাহ করা, রামচন্দ্র কবিরাজ, রাজা বীর হাম্বীর প্রমুখ সেকালের প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারকে শিষ্য করা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কি কারণে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধেও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এবার তাঁর দ্বিতীয়বার

বৃন্দাবন গমন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে অনুরাগবল্লীর একটি বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন প্রসঙ্গে অনুরাগবল্লীতে একটি ঘটনার বিবরণ দেওরা আছে। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় গোপালভট্ট গোস্বামীর সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাৎ হলে তিনি জানতে চাইলেন আচার্য বিবাহ করেছেন কি না। আচার্য জানালেন যে তিনি বিবাহ করেন নি। ভট্ট গোস্বামী আনন্দিত মনে তাঁকে রাধারমণের অধিকারী নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে দেশে আচার্যপত্নী ঈশ্বরী ঠাকুরানী উদ্বিগ্ন হয়ে আচার্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেন। তাঁর কাছ থেকে ভট্ট গোস্বামী জানতে পারেন যে আচার্য বিবাহ করেছেন। আচার্যকে ডেকে তিনি তাঁকে মিথ্যা বলে প্রতারণা করার কারণ জানতে চাইলেন। আচার্য তখন অকপটে বললেন যে, গুরুর চরণ বন্দনা, বৃন্দাবনের বিগ্রহাদি নিত্য দর্শন এবং শ্রীজীবাদি মহাজনদের সঙ্গলাভের জন্য তিনি এই একটি মিথ্যা বলেছেন। গোস্বামী উত্তর শুনে আনন্দিত মনে তাঁকে ক্ষমা করলেন কিন্তু রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে পরামর্শ দেওয়া হলো।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে গোপালভট্ট গোস্বামীর সঙ্গে আচার্যের এই আলাপের কোনও উল্লেখ নেই। অনুমান করা যেতে পারে তৎকালে এরূপ কোনও কিংবদন্তী প্রচলিত থাকায় মনোহরদাস এই কাহিনী অনুরাগবল্লীতে লিপিবদ্ধ করে থাকবেন। কিন্তু এর কোনও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি না পাওয়ায় নরহরি চক্রবর্তী এই ঘটনার কোনও উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে করেননি। এই ঘটনার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। এই কাহিনীতে মনে হয় তিনি আবার বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরূপ মিথ্যাচারণ করেছিলেন। কিন্তু কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। মনে হয় নরহরি চক্রবর্তীও এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নি।

প্রেমবিলাসে আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের কোনও উল্লেখ নেই। তবে আচার্যের বিবাহে গোপালভট্টের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের ষোড়শ বিলাসে গ্রন্থকার তাঁর এক গুরুভ্রাতা চৈতন্যদাসের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মহান্তদের দর্শন করেন। তিনি

গোপালভট্টের কাছে গেলে ভট্ট গোস্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করেন—

আপনে জানহ এক জিজ্ঞাসি তোমারে।
শ্রীনিবাস আচার্য কে জানহ তাঁহারে॥

এই প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্যদাস নিবেদন করলেন যে বিষ্ণুপুর থেকে তাঁর বাসস্থান মাত্র বার ক্রোশ দূরে এবং তিনি বীরহাম্বীরের প্রজা। রাজা বর্তমানে আচার্যের সেবক। রাজা তাঁকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে বিষ্ণুপুরে স্থায়ী করিয়েছেন। গত ফাল্গুন মাসে তিনি বিবাহ করেছেন। তাঁর এপর্যন্ত কোনও সন্তান হয় নি। একথা শুনে ভট্ট গোস্বামী—

মৌন করি রহিলেন না বলিল আর।
স্খলং স্খলং বাক্য কহে বারবার॥

এরপর চৈতন্যদাস দেশে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিষ্ণুপুরে গেলে আচার্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ভট্ট গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে শুনে আচার্য তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। চৈতন্যদাস তাঁর বিবাহের কথা গোস্বামীকে বলেছেন শুনে আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন যে একথা শুনে গোস্বামী কি বলেছেন। গোস্বামী "স্খলং স্খলং" বলেছেন শুনে আচার্য বিলাপ করতে লাগলেন।

ষোড়শ বিলাসে এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে গ্রন্থকার সপ্তদশ বিলাসের আচার্যের বিবাহ প্রসঙ্গে বলছেন যে রঘুনন্দন তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধের পর বিবাহের কথা বললে আচার্য গুরুর বিনা আজ্ঞায় বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। তবে "তাঁর আজ্ঞা যেই করিল গ্রহণ" তারপর বিবাহের উদ্যোগ করা হয়।

এখানে এই দুই বর্ণনায় যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে একটি অংশ প্রক্ষিপ্ত। প্রেমবিলাসের বিভিন্ন বর্ণনায় এত পার্থক্য আছে যে এর মধ্য থেকে আসল ও জাল নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। কাজেই এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি আসল এবং কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত তার বিচারে না গিয়ে দুটি অংশের সমান বিচার করে এই বর্ণনা দুটির যাথার্থ্য বিচার করা যেতে পারে। এর মধ্যে সপ্তদশ বিলাসে বর্ণিত বিবাহ প্রসঙ্গের বিচার আমরা ইতিপূর্বে করেছি। এখানে ষোড়শ বিলাসে বর্ণিত ভট্ট গোস্বামী প্রসঙ্গ বিচার করা যেতে পারে।

ষোড়শ বিলাসের এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে প্রথমতঃ ভট্ট গোস্বামী তাঁর শিষ্য সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আশা করেছিলেন

যে আচার্য বৈরাগী থাকবেন। তৃতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে আচার্য গুরুকে না জানিয়ে বিবাহ করেছেন। ফলে তাঁর বিবাহবার্তা শুনে গুরুর এই প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী কালে গুরুর এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ শুনে শিষ্যের বিলাপ। এখন প্রশ্ন এই যে এজাতীয় আচরণ কি শ্রীনিবাসাচার্যের ন্যায় একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব?

গোপালভট্ট শ্রীনিবাসাচার্যকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন এমন কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নি। তাছাড়া তিনি এরূপ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকলে আচার্য বিবাহ করতেন না এবং গৌড়ের বৈষ্ণব মহাজনেরা বিশেষতঃ নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁকে বিবাহের পরামর্শ দিতেন কি না সন্দেহ আছে। এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শ্রীনিবাসাচার্য বিবাহ করলে বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই থাকত না এবং সেখানকার মহান্তদের আদেশে আচার্যকে সমাজচ্যুত করা হতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেরকম কিছু হয়ে থাকলে আচার্য বৈষ্ণবসমাজে এত প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারতেন না। কাজেই প্রেমবিলাসের এই কাহিনী নিছক পরনিন্দাচর্চার একটি উদাহরণ হিসাবে ধরে নিয়ে অনৈতিহাসিক কাহিনী বলে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। মনে হয় অনুরাগবল্লীতে বর্ণিত ঘটনা পরবর্তী কালে বিকৃতিলাভ করে আলোচ্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে থাকবে যা প্রেমবিলাসকার তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অনুরাগবল্লী ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই কিংবদন্তী ইতিহাসসম্মত না হলেও এই কাহিনীর উৎপত্তির কোনও কারণ আছে। মনে হয় শ্রীনিবাসাচার্যের বিবাহকে তাঁর সমসাময়িক যুগে সকলে সহজ মনে গ্রহণ করলেও পরবর্তী কালে এই ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় নি। বিশেষতঃ তাঁর সমসাময়িক নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ এই দুজন বৈষ্ণব প্রচারক অবিবাহিত থাকায় এসম্বন্ধে আরও প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ একারণেই অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে লিখতে হয়েছে যে তিনি নরহরি সরকার আদি তৎকালীন মহান্তদের উপদেশে বিবাহ করেছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের কারণ কি হবে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। অনুরাগবল্লীর বর্ণনায় মনে হয় শ্রীনিবাসাচার্য স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস করার জন্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে মনে হয় নরহরি সরকার, আদি মহাজনদের দেহত্যাগ

সংবাদে তিনি এত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে দেশত্যাগ করে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। যাওয়ার সময় তিনি একমাত্র রামচন্দ্রকেই নিভৃতে কিছু বলে গিয়েছিলেন। এই দুই যুক্তির কোনটিই তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি হঠাৎ বৃন্দাবন গিয়েছিলেন একথা মনে করার কোনও কারণ নেই।

লক্ষ্য করার বিষয় শ্রীনিবাসাচার্য দ্বিতীয়বার যখন বৃন্দাবন গেলেন তখন এ দেশ প্রায় চৈতন্য পরিকরশূন্য হয়েছে। আচার্য বৃন্দাবন থেকে আসার পর এঁদের মধ্যে এদেশে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুর ছাড়া প্রভাবশালী চৈতন্য-পরিকর কেউ ছিলেন না। এঁদের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে স্থান শূন্য হলো তা পূর্ণ করার মত কেউই তখন বর্তমান ছিলেন না। এঁরা বর্তমান থাকতেই চৈতন্য-অনুরাগীদের মধ্যে ভেদাভেদের অন্ত ছিল না। এঁদের অবর্তমানে সেই অবস্থা কোন্ চরমে গিয়ে পৌঁছুবে এবং সেক্ষেত্রে শ্রীনিবাসাচার্যের করণীয় কি, খুব সম্ভব সেসম্বন্ধে পরামর্শের উদ্দেশ্যেই তিনি এঁদের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়ে থাকবেন। সম্ভবতঃ এসম্বন্ধে তিনি একমাত্র রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গেই পরামর্শ করেছিলেন। তিনি যে আচার্যের একান্ত আস্থাভাজন ছিলেন একথা আচার্যের প্রত্যেক জীবনীকারই স্বীকার করেছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে রামচন্দ্র যদি আচার্যের উদ্দেশ্যের কথা জেনেই থাকবেন তবে তাঁর একথাও জানা উচিত ছিল যে আচার্য পরামর্শশেষে ফিরে আসবেন, তবে তিনি তাঁকে আনতে বৃন্দাবন গেলেন কেন? আচার্যকে আনতে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি দুজনেরই কাছে পরামর্শ পেয়েছিলেন বলে দুটি গ্রন্থে বলা হয়েছে। অনুরাগবল্লীতে দেখা যাচ্ছে আচার্যপত্নী ঈশ্বরী দেবীর অনুরোধে রামচন্দ্র বৃন্দাবন গিয়েছিলেন আবার ভক্তিরত্নাকরে বলা হচ্ছে যে তিনি রঘুনন্দনের পরামর্শে আচার্যকে ফিরিয়ে আনতে যান। এই দুই বিবরণের মধ্যে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য মনে হয়। অনুমান করা যেতে পারে আচার্যের আদেশ অনুযায়ী রামচন্দ্র রঘুনন্দনের সঙ্গে তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে কোনও পরামর্শ করেছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ ও মতামত নিয়ে রামচন্দ্র আচার্যের বৃন্দাবনে গমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বৃন্দাবন পৌঁছেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্রের পৌঁছানো সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া আছে তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত তা বোঝা যাবে।

নবম তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র সেখানে পৌঁছুলে তাঁর অপরূপ সুন্দর চেহারায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আচার্য শ্রীজীবগোস্বামীর কাছে ছিলেন। তিনি বর্ণনা শুনেই বললেন রামচন্দ্র এসেছেন। শ্রীজীব তাঁকে তাঁদের কাছে আনতে লোক পাঠালেন। রামচন্দ্রকে সমাচার জিজ্ঞাসা করতে—

রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন।
যে কহিল খণ্ডবাণী শ্রীরঘুনন্দন ॥
আর যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে কহিল।
তাহা কহি তাঁ সবার চেষ্টা জানাইল ॥[১০৪]

এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যেতে পারে রামচন্দ্র রঘুনন্দন এবং আরও কয়েকজন তৎকালীন বৈষ্ণব মহাজনের নিকট থেকে কোনও বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

রামচন্দ্র সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে যে তিনি অল্প দিনের মধ্যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাজনদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরা তাঁকে "কবিরাজ" খ্যাতি দিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন ভ্রমণের প্রসঙ্গে অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শ্যামানন্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়া। অনুরাগবল্লীতে আচার্যের এবারকার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এসময় শ্যামানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনুরাগবল্লীতে শ্যামানন্দ-প্রসঙ্গ এই প্রথম, যদিও ভক্তিরত্নাকরে এবং প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে শ্যামানন্দের সঙ্গে আচার্যদের প্রথম বারেই যোগাযোগ হয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তী অবশ্য এই বিবরণকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি বলে শ্যামানন্দকেও আচার্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে উপস্থিত করিয়েছিলেন। যার ফলে এই গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় যে অনুরাগবল্লীর বর্ণনানুসারে শ্রীনিবাসাচার্যের এবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেও শ্যামানন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্যামানন্দের সঙ্গে আচার্যের যত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে সত্যই এতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না তা বিচারের বিষয়।

---

[১০৪] ভ. র. ৯।১৯১-২

আচার্যের জীবনী বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায় যে নরোত্তমের সঙ্গে আচার্যের যে ঘনিষ্ঠতা এবং যোগাযোগ ছিল শ্যামানন্দের সঙ্গে তা ছি না। কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় বৃন্দাবনে গিয়ে প্রথম তাঁরা উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। নরোত্তম যে বয়সে তাঁর থেকে ছোট ছিলে তাও এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়। গোড়া থেকেই তিনি আচার্যে এতটা স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে আচার্য তাঁকে তাঁর একটি চক্ষের সমা বলে গণ্য করতেন। এরপর তাঁরা শুধু একসঙ্গে দেশে প্রত্যাবর্তনই করেন নি, তাঁদের মধ্যে যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ পরবর্তী অনেক বর্ণন থেকেই পাওয়া যায়। খেতরির উৎসবে শ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরে নাম যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তার মূলেও এঁদের বৃন্দাবনের সৌহার্দ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালেও এঁদের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম সেতু ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। এঁদের সৌহার্দ্যের বর্ণনা শুধুমাত্র ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, নরোত্তম ঠাকুরের কয়েকটি পদেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের ঘনিষ্ঠতার যে বিবরণ পাওয়া যায়, অনুরূপ ঘনিষ্ঠতা আচার্যের সঙ্গে শ্যামানন্দের ছিল কি না সন্দেহ। খেতরির উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে বলা হয়েছে। বাংলা দেশের বৈষ্ণব মহাজনদের প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কাজেই সেখানে শ্যামানন্দের উপস্থিতি কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। এছাড়া আচার্যের সঙ্গে শ্যামানন্দের যোগাযোগের অপর বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে দেখা যাচ্ছে আচার্যের সঙ্গে তাঁর দুবার বৃন্দাবন থেকে যাতায়াত। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্যামানন্দের ফিরে আসার বর্ণনা যে যুক্তিসম্মত নয় তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। এবার সমস্যা থাকে তাঁর দ্বিতীয়বার প্রত্যাগমন। এবিষয়ে অনুরাগবল্লীর বর্ণনাকে আমরা নানা কারণে ইতিহাসসম্মত বলে স্বীকার করেছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে আচার্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার যেমন পরবর্তী কালের ঘটনা তেমনি পরবর্তী কালে তাঁদের বোধ হয় একবার খেতরিতেই সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে। এছাড়া আরও কোনও যোগাযোগ এঁদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না।

শ্রীনিবাসাচার্য ও শ্যামানন্দের মধ্যে [illegible] পরবর্তী কালেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা যোগাযোগ ছিল না, তা আরও অনুমান করা যায় অন্যান্য কারণ থেকে।

নরোত্তম ঠাকুর ও আচার্যের মধ্যে যোগাযোগের সেতু যেমন ছিলেন রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ ও আচার্যের মধ্যে সেরকম যোগাযোগ-রক্ষাকারী কারও নাম পাওয়া যায় না। পদাবলী-সাহিত্যে আচার্য ও ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেরকম কোনও বর্ণনা শ্যামানন্দ সম্বন্ধে নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো নরোত্তমবিলাসে এঁদের ঘনিষ্ঠতার যে বিবরণ পাওয়া যায় শ্যামানন্দের জীবনীর অন্যতম উপাদান রসিকমঙ্গলে তার কোনও চিহ্ন নেই। শ্যামানন্দের অন্যতম শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখেছেন শ্যামানন্দেরই অপর এক শিষ্য। কিন্তু এ বইয়ে শ্রীনিবাসের নামই নেই। এই অনুল্লেখ থেকে মনে হয় শ্যামানন্দ আচার্যের সঙ্গে দেশে ফিরে এলেও এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে কোনও যোগাযোগ সাধিত হয় নি।

রামচন্দ্র ও শ্যামানন্দকে নিয়ে দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের অপর একটি অধ্যায় শেষ হলো। তাঁর জীবনের এই অংশকে অর্থাৎ প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়টুকুকে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়—যেখানে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারই প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। কারণ এই সময়ে তাঁর যে সব যোগাযোগ হয়েছিল এবং এসময়ের মধ্যে যে সব ঘটনাবলী ঘটেছিল সে সবের পরিণতি হলো তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী যেগুলি তাঁকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তাঁর জীবনীর সেই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করছি।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর শেষ পর্ব

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীর যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনার পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়। গদাধর দাস, নরহরি সরকার ঠাকুর আদি চৈতন্য-পরিকরদের তিরোধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে অভাব বোধ করছিলেন—তার খানিকটা তাঁর কার্যকলাপের ফলে পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিবাসাচার্যের মাধ্যমে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটি হলো গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি। এই সব গ্রন্থের বক্তব্যের মধ্যে তাঁরা যেন তাঁদের আদর্শের এবং লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। ফলে একই পথের যাত্রী হিসাবে তাঁদের মধ্যে ভেদাভেদজ্ঞান কমে এসেছিল এবং ক্রমশঃ তাঁরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ওপর নির্ভরশীল

হয়ে উঠেছিলেন। তখন বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে যোগ্য নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। গৌড়ের বৈষ্ণবরাও স্বভাবতঃই তাঁর ওপর নির্ভরশীল হলেন। শ্রীজীবের যোগ্যতম প্রতিনিধি ছিলেন এদেশে শ্রীনিবাসাচার্য। কাজেই চৈতন্য-পরিকরদের অভাবে তাঁকেই পুরোধা হিসাবে সকলে স্বীকার করে নিলেন। পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় তৎকালীন বৈষ্ণবদের মধ্যে এদেশে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। কাজেই শ্রীজীব গোস্বামী যে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার দিয়েছিলেন এবং এখানকার বৈষ্ণবরাও যে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের যে অধ্যায়ের সূচনা হলো তাকে তাঁর জীবনের গৌরবে উজ্জ্বল অধ্যায় বলা চলে। আলোচনাকালে দেখা যাবে এসময়ে তাঁর নেতৃত্বে পর পর কয়েকটি বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলির আরম্ভ হলো গদাধর দাসের তিরোধান-উৎসব দিয়ে এবং শেষ যেটির উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হলো খেতরির মহোৎসব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তাঁরা নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের জীবিতকালেই তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল কিন্তু নিত্যানন্দের তিরোধানের পর সেই গোষ্ঠীতে ভাঙ্গন ধরে নি একমাত্র জাহ্নবা দেবীর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য। খেতরির মহোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত এঁকে কোনও সম্মেলনে উপস্থিত হতে দেখা যায় না। আলোচনার সময় দেখা যাবে তিনিও খেতরিতে উপস্থিত হয়ে শ্রীনিবাসাচার্যের নেতৃত্বকে স্বীকার করেছিলেন। এটিকে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের বোধহয় সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বলে দাবী করা যেতে পারে।

দুঃখের বিষয় শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এবিষয়েও একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো ভক্তিরত্নাকর। তার চেয়ে প্রাচীন এমন কোনও রচনা এখনও পাওয়া যায় নি যার ওপর নির্ভর করে ভক্তিরত্নাকরের বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করা যেতে পারে। প্রেমবিলাসের এসম্বন্ধে সামান্য বর্ণনা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে তার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই আচার্যের জীবনের এই পর্যায়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে একমাত্র ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের ওপর

"নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে বলা হয়েছে শ্রীনিবাসাচার্য বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে বিষ্ণুপুরে দু'মাস থেকে যাজিগ্রাম ফিরে এলেন। দেশে ফিরে এসেই তিনি প্রথমে গেলেন শ্রীখণ্ডে। পূর্ব বৎসর নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধানের পর এই প্রথম তাঁর শ্রীখণ্ডে আগমন। রঘুনন্দন তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সরকার ঠাকুরের তিরোধানের পর তাঁদের এই প্রথম মিলন। দুজনে শোক সংবরণ করে ব্রজবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এসময়ে রঘুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্যকে "স্থির করি অনেক কহিল মৃদুভাবে"। তারপর তাঁকে যাজিগ্রাম হয়ে কাটোয়ায় যেতে পরামর্শ দিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্য যাজিগ্রাম হয়ে কাটোয়ায় গেলেন। সেখানে গদাধর দাসের তিরোধানের পর তাঁর শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী সেই আশ্রমের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। তিনি আচার্যকে গদাধরের আসন দেখালেন। তারপর যদুনন্দন বললেন যে কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমীর দিন গদাধরদাসের তিরোভাব তিথিতে মহোৎসব করার জন্য তিনি আয়োজন করেছেন এবং গৌড়ের সকল বৈষ্ণব মহান্তকে সেই তিথিতে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁদের থাকবার আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়েছে। যদুনন্দন আচার্যকে সেখানে দশদিন থেকে মহোৎসব সমাধার ভার নিতে অনুরোধ জানালেন। কাটোয়া থেকে শ্রীনিবাসাচার্য যাজিগ্রাম ফিরে গেলেন।

কাটোয়া ঘুরে আসার পর শ্রীনিবাসাচার্য আবার শ্রীখণ্ডে গিয়েছিলেন। রঘুনন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি কাটোয়ার মহোৎসবের আয়োজনের কথা "নির্জনে" বললেন। রঘুনন্দন সব শুনে বললেন যে কার্তিক মাসে গদাধরদাসের তিরোধানের সংবাদ পেয়ে সরকার ঠাকুর দিনে দিনে ক্ষীণ হতে লাগলেন। তারপর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী দিনে তিনিও অদর্শন হলেন। সেই তিথিতে তাঁর তিরোভাবে মহোৎসব করার জন্য তিনি আয়োজন করে রেখেছেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত গোষ্ঠীর সকলকে সেই মহোৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এঁদের দুজনেরই পুত্র সেসময় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এরপর ঠিক হলো রঘুনন্দন যাজিগ্রাম যাবেন। সেখান থেকে আচার্যের সঙ্গে একত্রে কাটোয়ার উৎসবে উপস্থিত হবেন। কাটোয়ার উৎসব সম্পন্ন হলে সকলে মিলে যাজিগ্রামে আসবেন। সেখানে কিছুদিন থেকে তাঁরা একত্রে কাটোয়ায় এসে এখানকার মহোৎসব সম্পন্ন করবেন। এই

ব্যবস্থার পর আচার্য অবিলম্বে যাজিগ্রাম ফিরে এলেন এবং রামচন্দ্র কবিরাজ আদি তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে পরামর্শ করে সকলের থাকার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন ।

ভক্তিরত্নাকরে এপর্যন্ত যা দেখা গেল তার সমর্থন পূর্বে কিংবা পরে রচিত কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। কিংবা এমন কোন তথ্যও পাওয়া যায় নি যা এই বর্ণনাকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছে । কাজেই এই বর্ণনাকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে । (তবে বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে দেশে ফেরার বর্ণনাকে অবশ্য স্বীকার করা যায় না ।) ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের এই অংশে আচার্যের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার বিষয় । দেখা যাচ্ছে তিনি রঘুনন্দনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিভৃতে আলাপ করলেন । পরে তাঁর পরামর্শে কাটোয়ায় গেলেন । সেখানে মহোৎসবের আয়োজন স্বচক্ষে দেখে এলেন । তারপর আবার রঘুনন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । এবার এসে দেখেন এখানেও মহোৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ । এবার পরামর্শ হলো কাটোয়ায় সকলে একত্রিত হওয়া এবং যাজিগ্রাম হয়ে সকলের একসঙ্গে শ্রীখণ্ডে এসে মহোৎসব সম্পন্ন করা ।

এই বর্ণনা থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে রঘুনন্দনের পরামর্শে যদুনন্দন চক্রবর্তী এই মহোৎসবের আয়োজন করে রেখেছিলেন । শ্রীনিবাসাচার্যকে পৌরোহিত্য করতে দেওয়ার পরামর্শও তাঁদের ইতিপূর্বে হয়ে থাকবে । আচার্য বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে রঘুনন্দনের সঙ্গে বৃন্দাবনের মহান্তদের বিশেষতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর পরামর্শ নিয়ে আচার্য আলোচনা করে থাকবেন । ভবিষ্যতে গদাধর দাসের মহোৎসবকে কেন্দ্র করে চৈতন্য মতাবলম্বীদের একত্র করা যায় কি না সে বিষয়েও তাঁরা পরামর্শ করে থাকবেন । এরই কাছাকাছি সময়ে নরহরি সরকার ঠাকুরেরও তিরোভাব দিবস । সেই দিবসেও এভাবে সকলকে একত্র করা যায় কি না সে পরামর্শও হয়ে থাকবে । এরপর শ্রীনিবাসাচার্য কাটোয়ায় গিয়েছিলেন আয়োজন স্বচক্ষে দেখবার জন্য । ইতিমধ্যে রঘুনন্দন ও সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে আশানুরূপ সাড়া পেয়ে থাকবেন । সেই খবর আচার্য পেলেন আবার শ্রীখণ্ডে ফিরে এসে । মোট কথা ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে এই দুই উৎসব উপলক্ষ্যে গতানুগতিকতার ভাব আছে, বিচার করে দেখলে মনে হয় আসলে তার চিহ্ন নেই । এর মধ্যে যথেষ্ট হিসাব,

সাবধানতা ও পরামর্শের ব্যাপার আছে। কারণ এতদিন যাঁদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ বা ঐক্য ছিল না সেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যের সুযোগ করতে গেলে সাবধানতার এবং যথেষ্ট পরামর্শের প্রয়োজন আছে—একথা অবশ্য স্বীকার্য। এবার দেখা যেতে পারে এই অনুষ্ঠান দুটি কতখানি সাফল্য লাভ করেছিল।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে গদাধর দাসের তিরোভাব মহোৎসব সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার প্রথমাংশে যোগদানকারী বৈষ্ণবদের একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। নানা কারণে এই তালিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ এই নামগুলি বিচার করে দেখলে দেখা যায় তৎকালীন কোন কোন গোষ্ঠী এবং সেসব গোষ্ঠীর কোন কোন মহাজন বর্তমান ছিলেন। তাছাড়া এই উৎসবে কোন কোন গোষ্ঠীভুক্ত বৈষ্ণবরা যোগদান করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নয় এবং নরহরিও এই তালিকায় সকল গোষ্ঠীর সকলের নাম উল্লেখ করেন নি। যেমন নরহরি শাখার কারু নামই এর মধ্যে নেই। হতে পারে রঘুনন্দন এই উৎসবের একজন উদ্যোক্তা বলে তাঁকে এবং তাঁর গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গণ্য করেন নি। এখন এই তালিকাভুক্ত বৈষ্ণবদের নাম নিয়ে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে কোন্ কোন্ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন যে ভক্তিরত্নাকরে কাটোয়ার উৎসবে যোগদানকারী ৬৪ জন মহান্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নামের একটি তালিকাও দিয়েছেন[১৬৫]। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে[১৬৬] রঘুনন্দন, শ্রীনিবাসাচার্য ও বীরভদ্র ছাড়া আরও ৭০ জনের নাম নরহরি চক্রবর্তী বিবৃত করেছেন।

নরহরি উদ্ধৃত এই তালিকা বিচারে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের কোনও পরিচয় দেওয়া নেই। এঁদের অনেকে বৈষ্ণব জগতে আজও সুপরিচিত। তাঁদের সনাক্ত করতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু অন্যান্যরা সে যুগে নিশ্চয়ই বিখ্যাত ছিলেন। কাজেই নরহরি তাঁদের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি, কিন্তু আজ

[১৬৫] চ. চ. উ. পৃ. ৫৮২। [১৬৬] ভ. র. ৯।৩৯৩-৪১০

তাঁদের পরিচয় প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁদের সনাক্তকরণে খানিকটা অসুবিধা হয়।

এছাড়া অপর বিরাট সমস্যা হলো একই নামের নানাস্থানে উল্লেখ। তাঁদের পরিচয় না জানায় নরহরি কোন্ ব্যক্তির কথা বলতে চাইছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়। যেমন এই তালিকায় ১৭শ, ২৩শ এবং ৪৮শ নাম হলো চৈতন্যদাস। হরিদাস দাস বাবাজীর "গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন" গ্রন্থে নয়জন চৈতন্যদাসের পরিচয় দেওয়া আছে। এখানে নরহরি কোন্ কোন্ চৈতন্যদাসের কথা বলেছেন পরিচয় না দেওয়ায় তা বুঝতে অসুবিধা হয়। সেরকম এই তালিকায় তিনজন গোপালদাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আছেন দুজন মাধব।

এই অসুবিধাগুলি ছাড়া অপর যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটি হলো এমন কয়েকটি নাম আছে যার কোনও পরিচয় কোনও গ্রন্থে দেওয়া নেই। যেমন বসন্ত লবনি। বৈষ্ণব জগতে বসন্ত বলে একজনের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু বসন্ত লবনি বলে কারু পরিচয় এযাবৎ জানা যায় নি। লবনিকে যদি পৃথক নাম হিসেবে ধরা হয় তবে সে নামেরও কোন ব্যক্তির পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি।

এসব সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পথই এই তালিকা থেকে পাওয়া যায়। যে সব পরিচিত নাম এই তালিকায় আছে সেগুলি বিচার করে অনুমান করা যাচ্ছে তিনি উপস্থিত বৈষ্ণবদের নামগুলিকে যথাক্রমে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধর পণ্ডিতের গণনা অনুযায়ী সাজিয়েছেন। নামগুলো থেকে অনুমান করা যাচ্ছে প্রথম কুড়িজন হলেন চৈতন্যদেবের তৎকালীন জীবিত পরিকরবৃন্দ। ২১ থেকে ৪৯তম নাম নিত্যানন্দের, ৫০ থেকে ৬২তম নাম অদ্বৈতের এবং ৬৩ থেকে ৬৮তম ব্যক্তি গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। এক্ষেত্রে যেসব নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের এইসব শাখাভুক্ত বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

নরহরির এই তালিকায় প্রথম যে কুড়িজনের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের দুই ভাই শ্রীপতি ও শ্রীনিধির নাম সর্বাগ্রে করা হয়েছে। এরপর উল্লেখযোগ্য হলেন চৈতন্যদেবের মেসোমহাশয় চন্দ্রশেখর। এছাড়া যেসব পরিচিত নাম পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা হলেন কুলীনগ্রামবাসী বিদ্যানন্দ ও বাণীনাথ বসু, শিবানন্দ সেনের দুই পুত্র রামদাস ও কবিকর্ণপুর এবং

চৈতন্যদেবের দুই ছাত্র ও তাঁর কীর্তনের সঙ্গী পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়। প্রথম কুড়িটি নামের অন্যান্য নামগুলি হলো কবিচন্দ্র, কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর, কমলাকান্ত, বিপ্র বাণীনাথ, জানকীনাথ ও পুরন্দর। শেষোক্ত জনকে চৈতন্যদেব পিতা বলে সম্বোধন করতেন বলে জানা যায়। এঁদের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের শাখাবর্ণনায় পাওয়া যায়।

প্রথম কুড়িটি নামের মধ্যে যে কয়টি নাম নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় সেই নামগুলি হলো যথাক্রমে মাধবাচার্য, নন্দন পণ্ডিত, চৈতন্যদাস, গোপাল আচার্য ও বিষ্ণুদাস। চৈতন্য-শাখায় মাধবাচার্যের নাম থাকায় মনে হয় ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুতো ভাই হবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে একজন নন্দন আচার্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি গ্রহবিপ্র ছিলেন। নন্দনপণ্ডিত বলতে নরহরি এঁর কথাই বলেছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবার সমস্যা থাকে চৈতন্যদাস ও গোপাল নাম দুটি নিয়ে। শিবানন্দের এক পুত্রের নাম ছিল চৈতন্যদাস। তাঁর দুই পুত্রের নাম যখন এই তালিকায় পাওয়া গেল মনে হয় ইনি বোধ হয় শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসই হবেন। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে শিবানন্দের তিন পুত্রই এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

নরহরি তালিকায় দুজন গোপালের নাম একসঙ্গে করা হয়েছে। প্রথমজন গোপাল আচার্য এবং অপরজন হলেন গোপালদাস। চৈতন্যচরিতামৃতে একজন গোপাল আচার্যের নাম চৈতন্যশাখায় পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান করা যায় নরহরি এঁর কথাই বলেছেন।

বিষ্ণুদাস নামটি নিয়েও সমস্যা আছে। এই নামে একজন অদ্বৈতের শিষ্য ছিলেন। অপর এক বিষ্ণুদাস ছিলেন চৈতন্যশাখাভুক্ত। ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকতেন। চৈতন্যশাখায় এঁর নাম থাকায় মনে হয় নরহরি এঁর কথাই বলছেন। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে তিনি চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর দেশে ফিরে এসেছিলেন।

নরহরির তালিকায় পরবর্তী ২১ জনের যে নাম পাওয়া যায় তাঁরা নিত্যানন্দ শাখার বলে অনুমান করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই অবশ্য যে নাম আছে সেটি হলো গোপালদাস। ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনে’ মোট ১৩ জন গোপাল দাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কাটোয়ার উৎসবের সমসাময়িক দুজন গোপাল দাসের একজন ছিলেন চৈতন্যশাখাভুক্ত এবং একজন হলেন অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য। চৈতন্যশাখাভুক্ত গোপাল দাস বৃন্দাবনবাসী

ছিলেন। তাঁর পক্ষে কাটোয়ায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অনুমান করা যায় নরহরির উল্লিখিত গোপালদাস নিত্যানন্দশাখাভুক্ত এবং অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য গোপালদাস।

নরহরির তালিকার ২২তম নাম হলো মুরারি চৈতন্যদাস। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। পরবর্তী নাম রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ও নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। এরপর যাঁর উল্লেখ আছে সেই নারায়ণরা চার ভাই নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মনোহর ও দেবানন্দের উল্লেখ এই তালিকায় নেই কিন্তু অপর ভাই কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

নিত্যানন্দ-শাখার অপর পরিচিত নামগুলি হলো সনাতনদাস, নকড়ি, মনোহরদাস, হরিহরানন্দ, মহীধর, গোকুলদাস, রামসেন, নর্তক গোপাল, জ্ঞানদাস, পীতাম্বর, কুমুদ, গৌরাঙ্গদাস এবং নৃসিংহ। এঁদের নাম বা পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই। নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত যে নামগুলি নিয়ে খানিকটা সমস্যা আছে সেগুলো বলরামদাস, দুজন মাধব, রামচন্দ্র কবিরাজ, বসন্ত লবনি, কানু ঠাকুর, এবং দামোদর। এদের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে এঁরা সকলেই প্রকৃত নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত কি না।

নিত্যানন্দশাখাভুক্ত দুজন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে একজন হলেন নিত্যানন্দের পার্ষদ, অপরজন জাহ্নবাদেবীর শিষ্য, তিনি নিত্যানন্দ দাস নামেও পরিচিত এবং সম্ভবতঃ প্রেমবিলাস গ্রন্থের রচয়িতা। এখানে নরহরি কোন্ বলরামদাসের কথা উল্লেখ করেছেন সঠিক ভাবে বলা কঠিন। তবে মনে হয় ইনি নিত্যানন্দপার্ষদ বলরাম দাস-ই হবেন। কারণ শুধুমাত্র তাঁর নামই তাঁর পরিচয়। জাহ্নবাশিষ্য বলরাম দাসের কথা বললে হয়তো নরহরি তাঁর অপর নামটিরও উল্লেখ করতেন।

নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে দুজন মাধবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৩১তম নাম শ্রীমাধবাচার্য যে নিত্যানন্দের জামাতা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সমস্যা থাকে ৩২তম নাম মাধব নিয়ে। চৈতন্য-চরিতামৃতে নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য ও শ্রীধরের সঙ্গে নিত্যানন্দশাখায় একজন মাধবের উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা যায় নরহরি ৩২তম নামদ্বারা এই মাধবের কথাই বলতে চেয়েছেন।

নিত্যানন্দ-শাখায় রামচন্দ্র কবিরাজের উল্লেখ কেন করা হলো বলা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখায় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের

উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা দুভাই যে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লিখিত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ বলে অপর কেউ ছিলেন কি না আজও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নি। নরহরি চক্রবর্তী শ্রীনিবাসাচার্য-শিষ্য এই দুইভাই সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাসে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। কাজেই তিনি এঁদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নিত্যানন্দ-শাখায় এই নাম করাতে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত অপর কোনও রামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন কি না। গদাধর দাস চৈতন্য-পরিকর হলেও তাঁর নাম যেমন চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুই শাখায় ধরা হয় মনে হয় বাল্যকালে নিত্যানন্দের আশীর্বাদ লাভ করে থাকবেন বলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজকে নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত করা হয়েছে যদিও তাঁরা শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য হিসেবে অধিক পরিচিত। রামচন্দ্র কাটোয়ার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে। কিন্তু তাঁকে নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত বলে গণ্য করা হতো বলে নরহরি তাঁর নাম এই শাখায় গণ্য করে থাকবেন।

বসন্ত নামে নিত্যানন্দ শাখায় একজনের নাম পাওয়া যায় কিন্তু বসন্ত লবনি বলে কেউ ছিলেন না। শুধু লবনি নামের কোন উল্লেখ কোথাও নেই। এখানে বোধ হয় নবনী হোড়ের কথা নরহরি উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে মূল পুথিতে “বসন্ত নবনি” বলে গ্রন্থকার এই দুই নিত্যানন্দ-শিষ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে লিপিকর প্রমাদে ‘নবনি’ ‘লবনি’তে পরিণত হয়ে থাকবে।

নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের এক পুত্র কানাই ঠাকুর নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কানু ঠাকুর বললে স্বভাবতঃই তাঁর কথা মনে হয়। কিন্তু নিত্যানন্দশাখায় যখন এই নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন মনে হয় নরহরি জাহ্নবা দেবীর পালিত পুত্র কানাই এর কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনিও কানু ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন।

‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী’তে তিনজন দামোদরের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষের ভাই এবং শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষক দামোদর পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এই নাম উল্লেখ থাকায় মনে হয় ইনি নিত্যানন্দ-শিষ্য দামোদর হবেন।

নরহরি তালিকায় পরবর্তী যে নামগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে বনমালী

দাস, ভোলানাথ, হৃদয়ানন্দ সেন, লোকনাথ পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, কানু পণ্ডিত, অনন্তদাস, জনার্দন, নারায়ণদাস ও ভাগবতাচার্য যে অদ্বৈতশাখাভুক্ত ছিলেন সেবিষয়ে কোনও সংশয় নেই। এই নামগুলির মধ্যে যখন একজন বিজয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে তখন সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে ইনি অদ্বৈতশাখাভুক্ত দুজন বিজয়ের একজন। গদাধর পণ্ডিত এবং অদ্বৈতশাখায় দুজন হরিদাস ব্রহ্মচারীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অদ্বৈতশাখায় যখন এই নাম পাওয়া যাচ্ছে তখন ধরে নেওয়া যায় নরহরি উল্লিখিত হরিদাস ব্রহ্মচারী অদ্বৈতশাখাভুক্ত হবেন। অনুরূপভাবে সমসাময়িক দুজন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন ছিলেন নিত্যানন্দের পার্ষদ এবং অপরজন অদ্বৈতশাখাভুক্ত। অদ্বৈতশাখাভুক্ত বৈষ্ণবদের নামের সঙ্গে যখন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় ইনি অদ্বৈতশাখাভুক্ত কৃষ্ণদাস মিশ্র।

কাটোয়ার উৎসবে উপস্থিত অন্যান্য যে সব বৈষ্ণবের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, চৈতন্যবল্লভদাস, পুষ্পগোপাল, শ্রীহর্ষ ও লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। সমস্যা থাকে একজন গোপালদাস সম্বন্ধে। ইতিপূর্বে আমরা আরও দুজন গোপালদাসের নাম পেয়েছি। দুটি শাখার বৈষ্ণবদের নামের সঙ্গে এই দুটি নাম যুক্ত থাকায় আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে তাঁরা সেই সেই সম্প্রদায় ভুক্ত গোপালদাস। এখানেও গদাধর পণ্ডিতের শাখায় এই নাম পাওয়ায় অনুমান করে নিতে পারা যায় যে ইনি এই শাখাভুক্ত হবেন।

এই তালিকায় সর্বশেষ দুটি নাম হলো কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল। এঁরা অদ্বৈতপুত্র বলে পরিষ্কারভাবে তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের নাম। ভক্তিরত্নাকরে তাঁর উল্লেখ এই প্রথম। এখানে তাঁর রূপ ও গুণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কাটোয়ায় উৎসব প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী উপস্থিত বৈষ্ণবদের নামের তালিকার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন উৎসবের বিবরণে ততটা গুরুত্ব দেন নি। বীরভদ্রের রূপ বর্ণনার পর উৎসবের প্রসঙ্গে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্যসহ রঘুনন্দন সদলে সকলের পূর্বে কাটোয়ায় পৌঁছেছিলেন। অন্যান্য মহান্তরা আসেন তাঁদের আগমনের পর। যদুনন্দনের কাছে তাঁদের কাটোয়ায় আগমনবার্তা পেয়ে রঘুনন্দন আদি সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁদের

অভ্যর্থনা জানান এবং সকলে একত্রে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে সব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সকলের একত্র মিলন এই প্রথম। সেই মিলনের স্থল হলো এমন একটি স্থান যেখানে চৈতন্যদেব প্রথম সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। কাজেই নিজের বিরোধ ও পার্থক্য ভুলে গিয়ে এই মিলনের যে দৃশ্য হয়েছিল তাকে নরহরির ভাষায়

পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল।
প্রেমভক্তিরসের সমুদ্র উথলিল[১৬৭] ॥

—বলা ছাড়া আর কোনও ভাষায় বোধহয় বর্ণনা করা যায় না।

গদাধর দাসের তিরোধান মহোৎসবের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সংকীর্তন ও নৃত্য ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। নরহরি অদ্বৈত-পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের অপূর্ব নৃত্যের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন ধরে এই মহোৎসব হয় এবং নরহরির মতে অগণিত বৈষ্ণব এতে অংশ গ্রহণ করেন। এই উৎসবে শ্রীনিবাসাচার্যের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নরহরির ভাষায়—

গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য ভক্তিময়।
সর্বত্র নিযুক্ত সব কার্য সমাধয়[১৬৮] ॥

উৎসবশেষে সকল মহান্ত শ্রীখণ্ডের পথে যাজিগ্রাম অভিমুখে রওনা হলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রথম মিলনের উপলক্ষ্য হিসেবে কাটোয়ার এই মহোৎসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎসবের বর্ণনার পর নরহরি চক্রবর্তী গদাধর দাস প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন সেই বক্তব্য বিচার করে দেখলে এই মহোৎসবের গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

নরহরি চক্রবর্তী প্রথমে চৈতন্যগণের মধ্যে গদাধরদাসের স্থান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সেকথা গদাধর দাসের প্রশস্তিতে বর্ণনা করেছেন। কবিকর্ণপূরের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন যে গদাধর দাস ও গদাধর পণ্ডিতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

প্রসঙ্গ পাইয়া তথা সংক্ষেপে জানাই।
চৈতন্যাবতারে রাধা পণ্ডিত গোসাঞি ॥

---

[১৬৭] ভ. র. ৯।৪৩৭। [১৬৮]. ঐ ৯।৪৪৮

রাধিকা বিভূতি রূপ দাস গদাধর।
জানাইলো কবিকর্ণপূর বিজ্ঞবর[১৬৯]।

গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে গদাধর দাসের যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। পণ্ডিত গোস্বামী নীলাচলে শেষ জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই তিনি শ্রীনিবাসকে পত্র দিয়ে গদাধর দাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিতের স্থান যে কত উচ্চে সেকথা চৈতন্য-জীবনীগুলিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, কিন্তু গদাধর দাস সম্বন্ধে সেকথা এত স্পষ্টভাবে বলা না হলেও কবিকর্ণপূরের যে উক্তি নরহরি চক্রবর্তী দিয়েছেন এবং আলোচ্য ছত্রগুলিতে তার যে পুনরাবৃত্তি করেছেন তা থেকে অনুমান করা কঠিন নয়।

গদাধর দাসকে শুধুমাত্র চৈতন্য-পরিকর হিসাবেই উল্লেখ করা হয় নি, তাঁকে নিত্যানন্দশাখাভুক্ত বলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে যখন গৌড়ে এসে প্রচারকার্য চালাতে বলেন তখন তাঁর সহচর হিসাবে নিজের দুই ভক্ত রামদাস ও গদাধর দাসকে পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেজন্যই তাঁকে নিত্যানন্দেরও শাখাভুক্ত বলে গণনা করে থাকবেন। গদাধর দাস কোন্ শাখাভুক্ত ছিলেন সেটা বড় প্রশ্ন নয়। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে একথা বোঝা যায় যে গদাধর দাসের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়তো শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সেক্ষেত্রে একথা স্বীকার করা যায় যে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরও তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে গদাধর দাসের হৃদ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এসব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সকল গোষ্ঠীর মিলনের ক্ষেত্র হিসাবে গদাধর দাসের তিরোভাব মহোৎসবই সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। কবিকর্ণপূরের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন যার জন্য তাঁকে রাধিকা-বিভূতিরূপে গণ্য করা হয়েছে। সেজন্য যদুনন্দনের আমন্ত্রণে যে সব চৈতন্য-পরিকর তখনও জীবিত ছিলেন তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারেন নি। গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর সখ্য কারু অবিদিত নয়। সেজন্য সেই গোষ্ঠীর সকলেও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ

---

১৬৯. ভ. র. ৯।৪৬৯-৭০

করেছিলেন। নিত্যানন্দের শিষ্যবৃন্দ তাঁকে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত বলে নিশ্চয় গণ্য করতেন। সেজন্য স্বয়ং বীরভদ্র ও নিত্যানন্দের প্রায় সকল শিষ্যই এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। অদ্বৈতগোষ্ঠীর এই উৎসবে যোগদানের প্রত্যক্ষ কারণ কিছু জানা যায় না। মনে হয় এই গোষ্ঠী নির্বিরোধী ছিলেন এবং গদাধর দাসের সঙ্গে হয়তো তাঁদের হৃদ্যতাও ছিল—সেজন্য তাঁরাও এই মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

কাটোয়ার এই উৎসব সম্বন্ধে নরহরি যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলনটাই এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে এখানে এঁদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র নির্ণয়ের কোনও চেষ্টা করা হয় নি। একত্রে সংকীর্তন করা এবং নৃত্য করাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল বলে মনে হয়।

নরহরির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কাটোয়ার এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে এঁদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই সাফল্যের জন্য এই মহোৎসবকে বৈষ্ণব ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। রঘুনন্দন, যদুনন্দন আদি গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এঁদের মিলনের জন্য যে চেষ্টা করছিলেন এই উৎসবের সাফল্য তাঁদের সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্যের পথে এনে দিয়েছিল।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাকে সত্য বলে স্বীকার করলে বুঝতে হবে কাটোয়ার উৎসবের সাফল্যের মূলে যেমন রঘুনন্দন ও যদুনন্দনের আয়োজন ছিল, তেমনি ছিল শ্রীনিবাসাচার্যের কর্মক্ষমতা। তাঁর নেতৃত্বে উৎসবের এই তিনদিনের সকল কাজ সমাধা হয়েছিল বলে নরহরি উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া, উৎসব আয়োজনের মধ্যে তাঁদের একত্র করে রাখা এবং নিজেদের মধ্যের ভেদাভেদ ভুলিয়ে একত্রে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া একটি বিরাট কাজ। শ্রীনিবাসাচার্য সে কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন বলে ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে।

গদাধর দাসের তিরোভাব তিথি হলো কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী। এই দুই তিথির মধ্যে প্রায় ৩২/৩৩ দিনের সময়ের ব্যবধান। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যায় কাটোয়ার উৎসবের শেষে গৌড়ীয় মহান্তরা আর স্বস্থানে

ফিরে যান নি। তাঁরা একত্রে এসেছিলেন শ্রীখণ্ডের পথে যাজিগ্রাম। সেখানে তাঁরা শ্রীনিবাসাচার্যের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং চার পাঁচ দিন অবস্থান করেন। এ কয়দিন আচার্যের ভবনে সকলে একত্রে সংকীর্তন করে দিন কাটিয়েছিলেন। আশপাশের গ্রামের বৈষ্ণবরাও তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন। কাটোয়ার মতন এখানেও শ্রীনিবাসাচার্য তাঁদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখে তাঁদের সকলের প্রশংসা অর্জন করলেন। রঘুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের পরামর্শ অনুযায়ী তারপর সকলে একত্রে শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বেশ কিছুদিন পূর্বে তাঁরা পৌঁছেছিলেন এবং সমস্ত দিন তাঁদের সংকীর্তন ইত্যাদির জন্য মনে হতো শ্রীখণ্ডে উৎসব যেন আগেই লেগে গিয়েছিল। সকলেই মহোৎসবের উৎসবের জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন বলে ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে ভক্তিরত্নাকরে। এই বিবরণে দেখা যায় মহোৎসবের দিন সকলে সরকার ঠাকুরের আরাধ্য গৌরাঙ্গমূর্তি এবং রঘুনন্দনের আরাধ্য গোপালমূর্তি দর্শনের জন্য গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। বিগ্রহাদি দর্শনের পর গদাধর পণ্ডিতের ভাই বাণীনাথ আচার্য উপস্থিত মহান্তদের ইচ্ছানুসারে রঘুনন্দনের কাছে প্রস্তাব করলেন—

শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাত্রিযোগে সংকীর্তনানন্দ আস্বাদন॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস[১৭০]।

রঘুনন্দন এই প্রস্তাব শুনে আনন্দিতমনে তৎক্ষণাৎ ভাগবত পাঠের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র, শ্রীনিবাসের ভাই শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি গণ্যমান্য মহান্তরা আসন গ্রহণ করলেন। রঘুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্যকে সেখানে এনে উপস্থিত করলে—

সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে[১৭১]॥

সকলের অনুমতিক্রমে আচার্য পুষ্প তুলসী চন্দন দিয়ে পুথিকে অর্চনা

---

[১৭০] ভ. র. ৯।৫২৮-২৯। [১৭১] ঐ ৯।৫৩৪-৩৫

করে সুমধুর স্বরে রাস বিলাস পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সমবেত মহান্তগণ বিস্মিত এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে এমন তন্ময় হয়ে গেলেন যে দিন কিভাবে শেষ হলো কেউ অনুভব করতে পারলেন না। দিন শেষ হয়ে গেল দেখে শ্রীনিবাসাচার্য পাঠ সমাপ্ত করলেন। পাঠ শেষে সকল মহান্ত শ্রীনিবাসাচার্যকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করলেন।

মহোৎসবের রাত্রে যে সংকীর্তন হয়েছিল তার প্রস্তুতিপর্বের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে ভক্তিরত্নাকরে। নানা কারণে এই বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ণনার প্রথমে দেখা যাচ্ছে প্রচুর খোল করতালের আয়োজন। সেকালে শ্রীখণ্ড কীর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কাজেই সংকীর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে এত খোল করতালের আয়োজন। এছাড়া অনেক পাত্রে চন্দন এবং পুষ্পমালার আয়োজন করা ছিল। রঘুনন্দন সকলকে প্রসাদী মালাচন্দন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে সকল মহান্ত আনন্দের সঙ্গে পরস্পরকে মালাচন্দন দিতে আরম্ভ করলেন। কেউ বা খোল করতালের উপর মালাচন্দন অর্পণ করলেন। গদাধরদাস-শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য এবং চৈতন্যমঙ্গলপ্রণেতা লোচনদাস অদ্বৈতপুত্রদ্বয় কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালকে মালাচন্দন অর্পণ করলেন। স্বয়ং রঘুনন্দন বীরভদ্রকে চন্দনদ্বারা ভূষিত করলেন। তাঁর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাসাচার্য মালাচন্দন এগিয়ে দিলে বীরভদ্র রঘুনন্দনকে মালাচন্দন অর্পণ করলেন। রঘুনন্দন স্বয়ং শ্রীনিবাসাচার্যকে মালাচন্দন দিলেন। এভাবে সকলে গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরকে মালাচন্দন অর্পণ করে মহোৎসবকে সার্থক করে তুললেন।

মালাচন্দনের পর সংকীর্তন আরম্ভ হলো। প্রথমে মঙ্গলধ্বনির মধ্যে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হলো। বাদকসকলের পাঠাক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্যধ্বনি শুনে উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হলো। এরপর আরম্ভ হলো গায়কের আলাপ। শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তাল এবং গমকের নানা প্রকাশে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হলেন। গদাধর দাসের মহোৎসবের মতন এই মহোৎসবেও কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বীরভদ্রের নৃত্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সারারাত ধরে এই সংকীর্তন এবং নৃত্য চলল। ভাবে বিভোর হয়ে এভাবে নৃত্য ও সংকীর্তন করার পর তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের অপর বৈশিষ্ট্য হলো সকল গোষ্ঠীর মহান্তের একত্রে

ভোজন। একাদশীর এই উৎসবের পর রঘুনন্দন সকলকে দ্বাদশীর পারণ কি ভাবে করা হবে জিজ্ঞাসা করলে—

সবে কহে একত্রে বসিয়া সর্বজন।
করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ সেবন[১৭২]।

রঘুনন্দন একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ভোগের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। আরতির পর সকলে সুসজ্জিত ভোজনের স্থানে একত্রে উপবেশন করলে নানাবিধ ভোগসামগ্রী তাঁদের পরিবেশন করা হতে লাগল। সকল মহান্ত রঘুনন্দনকে এই পংক্তি ভোজনে অংশ গ্রহণ কর্তে অনুরোধ জানালে তিনি তাঁদের পরিবেশন তদারক করার অনুমতি নিলেন। মনে হয় এঁদের প্রসাদ পরিবেশনের দায়িত্ব শ্রীনিবাসাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণবদের উপর ন্যস্ত ছিল। কারণ পরবর্তী বিবরণে দেখা যাচ্ছে তাঁদের প্রসাদ গ্রহণের পর স্বয়ং রঘুনন্দন প্রসাদ গ্রহণ করলেন। দ্বাদশী দিবসের এই মহোৎসব সম্বন্ধে সকলে একমত হয়ে স্বীকার করলেন ইতিপূর্বে এরকম উৎসব আর হয় নি। সন্ধ্যায় আরতি দেখার জন্য সকলে গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। আরতির পর কৃষ্ণকথায় কিছু সময় অতিবাহিত হলো। তারপর আরম্ভ হলো সংকীর্তন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত সংকীর্তন হওয়ার পর সকলে সে রাত্রির মতন বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

পরের দিন শ্রীপতি শ্রীনিধি প্রমুখ মহান্তগণ বিদায় নিতে চাইলে রঘুনন্দন তাঁদের আরও কিছুদিন শ্রীখণ্ডে থাকতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরাও রঘুনন্দনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কৃষ্ণকথা ও সংকীর্তন নিয়ে মহানন্দে আরও দিনকতক শ্রীখণ্ডে থেকে গেলেন। বিদায় নেওয়ার সময় বয়স্ক বৈষ্ণবরা রঘুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যকেও আশীর্বাদ করে গেলেন।

কাটোয়ার মহোৎসবের যে বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীখণ্ডের এই মহোৎসবের বর্ণনা তুলনা করলে দেখা যায় শেষোক্ত মহোৎসবের গুরুত্ব প্রথমটির থেকেও অনেক বেশী। কাটোয়ার উৎসবে সকলের একত্র হওয়াই একটি বড় ঘটনা কিন্তু শ্রীখণ্ডের উৎসবে সকলের একত্র হওয়াই নয়—মালাচন্দন বিনিময় এবং একত্রে প্রসাদগ্রহণ আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই উৎসব প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী সবিস্তারে এই ঘটনা

---

[১৭২] ভ. র ৯।৬৭১

হুটির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে কাটোয়ার উৎসবে বিভিন্ন শাখাভুক্ত বৈষ্ণবরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু বোধহয় সকলে একত্রে এতদিন থাকবার ফলেই হোক্ কিংবা তাঁদের মধ্যে ঐক্যের কোন সূত্রের সন্ধান পেয়েই হোক—শ্রীখণ্ডে এসে তাঁদের সেই স্বাতন্ত্র্যও তাঁরা সানন্দে ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মিশে গেলেন। নিজেদের মধ্যে ব্যবধানের অবসান করে এভাবে একত্রিত হওয়া পরবর্তী ঐক্যের পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে শ্রীখণ্ডের এই মহোৎসব বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কাটোয়ার মহোৎসবে এবং যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য তাঁর কর্মদক্ষতার দ্বারা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু শ্রীখণ্ডের উৎসবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা। কাটোয়ার উৎসবে সে ব্যবস্থা থাকলে নরহরি সেকথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। কিন্তু সেখানে এসম্বন্ধে কিছু না বলে শ্রীখণ্ডের উৎসবের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্যের ভাগবত পাঠের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় এই উৎসবে তিনি প্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনদের একত্রে বসিয়ে ভাগবত শোনানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। গৌড়ীয় মহান্তদেরও বোধহয় এই প্রথম বৃন্দাবনের গোস্বামীদের করা ভাগবতের নূতন ব্যাখ্যা শোনার প্রথম সুযোগ হলো। এতদিনে তাঁরা তাঁদের মিলনের একটা সূত্র পেয়ে থাকবেন। কারণ এরপরই দেখা যাচ্ছে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে মালাচন্দন বিনিময় করছেন এবং একত্রে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছেন। ভাগবত পাঠ একদিনই হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ তাঁরা যে কয়দিন ছিলেন সে কয়দিনই কৃষ্ণকথা এবং সংকীর্তন হয়েছিল বলে আশা করা যায়। সেখানে শ্রীনিবাসাচার্য নিশ্চয়ই গোস্বামীদের কৃত গৌড়ীয় দর্শন ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং আশা করা যায় সমবেত বৈষ্ণব মহান্তগণও সেই সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীখণ্ডের এই মহোৎসবে শ্রীনিবাসাচার্য যে উপস্থিত সকল মহান্তের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নরহরি চক্রবর্তীর উৎসব-শেষের একটি উল্লেখে। তাঁরা যাওয়ার সময় রঘুনন্দনকে যেমন তাঁদের অন্তরের প্রীতি জানিয়েছিলেন তেমনি শ্রীনিবাসাচার্যের প্রতিও তাঁদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। যদুনন্দন, লোচনদাস প্রভৃতি সম্মানিত বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত থাকতেও তাঁরা শ্রীনিবাসাচার্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ

করায় অনুমান করা যায় যে এই মহোৎসবে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং কর্মক্ষমতা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সেক্ষেত্রে শ্রীনিবাসাচার্যের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথে এই মহোৎসবে তাঁর এই সাফল্য একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিরাট পদক্ষেপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের পরবর্তী কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গে। এই তরঙ্গে দ্বিজ হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-মহোৎসব, হরিদাসাচার্যের পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের দীক্ষা ও বিখ্যাত খেতরীর উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

দ্বিজ হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-মহোৎসবের বিবরণ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শ্রীখণ্ড থেকে ফিরে আসার পর আচার্য আবার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন। গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস প্রথম থেকেই আচার্যের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের পিতৃদেবের তিরোভাব-তিথি নিকটবর্তী বলে তিনি তাঁদের স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে মহোৎসব পালন করার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিলেন। আচার্যের নির্দেশমত তাঁরাও কাঞ্চনগড়িয়ায় এসে আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

ভক্তিরত্নাকরে এই উৎসবের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে মনে হয় এই উৎসব শ্রীখণ্ডের উৎসবের অনুরূপ হয়েছিল। উৎসবের আগে শিষ্যবৃন্দ সমেত শ্রীনিবাসাচার্য কাঞ্চনগড়িয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। দশমীর দিন সংকীর্তনে অতিবাহিত হলো। একাদশীর দিন আচার্য দুই ভাইকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এদিনও সংকীর্তনে অতিবাহিত হলো। দ্বাদশীর দিন শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ ভক্ষ্যসামগ্রী প্রস্তুত করলে আচার্য কৃষ্ণে ভোগ সমর্পণ করলেন। সেই প্রসাদান্ন পাত্রে সাজিয়ে হরিদাসাচার্যে সমর্পণ করলেন। এরপর সকলে একত্রে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর সংকীর্তনে সেদিনও অতিবাহিত হলো। শিষ্যবৃন্দ সমেত শ্রীনিবাসাচার্য কাঞ্চনগড়িয়ায় চার পাঁচ দিন ছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে শ্রীনিবাসাচার্য কাঞ্চনগড়িয়া থেকে খেতরী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে তেলিয়া-বুধরি গ্রামে দিনকতক অবস্থান করেন। সে সময় তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত পদকার গোবিন্দদাসকে দীক্ষা দান করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের দীক্ষাদান প্রসঙ্গের আলোচনা অন্যত্রও পাওয়া যায়। কাজেই ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা বিচার করে

দেখা প্রয়োজন।

গোবিন্দদাসের দীক্ষাদান প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার পর রামচন্দ্র কবিরাজের পরামর্শে গোবিন্দদাস কুমারনগর থেকে বসতি উঠিয়ে তেলিয়া-বুধরিতে স্থায়িভাবে বাস করার জন্য গেলেন। এরপর রামচন্দ্রও গেলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে তিনি দেশে ফিরে এসে কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ও কাঞ্চন-গড়িয়ার উৎসবে যোগ দিয়েছেন। এরপর আচার্যের সঙ্গে রামচন্দ্র খেতরী যাচ্ছেন সে সংবাদ গোবিন্দদাস পেয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা যে তেলিয়া-বুধরি গ্রামে আসবেন তাও হয়তো ইতিপূর্বে স্থির করা হয়ে থাকবে। কারণ প্রথমতঃ খেতরীর পথে এই গ্রাম পড়ছে, দ্বিতীয়তঃ এটি এখন রামচন্দ্রের স্থায়ী বাস-স্থান। নিজের গৃহে গুরুকে পাওয়ার বাসনা রামচন্দ্রের হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া গোবিন্দদাস এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করার পর রামচন্দ্র এখানে আসেন নি। এসব নানা কারণে রামচন্দ্র অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাসহ তাঁর গুরুদেব শ্রীনিবাসাচার্যকে নিজ বাসস্থানে নিয়ে যাবেন একথা স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

শিষ্যবৃন্দসহ শ্রীনিবাসাচার্য তেলিয়া-বুধরিতে উপস্থিত হলে "শ্রীগোবিন্দ আদি মহা আনন্দ অন্তরে" তাঁদের অভ্যর্থনা করে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে আচার্যের অবস্থানকালে একদিন গোবিন্দদাস রামচন্দ্রের কাছে আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জানালে রামচন্দ্র সেকথা আচার্যকে নিবেদন করলেন। শ্রীনিবাসাচার্য গোবিন্দদাসের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়ে তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

প্রেমবিলাসের চতুর্দশ বিলাসে গোবিন্দদাস কবিরাজের দীক্ষাদান প্রসঙ্গে ভিন্ন বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণে দেখা যায় রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে গোবিন্দদাস তাঁকে এক পত্রে জানালেন যে তিনি অসুস্থ এবং তাঁকে দেখতে চান। সে সময়ে শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে পাঠে ব্যস্ত থাকায় রামচন্দ্র সে চিঠির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আরও দেড় মাস পর গোবিন্দদাস পুনরায় চিঠি লিখে জানালেন যে তাঁর শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তিনি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রামচন্দ্রকে আসতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন এবং আচার্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। এই পত্র পেয়েও রামচন্দ্র

আচার্যকে কিছু বললেন না । এরপর গোবিন্দদাসের অস্বাস্থ্যের কারণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখেছেন যে তিনি পূর্বে দেবীর উপাসক ছিলেন । মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে তিনি ইষ্ট দেবীর সাক্ষাৎ পান । দেবীর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলে তিনি গোবিন্দের শরণ নিতে পরামর্শ দেন এবং সেই সঙ্গে দেবী নন্দের নন্দনের স্তুতিও করেন । গোবিন্দ পরিত্রাণদাতা শুনে গোবিন্দদাস হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠান । সেই সঙ্গে অনুভব করেন শ্রীনিবাসাচার্য এসে তাঁকে গোবিন্দের শরণ নিতে উপদেশ দিচ্ছেন । এরপর গোবিন্দদাস পুত্র দিব্যসিংহকে ডেকে পাঠান এবং নিজ স্বাস্থ্যের কথা লিখে রামচন্দ্র ও আচার্যকে আনার ব্যবস্থা করতে বলেন । সমাচার নিয়ে বুধরী থেকে পাঁচজন লোক যাজিগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো । এবার আচার্য ও রামচন্দ্র বুধরীতে উপস্থিত হলেন । গোবিন্দদাসের আদেশে দিব্যসিংহ আচার্যকে অভ্যর্থনা করে আনলেন । আচার্য গোবিন্দদাসের ঘরে উপস্থিত হলেন । তাঁকে ধরাধরি করে বসানো হলো । তিনি আচার্যের চরণধূলি গ্রহণ করলেন ; রামচন্দ্র তাঁকে চরণামৃত পান করালেন এবং পান করানো মাত্র তাঁর ব্যাধি দূর হলো । এরপর আচার্য কৃষ্ণকে ভোগ দিয়ে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করলেন । গোবিন্দদাস আচার্যের পাত্রের অবশেষ গ্রহণ করলে তাঁর মনে হলো শরীরে কোনও ব্যাধি নেই । পরদিন আচার্যের আদেশে রামচন্দ্র স্বহস্তে গোবিন্দকে স্নান করিয়ে দিলেন এবং নিজের কোলে নিয়ে বসলেন । আচার্য তাঁকে "হরেকৃষ্ণ" মন্ত্র দান করলেন ।

প্রেমবিলাসে গোবিন্দদাস কবিরাজের দীক্ষাদান প্রসঙ্গে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তার সমর্থন কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় নি । কর্ণানন্দে আচার্যের শাখা এবং শিষ্যবৃন্দের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে । সেই গ্রন্থেও প্রেমবিলাসে বর্ণিত বিবরণের কোনও আভাস দেওয়া নেই । প্রেমবিলাসে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও তা ভক্তিরত্নাকর কিংবা কর্ণানন্দে পাওয়া যেত । কিন্তু সম্ভাব্য কোনও স্থানে এসম্বন্ধে কোনও আভাস না পাওয়ায় এই বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয় ।

এই সন্দেহ হওয়ার মূলে আরও কারণ হলো বিবরণের অযৌক্তিকতা । ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাসের দীক্ষার মধ্যে বেশ কয়েক বৎসরের ব্যবধান আছে । রামচন্দ্রের সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাৎকার

এবং রামচন্দ্র কর্তৃক আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ প্রায় আকস্মিক ব্যাপার। তখনও আচার্য খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান নি। আচার্যের খ্যাতি বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে এদেশে শিক্ষিতসমাজে আচার্যের পাণ্ডিত্য ও প্রভাবের বিস্তৃতি এবং রামচন্দ্রের কাছে আচার্যের গুণকীর্তন শুনে গোবিন্দদাস প্রভাবিত হয়ে থাকবেন এবং বেশ কিছুকাল লক্ষ্য করে এবং ভাবনাচিন্তার পর তিনি আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হয়ে থাকবেন। সে সব দিক থেকে বিচার করলে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করতে হয়। সেই হিসাবে প্রেমবিলাসে এঁদের দীক্ষাগ্রহণের সময়ের যে স্বল্প ব্যবধান দেখানো হয়েছে এবং গোবিন্দদাসের রোগাক্রান্ত হওয়া ও দেবী কর্তৃক বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকারের যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায় না।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই কাহিনীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন[১৭৩]। এই কাহিনীর সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন যে গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি যে প্রথম জীবনে শক্তির উপাসক ছিলেন কিংবা মাতামহের প্রভাবে প্রথম জীবনে শক্তির ভক্ত ছিলেন তা প্রমাণ করার মত আরও তথ্য তিনি এই আলোচনায় উপস্থিত করেছেন। ডঃ মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত এসব তথ্যাদি থেকে গোবিন্দদাসের প্রথম জীবনের শাক্ত প্রভাবকে স্বীকার করা গেলেও প্রেমবিলাসে বর্ণিত কাহিনীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বিবরণের মত প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র ও তাঁদের বাসস্থান সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনও অংশকেই যে সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয় তা ইতিপূর্বে রামচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখানো হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলেও গোবিন্দদাসের এই কাহিনী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। মনে হয় শাক্ত গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় কাহিনীর উদ্ভব পরবর্তীকালে হয়ে থাকবে। সেই কাহিনীকেই প্রেমবিলাসকার সত্য বলে ধরে নিয়ে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

গোবিন্দদাসের ওপর শক্তিমতের প্রভাব সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এক

---

[১৭৩] গো. দা. পৃ. ৩-৭

কাহিনীর বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে নবম তরঙ্গে বলা হয়েছে যে তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতামহের ইঙ্গিতে তাঁর মার যন্ত্রণা লাঘবের জন্য দুর্গার যন্ত্র ধৌত করে জল পান করানো হয়েছিল। এই কাহিনীও কতদূর সত্য বলা কঠিন। তবে এই কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর মাতামহ শাক্ত ছিলেন। গোবিন্দদাসও যে শক্তির ভক্ত ছিলেন তা তাঁর রচিত এবং প্রেমবিলাসে ধৃত পদটি থেকে অনুমান করা যায়। গোবিন্দদাসের ছেলের নাম (দিব্যসিংহ—দেবীর বাহন) থেকেও বোঝা যায় গোবিন্দদাস শাক্ত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত কাহিনীটি যদি সত্য নাও হয় তবুও এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এইরকম কিংবদন্তী সেসময়ে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে নরহরি চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছিলেন। তবে প্রেমবিলাসে বর্ণিত কিংবদন্তী নিশ্চয়ই তখনও প্রচলিত হয় নি কিংবা হয়ে থাকলেও এতটা প্রয়োজনীয়তা অর্জন করে নি। সেক্ষেত্রে ভক্তিরত্নাকরে নিশ্চয়ই এই কিংবদন্তীও স্থান লাভ করত। মনে হয় এই কাহিনী পরবর্তী কালে প্রচলিত হয়েছিল এবং প্রেমবিলাস আরও পরে রচিত হওয়ায় এটি সেই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

গোবিন্দদাসের দীক্ষাকাল আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার তাঁর "গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ" গ্রন্থে গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা উদ্ধৃত করে লিখেছেন "গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খৃঃ) জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ) দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন …… (পৃঃ ৭০)"[১৭৪] ভদ্র মহাশয় কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই তারিখগুলিকে গ্রহণ করেছেন তা অনুমান করা কঠিন। তবে গোবিন্দদাসের দীক্ষাকাল বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত প্রায় অনুরূপ। কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণ থেকে আমরা শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের প্রথমদিককার কাল নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য আমরা নির্ভর করছি ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের ওপর। আচার্যের জীবনের পূর্ববর্তী কালের ওপর নির্ভর করে আমরা তাঁর পরবর্তী ঘটনাবলীর কালগুলি সম্বন্ধে যে অনুমান করছি তাতে

---

[১৭৪] গো. দা. -পৃ. ৩৮৭

দেখা যাচ্ছে কাটোয়ার ও শ্রীখণ্ডের মহোৎসবগুলি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে হয়েছে। তার দুমাস বাদে মাঘ মাসে কাঞ্চনগড়িয়ার উৎসব হয়। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে গোবিন্দদাসের দীক্ষার অব্যবহিত পরে ফাল্গুন মাসে খেতরীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের হিসাব অনুযায়ী গোবিন্দদাস ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গোবিন্দদাসের দীক্ষার পর ভক্তিরত্নাকরে খেতরী উৎসবের কথা বলা হয়েছে। এই বর্ণনার প্রথমে আছে প্রস্তুতি পর্ব, তারপর উৎসবের বর্ণনা। ভক্তিরত্নাকরের এই বর্ণনার জের দেখতে পাওয়া যায় নরোত্তমবিলাসে। বস্তুতঃ নরোত্তমবিলাসের এই বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনার পরিপূরক বলা চলে। এই দুই বর্ণনাকে একত্র করে নিয়ে খেতরীর উৎসবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া উৎসবের সামান্য বর্ণনা পাওয়া যায় প্রেমবিলাসে। প্রথমে নরহরি চক্রবর্তীর দুটি গ্রন্থের বিবরণের আলোচনা করে প্রেমবিলাসের বর্ণনার বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনায় দেখা যায় যে গোবিন্দদাসের দীক্ষার অব্যবহিত পরেই খেতরী থেকে দুর্গাদাস নামে এক বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুরের সংবাদ নিয়ে শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কাছে আচার্য নরোত্তমের প্রিয়া সহ গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রাপ্তির কাহিনী শোনেন। এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে নরোত্তমবিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাসে। দুর্গাদাসের নিকট হতে আরও জানা যায় যে নরোত্তমশিষ্য রাজা সন্তোষ দত্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির, সিংহাসন আদি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এরপর দুর্গাদাস বলেন যে পরের দিন খেতরী হতে নরোত্তম স্বয়ং আসছেন আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে। পরের দিন নরোত্তম ঠাকুর এসে আচার্যকে বললেন—

প্রভু আজ্ঞা কৈল গৌড়ে করিতে গমন।
শ্রীবিগ্রহ-বৈষ্ণব-সেবা শ্রীসংকীর্তন॥
তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল আর।
হৈল শ্রীমন্দির আদি সকল সম্ভার॥
শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমার শ্রীবিগ্রহগণে।
মনে এই আপনি বসাবে সিংহাসনে॥

আসিবেন শীঘ্র এখন এই মনে ছিল ।
তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল[১৭৫] ।

নরোত্তম ঠাকুরের এই উক্তি থেকে তাঁর প্রতি বৃন্দাবনের মহান্তদের কি আদেশ ছিল অনুমান করতে পারা যায় । শ্রীনিবাসাচার্যের ওপর যেমন গ্রন্থ প্রচারের ভার ছিল তেমনি নরোত্তম ঠাকুরের প্রতি ভার ছিল বিগ্রহ সেবা, বৈষ্ণবের সেবা এবং সংকীর্তন করা । তাঁর বৈষ্ণব সেবার কিছু উদাহরণ নরোত্তমবিলাসে দেওয়া আছে । এই প্রসঙ্গে যে সব ঘটনাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া আছে তা' থেকে অনুমান করা যায় উত্তরবঙ্গের এসব অঞ্চলে শাক্ত প্রভাব বেশী ছিল । নরোত্তমের প্রভাবে সেখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয় । তিনি সংকীর্তনের কতটা উন্নতিসাধন করেছিলেন তার পরিচয় খেতরী উৎসব প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । যথাসময়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব । এপর্যন্ত তাঁর একটি কর্তব্য বাকী ছিল সেটি হলো বিগ্রহ সেবা । প্রিয়া সহ গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রাপ্তির বিবরণ নরহরি দুটি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন । এরপর হল এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন । রাজা সন্তোষ দত্ত আরও পাঁচটি বিগ্রহ, মন্দির, সিংহাসন প্রভৃতি তৈরী করে দিয়েছিলেন ।

নরোত্তম ঠাকুর বিলম্ব হওয়া সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তাতে অনুমান করা যাচ্ছে তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছুদিন আগেই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্যকে দিয়ে এই কাজ করাবেন বলে তাঁর অপেক্ষাতেই ছিলেন । মনে হয় আচার্য সে সময়ে বৃন্দাবন যাতায়াত, এবং অন্যান্য মহোৎসবাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে নরোত্তমের যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি । ইতিমধ্যে এঁদের যে কোনও যোগাযোগ হয় নি তার প্রমাণও নরহরির পরবর্তী বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায় । বিবরণানুযায়ী নরোত্তমের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের সময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আলোচনার পর আচার্য তাঁর বিবাহপ্রসঙ্গ, বৃন্দাবন গমনাগমন প্রভৃতি সংবাদ নরোত্তমকে জানাচ্ছেন[১৭৬]। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি তিনি প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পরই বিবাহ করেছিলেন । এতদিন বাদে যখন সে খবর নরোত্তমকে বলছেন তখন সঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারা যায় যে এঁদের মধ্যে প্রথমবার একসঙ্গে

১৭৫. ভ. র. ১০।২৫৪-৭ । ১৭৬. ভ. র. ১০।২৫৯

বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আর কোনও যোগাযোগ ছিল না ।

খেতরীর মহোৎসব সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুরের কি পরিকল্পনা ছিল তার সঠিক বিবরণ নরহরি চক্রবর্তী কোন গ্রন্থেই দেন নি । শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে তিনি যে সময়ে প্রস্তাব করেন তারপর দেড় মাসেরও কম সময় হাতে ছিল । কিন্তু খেতরীর উৎসবের যে আড়ম্বর ও আয়োজনের বিবরণ পাওয়া যায় তা এত অল্প সময়ে করা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না । বরং—নরোত্তম যে বিরাট উৎসব করার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন কতগুলি কারণে তা অনুমান করা যেতে পারে । নরহরির পরবর্তী বিবরণে দেখা যাচ্ছে যে এই উৎসবের সাফল্য সম্বন্ধে আচার্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন । শুধুমাত্র তিনি গিয়ে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে আসার প্রশ্ন করলে তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত হতে হতো না । কিন্তু দেখা যাচ্ছে নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পর সেরাত্রে—

শ্রীআচার্য ঠাকুর শয়ন নাহি ভায় ।
কৈছে কার্য সমাধান হবে এ চিন্তায় ॥
মনে মনে করে মহাপ্রভুর প্রিয়গণ ।

খেতরী গ্রামে কি করিবেন আগমন[১৭৭] ॥

তাঁর এই চিন্তার ধারা থেকে বোঝা যাচ্ছে নরোত্তম ঠাকুর গৌড়ের সকল বৈষ্ণব গোষ্ঠীকে একত্র করতে আগ্রহী হয়ে তাঁর আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং একমাত্র শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বারাই এঁদের একত্র করা সম্ভব একথা ধরে নিয়ে তাঁকে দিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করে রেখেছিলেন । ইতিমধ্যে তিনি কাটোয়া এবং শ্রীখণ্ডে আচার্যের সাফল্যের কথা শুনে থাকবেন । তার ফলে তাঁর এই আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু এই দুই জায়গায় শ্রীনিবাসাচার্য সাফল্যলাভ করলেও খেতরীর উৎসব সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন কেন তার কারণানুসন্ধান করা প্রয়োজন । মনে হয় নিম্নলিখিত কারণে আচার্যের চিন্তা হয়ে থাকতে পারে ।

প্রথমতঃ কাটোয়া এবং শ্রীখণ্ড পশ্চিমবঙ্গের এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব । অন্যান্য সকল স্থান থেকেই এ জায়গা দুটির দূরত্ব এত বেশী নয় যে বৃদ্ধদেরও এখানে

---

[১৭৭] ভ. র. ১০।২৬৩-৪

আসা অসম্ভব হতে পারে। সেদিক থেকে বিচার করলে খেতরীর দূরত্ব অনেক বেশী। তাছাড়া কাটোয়া বা শ্রীখণ্ডে যাতায়াতের যে সুবিধে আছে সে সুবিধে খেতরীতে নেই। পদ্মানদীর মতন বিরাট নদী পার হওয়ার প্রশ্নও আছে। এসব কারণে বয়োবৃদ্ধের দল এখানে না আসতেও পারেন।

দ্বিতীয়তঃ কাটোয়া এবং শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ঘাঁটিগুলির অন্যতম। পরবর্তী কালে এই দুই স্থানকে দ্বাদশ পাটের অন্যতম বলে স্বীকার করা হয়েছে। খেতরীতে বৈষ্ণবদের কোনও প্রভাব ছিল না। সেদিক থেকে খেতরী সম্বন্ধে গোঁড়া বৈষ্ণবদের আগ্রহ কম হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই এই বিচারেও অনেক বৈষ্ণব মহান্ত এখানে আসা সম্বন্ধে উৎসাহ না পেতে পারেন।

তৃতীয়তঃ এই দুই ক্ষেত্রে সকল গোষ্ঠী একত্র হয়েছিলেন চৈতন্যদেবের দুই প্রিয় পরিকরের তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এবং কর্তব্যের প্রেরণায় তাঁরা এই দুই উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে রকম প্রশ্ন খেতরীর ক্ষেত্রে নেই। কাজেই তাঁরা এখানে আসতে উৎসাহ বোধ না করতেও পারেন।

সব শেষে যে প্রশ্ন তাঁর মনে উদয় হতে পারে সেটি হলো আদর্শের প্রশ্ন। এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁরা যে উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিলেন সেখানে তাঁদের আদর্শের সংঘাতের কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এখানে সংঘাতের সম্ভাবনা প্রচুর। শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ায় তাঁরা গৌরাঙ্গের পূজাকে স্বীকার করে নিলেও প্রিয়া সহ গৌরাঙ্গ অর্থাৎ যুগলমূর্তির পূজাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী কি ভাবে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আচার্যের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ খেতরীর উৎসবের পূর্বে গৌড়ে যুগলমূর্তির আরাধনার প্রচলন ছিল কি না সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বলেছেন "কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তাকে নূতন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর। রঘুনাথ দাসের কাছ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি। কৃষ্ণের মূর্তির বামে রাধা মূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং যুগলমূর্তির উপাসনা জীব গোস্বামীর

স্বীকৃতি পাইয়াই প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে বাঙ্গালা দেশে চলিত হইল[১৭৮]।" অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়। অনুরাগবল্লীর তৃতীয় মঞ্জরীর বর্ণনানুসারে অনুমান করা যায় যে বৃন্দাবনে মদনমোহন ও গোবিন্দের সঙ্গে রাধামূর্তির পূজার প্রবর্তনা হয়েছিল পরবর্তীকালে প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানার সময়। তিনি প্রথমে এই দুই বিগ্রহের জন্য দুটি মূর্তি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই মূর্তির মধ্যে বড়টিকে চন্দ্রাবলী ও ছোটটিকে রাধিকামূর্তি বলে স্বীকার করে মদনমোহনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে জগন্নাথ মন্দিরের লক্ষ্মীমূর্তিকে গোবিন্দ মূর্তির রাধিকা হিসাবে প্রেরণ করা হয়। বৃন্দাবনের গোপীনাথ মূর্তির রাধিকা মূর্তি পাঠান জাহ্নবা দেবী। প্রথম দুই বিগ্রহের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে কিছু বলা না হলেও জাহ্নবা দেবী কর্তৃক গোপীনাথের জন্য রাধিকা মূর্তি প্রেরণের কথা এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। নরহরির বর্ণনানুসারে দেখা যাচ্ছে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে গিয়ে রাধিকাসহ মদনমোহন ও গোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করেন কিন্তু গোপীনাথের সঙ্গে রাধিকামূর্তি না দেখে তিনি দেশে ফিরে এসে এই বিগ্রহ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এটি খেতরী উৎসবের পরবর্তী কালের ঘটনা। এই ঘটনা বিচার করলে অনুমান করা যেতে পারে বৃন্দাবনে যুগলমূর্তি পূজার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল খেতরীর উৎসবে সেই রীতির প্রবর্তন এদেশে হয়। জাহ্নবা দেবী খেতরী উৎসবের পর বৃন্দাবনে গিয়ে স্বচক্ষে এই রীতি দেখে আসেন এবং সেখানে এপ্রসঙ্গে যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা তিনি সম্পূর্ণ করেন। কাজেই যুগলমূর্তি পূজার নূতন রীতির প্রবর্তনার মুখে শ্রীনিবাসাচার্যের চিন্তাগ্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

খেতরী উৎসব সম্বন্ধে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথমে চিন্তা থাকলেও মন স্থির করতে তাঁর সময় লাগে নি। মনোহর চক্রবর্তীর বর্ণনানুসারে তিনি একরাত্রের মধ্যেই মন স্থির করে নেন এবং পরদিন তাঁর শিষ্যবর্গের সাহায্যে নিমন্ত্রণপত্রী প্রস্তুত করে অনেক দূতের সাহায্যে নানাদিকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেন।

পত্রী দিয়া অভিযোগ্য পঞ্চদশ জনে।
পাঠাইলা নবদ্বীপ-আদি স্থানে স্থানে॥

---

[১৭৮] বা সা. ই. ১ (পূর্বার্ধ), ৪র্থ সং, পৃ. ৩১১

উৎকল দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা।
পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা তথা॥
হৈল ধ্বনি সর্বত্র ফাল্গুন পূর্ণিমাতে।
হবে মহা মহোৎসব খেতরী গ্রামেতে[১৭৯]।

খেতরী উৎসবের প্রস্তুতি পর্বের পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায় রাসচন্দ্রালয়ে নরোত্তম কর্তৃক তাঁর শিষ্যবৃন্দ সমেত কীর্তনের আয়োজন। ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত যে "আসর পাতিয়া রীতিমত পদাবলী-কীর্তনের শুরুও সেই উৎসব হইতে"[১৮০]। সশিষ্য নরোত্তমের আচার্যের সামনে কীর্তনের মহড়া থেকে আমাদেরও একথা মনে হয়।

বিধিবদ্ধ ভাবে কীর্তনের কথা যে শ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর এসময়ে চিন্তা করছিলেন তা অনুমান করার আরও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরের পরবর্তী বর্ণনায়। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিবাসাচার্যের পরামর্শে নরোত্তম ঠাকুর সদলে তেলিয়া-বুধরি গ্রাম ত্যাগ করলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। এরপর শ্রীনিবাসাচার্য—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণিতে গোবিন্দে।
আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে[১৮১]।

মনে হয় খেতরীর উৎসবেই—

শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইল গীত।
গীতামৃত বৃষ্টি হৈল সর্বমনোহিত[১৮২]।

এই বর্ণনা সঠিক হলে স্বীকার করতে হয় যে সংকীর্তনের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত শ্রীনিবাসাচার্য প্রথম করেন এবং খেতরীর উৎসবেই প্রথম গোবিন্দদাসকৃত গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে রচিত পদসহ সংকীর্তনের আরম্ভ। ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে যে সব পদ রচিত হয়েছিল সেগুলো এই উৎসবের পূর্বে গীত হলেও খেতরীর উৎসবে রাধাকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৌরাঙ্গলীলা গাওয়ার রীতি ছিল বলে মনে হয় না।

তেলিয়া-বুধরি থেকে খেতরী যাওয়ার পূর্বে শ্রীনিবাসাচার্যের অপর

---

১৭৯. ভ র. ১০।২৭৬-৮। ১৮০. বা. সা. ই. ১ (পূর্বার্ধ), ৪র্থ সং, -পৃ. ৪০১
১৮১. ভ. র. ১০।২৯৪। ১৮২. ঐ - ১০।২৯৭

উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বুধরির নিকটবর্তী বাহাদুরপুর গ্রামবাসী দ্বিজ বংশীদাসকে দীক্ষা দেওয়া। ইনি ছিলেন বাহাদুরপুর গ্রামনিবাসী শ্যামাদাস চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই শ্যামাদাসের কন্যা হেমলতার সঙ্গে জাহ্নবা দেবীর মাসতুতো ভাই এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ হয়। এই বিবাহের আয়োজন করেছিলেন স্বয়ং জাহ্নবা দেবী। এ থেকে বোঝা যায় বাহাদুরপুরের চক্রবর্তীরা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কাজেই এই বংশের একজনকে শিষ্য করা শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেই বোধহয় ভক্তিরত্নাকরে এসম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে শ্রীনিবাসাচার্য তেলিয়া বুধরি থেকে খেতরী গিয়েছিলেন নিমন্ত্রিতদের সমাবেশের অব্যবহিত পূর্বে। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে পঞ্চ বিগ্রহ দর্শন করেন, তারপর উৎসবের আয়োজন তদারক করেন। খেতরীতে তাঁর আগমনের পর নিমন্ত্রিত মহান্তরা গণসহ একে একে আসতে আরম্ভ করেন।

যে সব নিমন্ত্রিতরা খেতরীর উৎসবে আগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জাহ্নবা দেবীর খড়দহ থেকে খেতরী আগমনের বিস্তারিত বিবরণ ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে দেওয়া আছে। এই দুই গ্রন্থের বিবরণে জানা যায় যে এই উৎসবের নিমন্ত্রণ পেয়ে কৃষ্ণদাস সরখেল, রঘুপতি উপাধ্যায়, মহীধর, মুরারি চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মনোহর, কমলাকর পিপলাই, শ্রীজীব পণ্ডিত, মাধব আচার্য, নৃসিংহ, চৈতন্যদাস, কানাই, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ দাস, বৃন্দাবনদাস, মীনকেতন রামদাস, নকড়ি, বলরাম আদি নিত্যানন্দভক্ত—

সভে নিবেদিলা দুই ঈশ্বরী চরণে।
খেতরী যাইতে কৈছে ইচ্ছা হয় মনে॥
শুনি হর্ষ হৈয়া কহে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বিলম্বে কি কার্য তথা চল শীঘ্র করি॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হৈয়া উল্লাস[১৮৩]॥

নরোত্তমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে খেতরী যাত্রার আয়োজন শুনে আরও অনেকে জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

---

[১৮৩] ন. বি. ৬বি.

তাঁদের সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যাত্রারম্ভ করতে পারেন নি। ভক্তিরত্নাকরে নিত্যানন্দ-শিষ্যদের যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় সেখানে নরহরি আরও তিন জনের নাম দিয়েছেন। এঁরা হলেন—কৃষ্ণদাস, দামোদর এবং মুকুন্দ। খেতরী যাত্রার পূর্বেই জাহ্নবা দেবী স্থির করেছিলেন যে তিনি বৃন্দাবন হয়ে দেশে ফিরবেন।

নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর—এই দুই গ্রন্থ থেকে জাহ্নবা দেবীর যাত্রাপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি পদব্রজে কিছুদূর গিয়ে "মনুষ্যের যানে" আরোহণ করেন। এরপর নৌকা করে বেশ কিছুদূর গিয়ে বণিক ভাগ্যবন্তের গৃহে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সেদিন অবস্থান করেন। এখানে খণ্ড ভগবানের পুত্র রঘুনাথাচার্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁদের যাত্রা আবার আরম্ভ হয়। এখান থেকে তিনি উপস্থিত হলেন অম্বিকা কালনা। কালনায় থাকতেই জাহ্নবা দেবী সংবাদ পেয়েছিলেন যে সীতামাতার আজ্ঞা পালনের জন্য অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ খেতরী যাচ্ছেন। কালনা থেকে হৃদয়চৈতন্য এবং গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস জাহ্নবা দেবীর সঙ্গী হলেন। এখান থেকে তাঁরা পৌঁছলেন নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে জাহ্নবা দেবীকে তৎকালীন বৈষ্ণব মহান্তরা সাদরে গ্রহণ করেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি তাঁকে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আনলেন। ইতিমধ্যে শান্তিপুর থেকে কানু পণ্ডিত, নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাসাচার্য, কামদেব, জনার্দন, বনমালী, পুরুষোত্তম আদি অদ্বৈতভক্তকে নিয়ে অদ্বৈতপুত্রদ্বয় অচ্যুত ও গোপাল নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। সেরাত্রে সকলে নবদ্বীপে কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে সকলে মিলে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে যদুনন্দন তাঁদের নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন। এখানে এঁদের সঙ্গে শ্রীখণ্ড থেকে এসে মিলিত হলেন শিষ্যবৃন্দ সমেত রঘুনন্দন। কাটোয়ায় এঁদের সঙ্গে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের নাম ভক্তিরত্নাকরে দেওয়া আছে। এঁরা হলেন—শিবানন্দ, বিপ্র বাণীনাথ, বল্লভ, চৈতন্যদাস, হরি আচার্য, ভাগবতাচার্য, নর্তক গোপাল, জিতা মিশ্র, রঘু মিশ্র, কাশীনাথ পণ্ডিত, নয়ন মিশ্র, কাঠকাটা জগন্নাথ, উদ্ধব, পুষ্পগোপাল, রঘুনাথ ও লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত। গঙ্গাস্নানের পর সকলে গৌরাঙ্গের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। জাহ্নবা দেবী স্বহস্তে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত করলেন। ভোগের পর সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এরপর তাঁরা সকলে একত্রে খেতরীর দিকে যাত্রা করলেন।

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস থেকে গৌড়ের বৈষ্ণব মহান্তদের খেতরী যাত্রার যে বিবরণ এখানে পাওয়া গেল তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথমতঃ কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে শ্রীনিবাসাচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তার ফলে দেখা যাচ্ছে তাঁরা পরবর্তীকালে সহজভাবে নিজেদের মধ্যে এক উদ্দেশ্যে মিলিত হচ্ছেন। বিবরণ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে অদ্বৈত-গোষ্ঠী যেমন পূর্বে সংবাদ দিয়ে নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তেমনি রঘুনন্দনের সঙ্গেও নিত্যানন্দ-শিষ্যরা নিশ্চয়ই যোগাযোগ রেখেছিলেন, যার ফলে এঁরা সকলে কাটোয়ায় এসে পৌঁছালে রঘুনন্দনও সদলে এসে এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এছাড়াও যাঁরা নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল বলে তাঁরাও সময়মত কাটোয়ায় এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্ব স্বীকার। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা, তাঁর সঙ্গে সকলের মিলিত হওয়া এবং যোগাযোগ স্থাপন করে একত্রে যাত্রা করার বিবরণে একথাই অনুমান করা যেতে পারে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো জাহ্নবা দেবীর জীবন সম্বন্ধে এই বিবরণে কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে তিনি এই প্রথম খড়দহ থেকে বার হলেন। বিভিন্ন স্থানের মধ্য দিয়ে যে তিনি এই সর্বপ্রথম যাচ্ছেন তা' তাঁকে সকলে সাগ্রহে গ্রহণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। নরহরির বর্ণনানুসারে এসব স্থান এবং একচক্রা তিনি ভালভাবে পরিদর্শন করেছিলেন পরবর্তীকালে বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর।

বৈষ্ণব মহান্তগণ খেতরীতে পৌঁছালে শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ অগ্রসর হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। এঁদের প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান পূর্ব হতে নির্দিষ্ট করা ছিল। আচার্যের শিষ্যদের ওপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর দেখাশুনার ভার দেওয়া হলো। জাহ্নবা দেবী ও তাঁর গোষ্ঠীর দেখাশুনার ভার দেওয়া হলো রামচন্দ্র কবিরাজের ওপর। কর্ণপুর কবিরাজের ওপর ভার দেওয়া হলো রঘুনাথ আচার্য ও অন্যান্যদের দেখাশুনা করার।

শ্যামানন্দ হৃদয়চৈতন্যের ভার গ্রহণ করলেন। নৃসিংহ কবিরাজের ওপর ভার দেওয়া হলো চৈতন্যদাস প্রভৃতির। ব্যাসাচার্যের ওপর শ্রীপতি শ্রীনিধিদের, বল্লবীকান্তের ওপর আকাই হাটের কৃষ্ণদাস এবং অন্যান্যদের, গোবিন্দ কবিরাজের ওপর গণসহ রঘুনন্দনের, রামকৃষ্ণ ও কুমুদের ওপর বাণীনাথ বিপ্র, জিতামিশ্রাদির এবং ভগবান কবিরাজের ওপর যদুনন্দন চক্রবর্তীর ভার অর্পণ করা হলো।

রাজা সন্তোষ দত্তের চেষ্টায় আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। ফাল্গুনের শুক্লা পঞ্চমী থেকে উৎসবের আরম্ভ হলো[১৮৪]। বাদকদের বাদ্য, গায়কদের গান এবং নর্তকদের নৃত্যে খেতরী পূর্ণ হলো। উৎসবের পূর্বদিন অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বদিনে বহু খোলকরতাল একত্র করা হলো। আচার্য খোলকরতাল পূজা সম্পন্ন করে জাহ্নবাদেবীর কাছে অভিষেকের কথা নিবেদন করলেন। তাঁর আজ্ঞা নিয়ে তিনি অন্যান্য সকলের কাছে গিয়ে পরের দিনের অভিষেকের কথা নিবেদন করলেন। নির্দিষ্ট দিন সকালবেলা আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর সকল মহান্তকে নূতন বস্ত্র নিবেদন করলেন। এদিকে রাজা সন্তোষ মন্দির-প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ নির্মাণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মহান্তর জন্য অপূর্ব আসন নির্মাণ করে রেখেছেন। সভা সন্নিধানে গোপন স্থানে জাহ্নবা দেবীর আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। স্থানে স্থানে কলাগাছ রোপণ করা হয়েছে। পূর্ণকলস, নারিকেল-বেষ্টিত আম্রশাখা দ্বারা স্থান সুশোভিত করা হয়েছে। আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে দেখে আচার্য জাহ্নবা দেবীকে সংবাদ দিলেন। তিনি এসে আসন গ্রহণ করার পর আচার্য অন্যান্য সকলকে নিবেদন করলে তাঁরাও এসে তাঁদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। সকলের অনুমতি গ্রহণ করে শ্রীনিবাসাচার্য বিগ্রহদের অভিষেকের আয়োজন করলেন। মন্দিরে সকল বিগ্রহ আনয়ন করা হলো। তারপর—

শ্রীরূপা গোস্বামীকৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
অভিষেক কালে সব নাম স্পষ্ট হৈল॥

---

[১৮৪] ন. বি. ৭বি

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজ মোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥
বসিলেন ঐছে শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে।
হইল আচার্য শোভা প্রাণ প্রিয়া সনে[১৮৫]।

আরতির পর আচার্য বিগ্রহদের ভোগ দিলেন। এরপর ভক্ষণাবসরে তাম্বুল, চন্দনসহ সুগন্ধি পুষ্পমালা দিলেন। জাহ্নবা দেবীর আদেশে এরপর সকলের মধ্যে প্রসাদী মালাচন্দন বিতরণ করা হলো। তাঁর আদেশে নিত্যানন্দশিষ্য নৃসিংহচৈতন্য আচার্যদের মালাচন্দন দিলেন। সকলের শেষে জাহ্নবা দেবীও মালাচন্দন গ্রহণ করলেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভোগারতির পর আরম্ভ হলো সংকীর্তন। ভক্তি-রত্নাকরে এই সংকীর্তনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণে দেখা যায় অদ্বৈতনন্দন অচ্যুতের ইচ্ছানুসারে সমবেত মহান্তগণ নরোত্তমকে কীর্তন আরম্ভের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে নরোত্তম তাঁর প্রিয় পরিকরদের নিয়ে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন।

প্রথমেই দেবীদাস মর্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে ॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লবদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে[১৮৬]।

নরোত্তমশিষ্য দেবীদাস শুধু বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদকই ছিলেন না তিনি কীর্তনীয়া হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। বল্লবদাসের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে নরোত্তম-পরিকর বলে যখন এঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তখন মনে হয় ইনি দেবীদাসের মতন একজন মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। এঁদের মৃদঙ্গবাদনের সঙ্গে আরম্ভ হলো গৌরাঙ্গদাসেদের করতাল বাদন। খোলকরতাল বাজানো আরম্ভ হওয়ার পর নরোত্তমশিষ্য বিখ্যাত কীর্তনীয়া গোকুল আলাপ আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁরা আরম্ভ করলেন চৈতন্যদেবদের নমস্কার জানিয়ে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥

---

১৮৫. ন. বি. ৭বি। ১৮৬. ভ. র. ১০।৫২৮-৯

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে[১৮৭] ॥

রঘুনন্দন কর্তৃক খোলকরতালে মালাচন্দন স্পর্শ করানোর পর নরোত্তম সুসম্বদ্ধ ভাবে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। প্রথমে আরম্ভ করলেন গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে—

শ্রীরাধিকা ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ[১৮৮] ॥

গৌরগুণ গীতারম্ভে সেখানে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হলো যেন গণসহ গৌরাঙ্গ সংকীর্তনের আসরে অবতীর্ণ হলেন। ভাষায়, সুরে, বাদ্যে তঁারা যেন মূর্তিমান হয়ে উঠলেন—

গণসহ প্রভু সংকীর্তনে বিলসয় ॥
পরম বিচিত্র বেশ বিচিত্র ভঙ্গিমা।
শোভায় ভুবন ভুলে দিতে কি উপমা ॥
মণ্ডলীবন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে।
গীতবাদ্যবৃদ্ধি যৈছে কে পারে বর্ণিতে ॥
নাচে গৌরচন্দ্র কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি।
ভুবন মাতায় প্রেমে করি প্রেমসৃষ্টি[১৮৯] ॥

এখানে সংকীর্তনের যে বর্ণনা নরহরি ভক্তিরত্নাকরে দিয়েছেন তার কোনও তুলনা পাওয়া ভার। এই বর্ণনায় দেখা যায় গৌরগুণকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল গণসহ তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করছেন উপস্থিত মহান্তদের এই অনুভূতি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। তাঁরা যেন অনুভব করতে লাগলেন যে গণসহ চৈতন্যদেব প্রাঙ্গণে নৃত্য করছেন। শেষে স্থির থাকতে না পেরে সমবেত মহান্তগণও নৃত্য আরম্ভ করলেন। অপূর্ব কীর্তনানন্দে তাঁদের অতীতের স্মৃতি জীবন্ত প্রত্যক্ষ সত্য বলে অনুভূত হতে লাগল।

সংকীর্তন ও নৃত্য শেষ হলে জাহ্নবা দেবীর আদেশে শ্রীনিবাসাচার্য ফাগু খেলার আয়োজন করলেন। জাহ্নবা দেবীর আদেশানুসারে আচার্য ও নরোত্তম সমবেত সকল মহান্তদের অনুমতি নিয়ে প্রত্যেকের সামনে পৃথক পৃথক পত্রে পুষ্পের পরাগ, ফাগু ইত্যাদি সাজিয়ে দিলেন। সকলের আগে জাহ্নবা দেবী মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহদের ফাগু দিয়ে সাজালেন। তারপর

---

১৮৭. ঐ ১০।৫৩৮-৯ ১৮৮. ঐ ১০।৫৪৭ ১৮৯. ভ. র. ১০।৫৭৬-৯

অন্যান্য মহান্তরা বিভিন্ন বিগ্রহের অঙ্গে ফাগু দিয়ে পরে পরস্পর পরস্পরকে ফাগু দিতে লাগলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে ফাগু খেলা চলল।

সন্ধ্যার সময় ফাগু খেলা শেষ করে সকলে আরতি দর্শন করলেন। নামসংকীর্তনের পর সকলের অনুমতি অনুসারে আচার্য গৌরাঙ্গদেবের জন্ম অভিষেকের কাজ সম্পন্ন করলেন।

আচার্য ঠাকুর গৌরাঙ্গেরে যত্ন করি।
বসাইলা পূর্ববেশ সিংহাসনোপরি ॥
শুক্ল বাস পরাইয়া পরম যতনে।
বসাইলা গৌরচন্দ্রে অন্য সিংহাসনে ॥
কৃষ্ণজন্ম তিথির বিধান যৈছে হয়।
তৈছে গৌরচন্দ্র জন্মাভিষেক করয় ॥
গৌরকৃষ্ণ এক হয়ে ভেদবুদ্ধি যার।
যমযন্ত্রণায় তার না হয় নিস্তার[১৯০] ॥

বেদধ্বনি, ভাটগণ কর্তৃক চৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণনা এবং নানা দেশী গায়কের নানা গীত ও বাদ্যের মধ্যে অভিষেক সম্পন্ন হলো। এরপর সমস্ত রাত সংকীর্তনে অতিবাহিত হলো।

পরদিন সকালে জাহ্নবা দেবী স্বহস্তে বিগ্রহদের জন্য ভোগ রান্না করলেন। মহাসমারোহে সে ভোগ বিগ্রহদের নিবেদন করা হলো। ইতিমধ্যে সকলে স্নানাদি পর্ব শেষ করে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মঙ্গলারতি দর্শন করলেন। ভোগের পর সকল মহান্তদের একত্রে বসিয়ে জাহ্নবা দেবী স্বহস্তে সকলকে প্রসাদ পরিবেশন করলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলে জাহ্নবা দেবীর আদেশে শ্রীনিবাসাদি সকলে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এঁদের যত্ন করে পরিবেশন করলেন স্বয়ং জাহ্নবা দেবী। সবশেষে তিনি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। প্রতিপদের দিন রাত্রি এভাবে শেষ হলো। স্থির হলো দ্বিতীয়ার দিন সকলে খেতরী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয়ার দিন সকলের ইচ্ছানুসারে সকল মহান্ত নিজ নিজ বাসস্থানে ভোগ রান্না করার ব্যবস্থা করলেন। সন্তোষ দত্তের ব্যবস্থায় সকলেই প্রচুর ভোগের উপকরণ পেলেন। সকলেই ভোগ রান্নার শেষে কৃষ্ণে ভোগ সমর্পণ

---

[১৯০] ঐ ১০।৬.৫-৮

করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বিদায় গ্রহণকালে রাজা সন্তোষ দত্ত নানা দ্রব্য দিয়ে সকলকে পরিতুষ্ট করলেন। খেতরীর উৎসবের এখানেই পরিসমাপ্তি।

ভক্তিরত্নাকর এবং নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্তী খেতরীর উৎসবের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে ও নির্দেশে এবং সমবেত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহান্তদের অনুমতি অনুসারে শ্রীনিবাসাচার্য প্রিয়াসহ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ রূপ গোস্বামীদের বর্ণিত বিধানানুসারে সম্পন্ন করেছিলেন। এর পর গৌরগুণকীর্তন সহযোগে বিধিবদ্ধ সংকীর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন নরোত্তম ঠাকুর। পূর্ব বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় এভাবে সংকীর্তনের পরামর্শ স্বয়ং আচার্য দিয়ে থাকবেন এবং তাঁর নির্দেশানুসারে গোবিন্দদাস গৌরগুণগানের পদগুলি রচনা করে থাকবেন। তাঁর রচিত পদে নরোত্তমের সঙ্গীতে এবং দেবীদাস আদি নরোত্তমশিষ্যগণের বাদ্যে এমন অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীর কাছে সগণ গৌরাঙ্গ যেন প্রত্যক্ষবৎ হয়েছিলেন।

এদিনে উৎসবের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেক। লক্ষ্য করতে হবে যে এদিন বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের রাধাসহ কৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে প্রতিষ্ঠাই নয়—কৃষ্ণের জন্ম-অভিষেকের বিধানানুযায়ী গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণকে সমমর্যাদায় স্থাপন করাও এই মহোৎসবের একটি বিরাট উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং তাঁদের অনুমতিক্রমে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার অর্থ তাঁদের এবিষয়ে পূর্ণ সমর্থন থাকা। শ্রীনিবাসাচার্যের নেতৃত্বে ইতিপূর্বের অনুষ্ঠানগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে প্রয়াস আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এখানে তার পূর্ণ সাফল্যের লক্ষণ বর্তমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যের যে ভিত্তি পূর্বের মহোৎসবগুলিতে স্থাপন করা হয়েছিল খেতরীর মহোৎসবে সেটি শুধু পাকা হলো না—বলা যেতে পারে এঁদের মধ্যে পার্থক্যের আর কোনও চিহ্ন রইল না।

খেতরীর মহোৎসবের পরবর্তী অঙ্গ হলো প্রতিপদের দিন বিগ্রহদের ভোগ দেওয়া। সেদিন জাহ্নবা দেবী স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করে এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। তারপর সকল মহান্তকে এক পংক্তিতে বসিয়ে জাহ্নবা দেবী কর্তৃক স্বহস্তে প্রসাদ পরিবেশন করাকেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে স্বীকার করতে হয়।

ডঃ ননাগোপাল গোস্বামী খেতরীর উৎসব প্রসঙ্গে লিখেছেন "যে মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত হয় তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই মহাধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ভক্তবৃন্দ সভাধিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃন্দাবন হইতে যে সব গ্রন্থ প্রচারের জন্য গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা লইয়া মোটামুটি আলোচনা করা হয়[১৯১]। বিগ্রহ স্থাপনের পর আবার কিছু সময় শাস্ত্রাদির আলাপ আলোচনা হইল। পরে অদ্বৈতাচার্য তন্ময় (!) অচ্যুত কীর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন[১৯২]। কীর্তন গানের আলোচনার পর তিনি আবার বলেছেন—

"খেতরির মহাধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

১। বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রচার ;

২। নব নব বিগ্রহাদি স্থাপন ;

৩। তীর্থ দর্শনাদি।

সভা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা[১৯৩]।"

ডঃ গোস্বামীর আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে খেতরীর উৎসবের বিবরণের জন্য তিনি প্রধানতঃ ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের ওপর নির্ভর করেছেন। এই দুই গ্রন্থের কোনও স্থানেই উৎসবের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহান্তদের শাস্ত্রালোচনার কোনও প্রসঙ্গ নেই, বৃন্দাবন থেকে প্রেরিত গ্রন্থ প্রচারের আলোচনা তো দূরের কথা। বিগ্রহ স্থাপনের পরও দেখা যাচ্ছে প্রসাদী মালাচন্দন গ্রহণের পরই সংকীর্তন আরম্ভ হলো। এখানেও শাস্ত্রালোচনা বা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হয় নি এই উৎসবে সর্বসম্মতিক্রমে যে তিনটি প্রস্তাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলিও এই গ্রন্থদ্বয়ের কোথাও নেই। মনে হচ্ছে তিনি ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খেতরীর উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কল্পিত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নরহরির বিবরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট গুলির মধ্যে—

প্রথমতঃ কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাবিগ্রহ স্থাপন। অনুরাগবল্লীর বর্ণনায় আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সাহায্যে বৃন্দাবনে মদনমোহন ও গোবিন্দের পাশে রাধামূর্তি বসানো হয়েছিল। বাংলা দেশে ইতিমধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাবিগ্রহ বসানো হয়েছিল বলে জানা যায় না। নরহরির এই উৎসবের বিবরণে আমরা প্রথম পাচ্ছি—

---

১৯১. চৈ. যু. গৌ. বৈ.-পৃ. ৫৬। ১৯২. ঐ পৃ. ৫৭। ১৯৩. ঐ পৃ. ৬২-৬৩।

কেহ শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণে কাণ্ড দিয়া।
দেখয়ে সে শোভা নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া[১২৪]॥

খেতরীর উৎসবের অপর বৈশিষ্ট্য হলো বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের মূর্তির প্রতিষ্ঠা। এতদিন কাটোয়ায় ও শ্রীখণ্ডে শুধুমাত্র গৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবদ্বীপেও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠা বোধহয় এই প্রথম।

এই উৎসবের অপর বৈশিষ্ট্য হলো রাধাকৃষ্ণের অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের একত্রে প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের মধ্যে ভেদ দূর করা এমনকি প্রিয়াসহ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গের মধ্যে ভেদ না রাখাই এই বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ভেদ একেবারে না রাখার জন্যই কৃষ্ণের জন্মাভিষেকের বিধানানুসারে গৌরাঙ্গের জন্মাভিষেক করা হয়।

খেতরীর উৎসবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই। গোস্বামীদের কৃত ব্যাখ্যা-সহযোগে ভাগবত পাঠের বিবরণ নরহরি দিয়েছেন কিন্তু তাঁদের বিধানানুযায়ী বিগ্রহ সেবার বিবরণ এই প্রথম পাওয়া গেল।

দেখা যাচ্ছে খেতরীর উৎসবের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাচ্ছি সেগুলির সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার ও বিধির সঙ্গেই সম্পর্ক বেশী। ডঃ গোস্বামীর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এতদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নিজ নিজ পথে ও মতে পূজাপার্বণাদির যে ব্যবস্থা চলে আসছিল খেতরীর উৎসবে সে সব পথ ত্যাগ করে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কৃত বিধানাদিকে স্বীকার করে সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে একটি সুনির্দিষ্ট বিধিতে আনা হলো। এঁরা যে শুধু এতে সম্মতি দিলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন তাই নয়। পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন তাঁদের নিজ নিজ স্থানে ভোগ প্রস্তুত করে নিবেদন করার বর্ণনার মধ্যেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে।—

কৃষ্ণে ভোগ দিয়া সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল।
শ্রীনিবাসাদিক সে কৌতুক নিরখিল[১২৫]॥

এই বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রতিটি গোষ্ঠী পৃথক পৃথক ভাবে গোস্বামীদের নির্দেশিত পথে কৃষ্ণে ভোগ সমর্পণ করেছিলেন। আচার্যের

---

[১২৪] ভ র. ১০।৬৪১ [১২৫] ভ. র. ১০।৭১৭

শিষ্যবৃন্দের কাজ ছিল এই কাজ প্রত্যক্ষ করা। এছাড়া এই বর্ণনার কোনও অর্থ নেই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা নিজ নিজ মত ও পথ অনুযায়ী ভোগ দিলে শ্রীনিবাসাদির তা নিরীক্ষণ করার কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না।

খেতরীর উৎসবের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে ডঃ গোস্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন "নবদ্বীপদাস রাধাকুণ্ডের ইতিহাসে দাস গোস্বামীর অপ্রকটকাল দেখাইয়াছেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় যে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দেই খেতরীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বছরই জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন গমন করেন। এই অনুমান ব্যতীত এই মহাধিবেশনের কাল নির্ণয়ের আর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নাই[১৯৬]।

একথা সত্য যে জাহ্নবা দেবী যখন বৃন্দাবন যান তখন দাস গোস্বামী প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তা থেকে বলা যায় না যে তিনি যে সময়ে তিরোহিত হয়েছিলেন সেই বৎসরেই জাহ্নবা দেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাছাড়া দাস গোস্বামীর তিরোভাবকাল সম্বন্ধে যে তারিখ ডঃ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন সেটি কোনও নির্ভরযোগ্য তারিখ নয়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গোবিন্দ দাসের দীক্ষা হয়েছিল। তাঁর দীক্ষার কয়েক দিনের মধ্যেই খেতরীর উৎসব সম্পন্ন হয়। কাজেই আমাদের হিসেবে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ খেতরীর উৎসব হয়েছিল। এরপর জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে গেলে দাস গোস্বামীকে চলচ্ছক্তিহীন দেখা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ডঃ গোস্বামীর হিসাব অনুযায়ী গোস্বামীর তিরোভাবকাল ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ ধরলেও এই দুই কালের মধ্যে পার্থক্য থাকে মাত্র তিন বৎসর। একজনের পক্ষে তিন বৎসর অথর্ব অবস্থায় বর্তমান থাকা অসম্ভব নয়। কাজেই প্রমাণাভাবে যে বৎসর তাঁর দেহত্যাগ হয়েছিল সেই বৎসরই জাহ্নবা দেবী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এই যুক্তিকে আমরা স্বীকার করতে পারছি না।

প্রেমবিলাসে খেতরীর উৎসবের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় গোবিন্দদাসের দীক্ষার সময় নরোত্তম ঠাকুর আচার্যের বুধরী আগমন বার্তা শুনলেন। তখন তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করে আচার্যের কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে উৎসবের কথা স্থির করা হলো। ঠাকুর

---

[১৯৬] চৈ. যু. গৌ বৈ. -পৃ. ৬৪

মহাশয় তাড়াতাড়ি খেতরীতে ফিরে এসে—

আনেন গৌরাঙ্গ প্রকাশের তরে ॥
নবীন আবাস ঘর অনেক হইল।
হেনকালে আচার্য-ঠাকুর গমন করিল[১৯৭] ॥

যথাকালে চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হলো। নিমন্ত্রিতরা সকলে একত্র হলেন। স্নানাভিষেকের পর সকল মহান্ত মিলে বিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করলেন। চন্দন ও তুলসীমালা অর্পণের পর কীর্তন আরম্ভ হলো; কীর্তনে সকলের নৃত্য দেখে "ঠাকুর মহাশয় দেখি শুনি স্তব্ধপ্রায়।" তারপর তিনিও নৃত্য আরম্ভ করলেন। তাঁর শরীরে ভাবের বিকার দেখে স্বগণ সহিত কৃষ্ণানন্দ মজুমদার—

ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখ পানে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে ধরিঞা চরণে[১৯৮] ॥

শুধু তাই নয়—

যখন কীর্তনে সব লাগিলেন দিতে।
ঘর হৈতে আনি দেয় যে পড়য়ে হাতে॥
ঠাকুর মহাশয় তাহা কিছুই না জানে।
কিবা কহিব প্রেম কিবা বা বাখানে॥
নাচিবার কথা রহু দাণ্ডাইলা যখনে।
যেন গৌরাঙ্গ তেন রূপ ভাবে মনে মনে॥
প্রেমাবেশে ফিরিয়া নেহারে যার পানে।
সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে[১৯৯] ॥

এরপর মহোৎসব সম্পূর্ণ হবার দিন ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুলদাস প্রথমে গৌরাঙ্গগুণ ও পরে কৃষ্ণলীলা গান করলেন। গান শুনে ঠাকুর মহাশয় তাকে আলিঙ্গন করে ভূমিতে পড়লেন। বারবার বলতে লাগলেন "গোকুল আকুল কৈল কিবা শুনাইয়া।" এভাবে দ্বিতীয় প্রহর পযন্ত তাঁর নৃত্য চলল। শ্রীরূপের উজ্জ্বলের শ্লোক পড়েও তাঁর ভাব ভঙ্গ হলো না। ঘরে নিয়ে শোয়ানোর পর প্রহর খানেক বাদে তিনি সুস্থ হলেন।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনার তুলনায় প্রেমবিলাসের বর্ণনায় কষ্টকল্পনা ও অসঙ্গতি অনেক বেশী। বিশেষতঃ যেখানে গ্রন্থকার নিজেকে শ্রীনিবাসাচার্যের

---

[১৯৭] ন. বি. ১৪বি। [১৯৮] ঐ [১৯৯] ঐ

সমসাময়িক বলে দাবী করছেন সেখানে এই বর্ণনা বিস্ময়কর এইজন্য যে ভক্তিরত্নাকরকার ঘটনার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে লিখেও এই উৎসবে জাহ্নবা দেবীর প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রেমবিলাসকার সেই জাহ্নবা দেবীর শিষ্য হয়েও এখানে তাঁর উল্লেখ করেন নি। খেতরীর উৎসবের প্রধান প্রধান যে সব বৈশিষ্ট্য ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে এই গ্রন্থের বণনায় তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং এমন সব কথার উল্লেখ আছে যা অসম্ভব এবং অবাস্তব বলা চলে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি গোবিন্দদাসের দীক্ষা এবং খেতরীর উৎসবের মধ্যে পার্থক্য মাত্র কয়েক দিনের। এ থেকে বোঝা যায় আচার্যকে জানানোর পূর্বে নরোত্তম উৎসবের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। বাস্তবে একথাই সম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু প্রেমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে আচার্যের সঙ্গে কথা বলার পর নরোত্তম বিগ্রহ প্রস্তুত করানো আরম্ভ করেন—যা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করা কোনও মতেই সম্ভব নয়।

সবচেয়ে আশ্চযের কথা হলো কীর্তনে নরোত্তমের কোনও অংশ ছিল বলে এই গ্রন্থের বণনা পড়ে মনে হয় না। অথচ 'গরাণহাটি কীর্তনের প্রবর্তক হলেন স্বয়ং নরোত্তম। এই উৎসবেই বিধিবদ্ধ কীতনের প্রথম প্রকাশ। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কীর্তনে অংশগ্রহণ না করে শুধুমাত্র ভাবপ্রকাশ করলেন—এই বণনা গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিক থেকে নরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনা অনেক স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য। নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তাও স্বীকার করা যেতে পারে না।

খেতরীর উৎসবের বণনার সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গ শেষ হলো। একাদশ তরঙ্গ জাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন ভ্রমণের বণনায় পূর্ণ। দ্বাদশ তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই দুই তরঙ্গে আচার্যের জীবনীর কোনও উপকরণ পাওয়া যায় না।

ভক্তিরত্নাকরের ত্রয়োদশ তরঙ্গের বণনায় দেখা যায় নবদ্বীপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা যাজিগ্রাম ফিরে আসেন এবং বীর হাম্বীর সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এমন সময় খড়দহ থেকে সংবাদ আসে যে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে যে রাধিকাবিগ্রহ পাঠাচ্ছেন সেটি কাটোয়ার ঘাটে এসে পৌঁছচ্ছে। সংবাদ পেয়ে আচার্য সশিষ্য সেখানে উপস্থিত হন এবং কিছু বস্ত্রালঙ্কার এবং হাম্বীর কর্তৃক প্রদত্ত এক হাজার মুদ্রা বিগ্রহের সঙ্গে বৃন্দাবন

পাঠিয়ে দেন। এরপর বিষ্ণুপুর যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে আচার্য রাজাকে দেশে পাঠিয়ে দেন এবং রঘুনন্দনের আদেশ নিয়ে খেতরী গমন করেন। রঘুনন্দনের নির্দেশে তিনি অল্পকালের মধ্যেই দেশে ফিরে আসেন এবং শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন। সেখানে আচার্যের উপস্থিতিকালে রঘুনন্দন শ্রাবণের শুক্লা চতুর্থী দিবসে দেহত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধান-মহোৎসব শেষ করে আচার্য বিষ্ণুপুর আসেন এবং সেখানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এরপর বিষ্ণুপুরে কিছুকাল থেকে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে আসার পর পরমেশ্বরী দাস যাজিগ্রাম এসে বৃন্দাবনে রাধিকাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সংবাদ দেন। এরপর জাহ্নবা দেবীর আদেশে পরমেশ্বরীদাস আঠপুর গ্রামে রাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন।

ভক্তিরত্নাকরে এরপর বীরচন্দ্রের বিবাহ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিবাহের পর জাহ্নবা দেবী পুনরায় বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসার পর বীরচন্দ্র নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, বুধরী ও খেতরী হয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর লেখা চারটি পত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি আচার্যকে লেখা। তৃতীয়টি রামচন্দ্র, নরোত্তম ও গোবিন্দদাসকে লেখা এবং চতুর্থটি গোবিন্দদাস কবিরাজকে লেখা। এরপর শ্রীনিবাসাচার্য কর্তৃক বোরাকুলি গ্রামে তাঁর শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তীর গৃহে রাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিরাট মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। বীরচন্দ্র কর্তৃক আচার্যকে লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী প্রসঙ্গ শেষ করা হয়েছে।

শ্রীনিবাসাচাযের জীবনের এই অংশের কিছু বিবরণ অনুরাগবল্লীতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে আচাযের পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে বংশরক্ষার্থে তিনি আবার বিবাহ করেন। এছাড়া তাঁর তৃতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার কথাও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। এই গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এসময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবনদাস এবং রামচন্দ্র কবিরাজ।

আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ-প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরে থাকলেও তার কারণ হিসাবে অনুরাগবল্লীতে যা বলা হয়েছে তার সমর্থনে এই গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায়

না। আচার্যের তৃতীয়বার বৃন্দাবনে গমনের প্রসঙ্গেও এই গ্রন্থে কিছু বলা নেই।

ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের তৃতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা সম্বন্ধে কিছু না বলা থাকলেও নরোত্তমবিলাসে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তবে সেখানে ঘটনার বিবরণের যে ক্রম দেওয়া আছে তা' থেকে মনে হয় যে আচার্য তাঁর শেষ জীবনে একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের শেষ জীবনের ঘটনাবলীর কালনির্ণয় করার সময় তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলির বর্ণনার অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থে ঘটনা ও কাল সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। এই অসঙ্গতি হয়তো নির্ণয় করা সম্ভব হতো না যদি না ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের পত্রগুলি উদ্ধৃত করা হতো। অনুরাগবল্লীতে আচার্যপুত্র বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে দুটি উক্তি এবং শ্রীজীবের একটি পত্রে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখের সাহায্যে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনীগ্রন্থগুলিতে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর অসঙ্গতি কোথায় বর্তমানে তা' আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এই বিবরণ থেকে অনুমান হয় শ্রীনিবাসাচার্য যখন তৃতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করেন তখন বৃন্দাবনদাসের বয়স কমপক্ষে ১৪ বৎসর ছিল, কারণ এর চেয়ে কম বয়সের বালকের পক্ষে পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন যাওয়া সম্ভব নয়। এরপর আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবন ও দ্বিতীয়পুত্র রাধাবল্লভ মারা গেলে আচার্য পুনরায় বিবাহ করলেন। এই বিবরণ থেকে কাল নির্ণয় করা কঠিন। তা নির্ণয়ের সূত্র হলো শ্রীজীবের পত্র। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত প্রথম পত্রে দেখা যাচ্ছে তিনি আচার্যকে লিখেছেন "স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি ন বেত্যপি" (স্বজনগণের বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাসের কুশল লিখবেন। সে কিছু পড়াশুনা করছে কি না জানাবেন)। শাস্ত্রানুযায়ী সেকালে পাঠারম্ভ হতো পাঁচ বৎসর বয়সে। এই পত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে এসময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স ৬।৭ বৎসরের বেশী হবে না।

এই পত্রে তারিখ লেখা না থাকলেও পত্র লেখার কাল নির্ণয়ের সম্ভাবনা আছে গোপালচম্পূর উত্তরভাগের উল্লেখ থেকে। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে এই গ্রন্থটির সংশোধনকার্য বাকী আছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল হলো ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে

শ্রীজীব এই পত্র ১৫৯০।৯১ খৃষ্টাব্দে লিখে থাকবেন। সে সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স ৬।৭ বৎসর হলে বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৫৮৪।৮৫ খৃষ্টাব্দ হওয়া উচিত এবং ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার উপযুক্ত হন। এবার অনুরাগবল্লীর বিবরণানুযায়ী ধরে নিতে হয় শ্রীনিবাসাচার্য ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তৃতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তারপর দেশে আসার ২।৩ বৎসরের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র মারা গিয়ে থাকলেও শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের আগে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নানা কারণে এই সময়ে তাঁর বিবাহের কথা স্বীকার করা যায় না—প্রথমতঃ এসময়ে তাঁর বয়স ৮০ বৎসরের কাছে হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে আচার্য গতিগোবিন্দকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কমপক্ষে ১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। অনুরাগবল্লীর বিবরণানুযায়ী গতিগোবিন্দের জন্ম ১৬০৩।৪ খৃষ্টাব্দে হলে তাঁকে দীক্ষা দিতে আচার্যের ১৬১৭।১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১০০ বৎসর বেঁচে থাকতে হয়। সেই হিসাবেও অনুরাগবল্লী নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ শ্রীজীবের পত্রের তারিখে ২।১ বৎসরের পার্থক্য হলেও আলোচ্য ঘটনাবলীর কাল এর বেশী পরে নেওয়া যেতে পারে না। এসব কারণে অনুরাগবল্লীর বিবরণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না।

দুই পুত্রের মৃত্যুর পর আচার্য বংশরক্ষার্থে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন এই যুক্তিকে স্বীকার করার অপর বাধা হলো নরোত্তমবিলাসের একটি বিবরণ। এই গ্রন্থের একাদশ বিলাসে দেখা যাচ্ছে একবার বীরচন্দ্র গোস্বামী যাজিগ্রাম এলে আচার্যের তিন পুত্র ও তিন কন্যা তাঁকে প্রণাম করেন। নরহরি অনুরাগবল্লীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহের কারণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা তিনি জানতেন বলে ধরে নেওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও নরোত্তমবিলাসে যখন তিনি আচার্যের তিন পুত্রের একত্রে বীরচন্দ্রকে প্রণাম করার কথা উল্লেখ করেছেন তখন ধরে নিতে হবে যে তিনি এবিষয়ে বিশেষভাবে না জেনে একথা বলেন নি। সে কারণে নরহরি চক্রবর্তীর এই বিবরণকে বিশেষ প্রমাণ ছাড়া অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

নানা দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় মনোহরদাসের বিবৃতিকে খানিকটা পরিবর্তন করে নিলে সব দিক রক্ষা করা যেতে পারে। পুত্রদ্বয়ের অপ্রকটের পর আচার্য বংশরক্ষার্থে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন বললে সঙ্গতি থাকে না। মনে হয় বহুদিন পর্যন্ত পুত্রসন্তান লাভ না করায় তিনি বংশরক্ষার্থে

সকলের অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর প্রথমা পত্নী দুটি পুত্রের জন্ম দিলেও দ্বিতীয়া পত্নীর কোনও সন্তান অনেক দিন হয় নি। শ্রীজীবের পত্রানুযায়ী বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল আমরা ১৫৮৪।৮৫ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছি। সেই হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে আচার্য তারও পূর্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন এবং এই বিবাহ হয়েছিল রঘুনন্দনের দেহত্যাগের পর। এবার তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভক্তিরত্নাকরে খেতরীর উৎসবের পরবর্তী ঘটনাবলীর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় এই উৎসবের পর জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন যাত্রা করলেন এবং আচার্যও নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজকে নিয়ে নবদ্বীপ পরিক্রমায় বার হলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলেন জাহ্নবা দেবী দেশে ফিরে এসে বৃন্দাবনের গোপীনাথের জন্য রাধিকা মূর্তি প্রস্তুত করিয়ে সেখানে পাঠাচ্ছেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে খেতরীর মহোৎসব হয়ে থাকলে এবং এই বৎসরের শেষে কিংবা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই বিগ্রহ প্রস্তুত করে পাঠানো সম্ভব নয়। এর পর দিনকতকের জন্য আচার্য খেতরী হয়ে শ্রীখণ্ড ফিরে আসেন এবং সে সময় অর্থাৎ শ্রাবণমাসের শুক্লা চতুর্থীতে রঘুনন্দনের তিরোভাব হয়। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি রাধাবিগ্রহ বৃন্দাবন পাঠানো হয়ে থাকলে তার দুএক মাসের মধ্যেই রঘুনন্দনের দেহত্যাগ হয়েছিল অনুমান করা অযৌক্তিক হয় না। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় রঘুনন্দনের জন্মকাল অনুমান করেছেন ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ[২০০]। সেই হিসেবে দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয় ৮৫ বৎসর। বয়সের দিক থেকে বিচার করলে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দকে তাঁর দেহত্যাগের কাল ধরলে অসঙ্গত হয় না। রঘুনন্দনের তিরোভাবের পর মহোৎসব সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আচার্য শ্রীখণ্ডে ছিলেন। উৎসবান্তে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষে কিংবা ভাদ্রের প্রথমে অর্থাৎ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস নাগাদ আচার্য দেশে ফিরে আসেন এবং দিনকতক যাজিগ্রামে অবস্থান করে বিষ্ণুপুরে যান।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণের ক্রম অনুযায়ী অনুমান করে নেওয়া যায় যে শ্রীনিবাসাচার্য এসময়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পরমেশ্বরী দাসের বৃন্দাবন

---

[২০০] ম. যু. বা. সা. ভ. কা. - পৃ. ৫০

থেকে ফিরে আসার পূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল বলে ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে অনুমান হয়। এই গ্রন্থের বিবরণে দেখা যাচ্ছে পরমেশ্বরী গৌড় থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করেছিলেন। এই যাতায়াতে কমপক্ষে এক-বছর সময় লাগা উচিত। সেই হিসেবে পরমেশ্বরী ১৫৮১ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে আচার্য ১৫৮০।৮১ খৃস্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে থাকবেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহের কারণ হিসেবে অনুরাগবল্লীতে যা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আচার্য আনুমানিক ১৫৭২ খৃস্টাব্দে প্রথমবার বিবাহ করেছিলেন বলে আমরা অনুমান করেছি। মনে হয় ইতিমধ্যে তাঁর চার কন্যা হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কাঞ্চন ও যমুনার জন্ম হয়ে থাকবে। পুত্রসন্তান না হওয়ায় বংশরক্ষার্থ সকলের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—এটাই ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

অনুরাগবল্লীর বিবরণ এবং আচার্যের কয়েকটি বংশতালিকা থেকে মনে হয় বৃন্দাবন দাস ও রাধাবল্লভ দাস যথাক্রমে আচার্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান। কন্যারা এঁদের পরবর্তী সন্তান এবং গতিগোবিন্দ এঁদের সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু আচার্যের কন্যারা যে পুত্রদের চেয়ে বয়সে বড় সে বিষয়ে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের আগে হওয় সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাধাবল্লভের জন্মকাল ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের আগে হয় না। অনুরাগবল্লী প্রভৃতির বর্ণনার ক্রম অনুযায়ী মেয়েদের জন্মকাল তারও পরে অর্থাৎ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পর। এই হিসেবে কনিষ্ঠা কন্যার জন্মকাল ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু তখন আচার্যের বয়স প্রায় ৮৫ বৎসর হয়। এত বয়সে তাঁর সন্তান হয়েছিল বলে স্বীকার করা যায় না।

কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনানুযায়ী আচার্য হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনকে দীক্ষা দান করেছিলেন। কমপক্ষে ১৪ বৎসরের আগে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। সেই হিসেবে কাঞ্চনের দীক্ষাকাল ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হয় না। কিন্তু আচার্য এতদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এসব কারণে মনে হয় আচার্যের কন্যারা পুত্রদের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে থাকবেন এবং প্রথমবার বিবাহাবধি পুত্র-সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে থাকবেন।

অনুরাগবল্লীতে আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রসঙ্গ থাকলেও বিস্তৃত বিবরণ কিছু নেই। কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম

জানা যায় গৌরাঙ্গপ্রিয়া। ভক্তিরত্নাকরে আরও জানা যায় আচার্যের দ্বিতীয় শ্বশুর মহাশয়ের নাম রঘুনাথ অথবা রাঘব চক্রবর্তী এবং শাশুড়ীর নাম মাধবী। তাঁরা রাঢ় দেশের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরের পরবর্তী বিবরণে দেখা যাচ্ছে বিবাহান্তে আচার্য যাজিগ্রাম ফিরে এলে পরমেশ্বরী দাস বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি খড়দহে গিয়ে জাহ্নবা দেবীর কাছে পৌঁছলে তাঁর নির্দেশে তিনি আঠপুরে রাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। এই বিবরণ স্বীকার করে নিলে আঠপুরের অনুষ্ঠান ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হয় না।

জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে তাঁর অনুমতি নিয়ে বীরচন্দ্র বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার পথে খেতরী ও যাজিগ্রাম সহ গৌড়ের নানাস্থান ভ্রমণ করেন। আমাদের হিসাব অনুযায়ী ১৫৮৫।৮৬ খৃস্টাব্দের পূর্বে তিনি বৃন্দাবন গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সে সময় বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়ে থাকলেও এই কয় বৎসরের মধ্যে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার কোনও সন্তান হয় নি। বীরচন্দ্রের যাজিগ্রাম ভ্রমণের পর গতিগোবিন্দের জন্ম হওয়ায় কিংবদন্তী প্রচলিত হয়ে থাকবে যে বীরচন্দ্রের আশীর্বাদে তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাধাবল্লভ ঈশ্বরী দেবীর পুত্র। কাজেই গতিগোবিন্দের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য কয়েক মাসের হওয়া অসম্ভব নয়।

গতিগোবিন্দের জন্মকাল ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের পর হওয়া সম্ভব নয় বলে অনুমান করা যায়। কারণ তিনি আচার্য কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। সে সময়ে তাঁর বয়স যদি ১৪ বৎসর ধরা যায় তবে তাঁর দীক্ষাকাল ১৬০১ খৃষ্টাব্দের পর হয় না। আচার্য এতদিন জীবিত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত আচার্যের শিষ্য-তালিকার মধ্যে বৃন্দাবনদাস, রাধাবল্লভ ও যমুনার নাম নেই। এঁদের কারুই বিবাহ হয়েছিল বলেও জানা যায় না। কাজেই দীক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত বয়স হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়স হওয়ার আগেই তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেন—একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে ইহলোক ত্যাগ করায় পরবর্তীকালে ধারণা হয়ে থাকবে যে তাঁদের, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর আচার্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। যমুনা খুবই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় একমাত্র অনুরাগবল্লী ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের তৃতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়ার কোনও বর্ণনা নেই। এই যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় অনুরাগবল্লীতে। নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তমবিলাসে এই যাত্রার কথা সমর্থন করেছেন কিন্তু যাত্রাকাল সম্বন্ধে কোনও তথ্য দিতে পারেন নি। কাজেই আচার্য যে তৃতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যা থেকে যায় যে তিনি কোন্ সময়ে গিয়েছিলেন ?

ইতিপূর্বে ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন উপলক্ষে আমরা দেখেছি আচার্য শ্রীজীবের কাছে গোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনেছিলেন। তখন আমরা হিসাব করে দেখেছি যে এ সময়ে গোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ হওয়া সম্ভব নয়। গোপালচম্পূর পূর্বভাগ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে এবং উত্তরার্ধ ১৫৯২ খৃস্টাব্দে। এই হিসাব অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় উত্তরার্ধ লিখতে শ্রীজীবের ৩ বৎসর লেগেছিল। সেই হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে পূর্বার্ধ রচনারম্ভ ১৫৮৬ খৃস্টাব্দ হতে পারে। আচার্য এসময় তৃতীয়বার বৃন্দাবন গিয়ে থাকলে এই গ্রন্থারম্ভ শুনে থাকতে পারেন। কাজেই এই বিচারে মনে হয় আচার্য ১৫৮৬ খৃস্টাব্দ নাগাদ তৃতীয়বার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী এই সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স ২ বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে এ সময়ে বৃন্দাবনদাসকে নিয়ে আচার্যের বৃন্দাবন যাওয়ার কথা নয়। তবে তিনি যদি সস্ত্রীক কোনও যানবাহন নিয়ে বৃন্দাবন গিয়ে থাকেন তবে বৃন্দাবনদাসকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ অনুযায়ী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণ স্বয়ং শ্রীজীব গোস্বামী[২০১] করেন। দীর্ঘদিন পর পুত্র লাভ করায় শ্রীজীবের আশীর্বাদ লাভের জন্য আচার্য তাঁকে শিশুকালেই বৃন্দাবন নিয়ে গিয়েছিলেন মনে করা অযৌক্তিক নয়।

আচার্যের পরবর্তী জীবনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হিসেবে বোরাকুলিতে আচার্য-শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তীর গৃহে রাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়। এই উৎসবে উপস্থিত মহান্তদের যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে খেতরীতে উপস্থিত মহান্তদের অনেকেই অনুপস্থিত। এঁদের মধ্যে অদ্বৈততনয় অচ্যুতের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে

[২০১] ভ. র. ১৩।২০

উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী অচ্যুতের জন্মকাল ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ[২০২]। বোঝা যাচ্ছে খেতুরীর উৎসবের সময় হয় তিনি বর্তমান ছিলেন না কিংবা তাঁর এত বয়স হয়েছিল যে যাতায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পর এই উৎসব হয়ে থাকলে অচ্যুতের বয়স হয় ৮৭ বৎসর। এই বয়সে বর্তমান থাকলেও তাঁর পক্ষে যাতায়াত সুকঠিন। কাজেই তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই কৃষ্ণমিশ্র উপস্থিত ছিলেন। এ সময় চৈতন্য-পরিকর কারুরই বর্তমান থাকার কথা নয় সেজন্য শ্রীপতি শ্রীনিধিদের নাম এখানে পাওয়া যায় না। এমনকি হৃদয়চৈতন্যও তখন বর্তমান ছিলেন কি তা সন্দেহ। কালনা থেকে তাঁর শিষ্য গোপীরমণ এসেছিলেন বলে ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ১৪৯৭।৯৮ খৃষ্টাব্দে এই উৎসব হয়ে থাকবে। মনে হয় আচার্যের জীবনে এটিই শেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

আচার্য কতকাল বেঁচেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি। পুলিনবিহারী দাস "বৃন্দাবন কথা"য় লিখেছেন যে তিনি আচার্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি থেকে জেনেছেন যে আচার্যের ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিরোধান হয়েছিল। আমাদের হিসেবে তাঁর জন্মের সময় ঠিক আছে। কাজেই এই ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ তাঁর তিরোধান-কাল ধরে নিতে পারি। কার্তিকী শুক্লাষ্টমীতে চাকন্দিতে এখনও শ্রীনিবাসাচার্যের তিরোভাব-উৎসব পালিত হয়। এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বা নভেম্বরের কোনও এক দিনে শ্রীনিবাসাচার্য দেহত্যাগ করেছিলেন।

---

২০২. ম. যু. বা. সা. ও বা. - ৪০

। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বাংলা দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংগঠনে শ্রীনিবাসাচার্যের ভূমিকা

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনা করে দেখা গেল প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর তিনি প্রথমে শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছ থেকে তিনি যেসব গ্রন্থ এনেছিলেন সেগুলির পঠনপাঠন এবং তাঁদের মতানুযায়ী সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পরও একমাত্র গদাধর দাস এবং নরহরি সরকার ছাড়া তাঁর অন্যান্য চৈতন্য-পরিকর ও তাঁদের গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল বলে কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হলো কাটোয়ায় গদাধর দাসের তিরোধান-মহোৎসব উপলক্ষ্যে। এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হলো কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোধান-মহোৎসবের মধ্য দিয়ে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে এই দুটি মহোৎসব অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম মহোৎসবে সকল গোষ্ঠীর মহান্তগণ একত্রে মিলিত হলেন এবং একত্রে ছিলেন শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের শেষ পর্যন্ত। এই দুই মহোৎসবের মধ্যে তাঁরা সকলে যাজিগ্রামে আচার্যের গৃহেও কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে কাটোয়ার মহোৎসবের সময় বৃন্দাবন-প্রত্যাগত শ্রীনিবাসাচার্যের সঙ্গে গৌড়ীয় মহান্তদের প্রথম পরিচয়ের যে সুযোগ হয় সেটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার সঙ্গে একত্রে থাকার ফলে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন তার পরিচয় ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে পাওয়া যায়। দেখা যায় শ্রীখণ্ডে বিদায়-কালে সকলে তাঁকে তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে যাচ্ছেন।

এই দুই মহোৎসবের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একটি মহৎ উপকার সাধিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। শ্রীখণ্ডের উৎসবের বিবরণে দেখা যায় মহান্তদের ইচ্ছানুসারে আচার্য সেখানে ভাগবত পাঠ করেছিলেন এবং গোস্বামীদের মতে তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। গৌড়ীয় মহান্তগণ কর্তৃক বৃন্দাবনের গোস্বামী-কৃত ব্যাখ্যা শোনার বিবরণ এই প্রথম। বিস্তৃতভাবে বলা না হলেও

আশা করা যায় তাঁরা যখন আচার্যগৃহে অতিথি ছিলেন তখনও গোস্বামী-মতের ব্যাখ্যা আচার্যের কাছে শুনে থাকবেন। গোস্বামী-কৃত গ্রন্থাদি ও তাঁদের ব্যাখ্যায় এঁরা সকলে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। তাই শ্রীখণ্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগবত পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের পরবর্তী সাফল্য দেখা গেল খেতরীর মহোৎসবে। নরহরি চক্রবর্তীর দুই গ্রন্থের বিবরণে দেখা গিয়েছে আচার্য এখানে সমবেত সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে ও তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে গোস্বামীদের নির্দেশমত বিধি নিয়মানুযায়ী গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণের কয়েকটি বিগ্রহের যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরই দেখা গেল নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী তথা তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেত্রীস্থানীয়া নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে গোপীনাথের জন্য বাংলা দেশ থেকে রাধিকার বিগ্রহ পাঠাচ্ছেন। তারপর তাঁর নির্দেশে আঠপুরে পরমেশ্বরী দাস কর্তৃক যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা হলো। আচার্যও তাঁর শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাসগৃহে বোরাকুলিতে যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবন এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে তাঁর কৃতিত্ব এবং সাফল্য সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। তবে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র কর্তৃক তাঁকে লেখা একটি চিঠি থেকে এ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে বীরচন্দ্র আচার্যকে লিখেছেন—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি—শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিদ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংবাদি গ্রন্থবিস্তারং করোতি[১]।

বীরচন্দ্রের এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় হরিদাস দাস বাবাজী প্রকাশিত শ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালায় কলানিধি চট্টরাজের রচিত বলে বর্ণিত আদেশামৃতস্তোত্রমে। এই স্তোত্রের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে নীলাচলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সংবাদ শুনে শ্রীনিবাস যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন তখন চৈতন্যদেব তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন—"ত্বত্তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যোতি"; পরবর্তীকালে এই ধারণা কত বিস্তৃতিলাভ করেছিল তার

---

[১] ভ. র· তরঙ্গ. ৬০৮ পৃ.

প্রমাণ পাওয়া যায় প্রেমবিলাসের প্রথম বিলাসে আচার্যের জন্মগ্রহণের ভূমিকা বর্ণনায়। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে আচার্যের ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব সেকালে সকলে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে তাঁকে চৈতন্যদেবের অংশ-সম্ভূত বলে স্বীকার করেছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে রূপ আমরা বাংলা দেশে দেখতে পাই সেই রূপদানের মূলে শ্রীনিবাসাচার্যের কৃতিত্ব এতখানি যে তাঁকে চৈতন্যদেবের অংশ-সম্ভূত বলে স্বীকার করতে সকলে দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ করা এযুগে কঠিন কাজ। তাঁর জীবনী আলোচনাকালে তাঁর কার্যকলাপের যে সামান্য অংশ আমরা দেখতে পেলাম তা থেকেও তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা দুঃসাধ্য। একমাত্র তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই মূল্যায়ন করার পূর্বে চৈতন্য-পূর্ব যুগ ও চৈতন্য-যুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণবদের ইতিহাস ও আচরণ-বিধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগে এদেশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্যায়ে আচার্যের কার্যকলাপ আলোচনা করলে তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে;

চৈতন্য-পূর্ব যুগে বাংলা দেশের অবস্থা কি ছিল তার খানিকটা বিবরণ বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসময়ের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় যে ধর্মকর্ম বলতে সেকালের লোকের ধারণা ছিল কিছু আচরণ-বিধির। এই ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞাদির সঙ্গে সাধারণের মনের কোনও যোগ ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ছিল মঙ্গলচণ্ডীর গানে, মনসার এবং বাশুলীর পূজায়। লোকে মদ্যমাংস দিয়ে যক্ষ পূজাও করত। পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পড়তেন কিন্তু তাঁদের গ্রন্থানুভব ছিল না। গীতা ভাগবত পড়া হতো কিন্তু তার যথার্থ ব্যাখ্যা তাঁরা করতে জানতেন না। এসব গ্রন্থের মধ্যে যে ভক্তির স্রোত আছে তার মধ্যে তাঁরা অবগাহন করতে পারতেন না।

চৈতন্যভাগবতে এই শ্রেণীর লোককে বহুবার "পাষণ্ডী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন অবস্থার যে বিবরণ বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে 'নাস্তিক' এই অর্থে তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেন নি। পাষণ্ডী শব্দের অপর অর্থ হলো "নানাব্রতধরাঃ নানাবেশাঃ পাষণ্ডিনো মতাঃ"[২]।

---

[২] বঙ্গীয় শব্দকোষ

বৃন্দাবনদাসের বিবরণ ও এই অর্থে আলোচ্য শব্দটির ব্যবহার থেকে তৎকালীন সমাজের মোটামুটি একটি চিত্র কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে সেকালে সাধারণ লোকে শ্রুতি ও স্মৃতির অনুশাসনের ওপর নির্ভর করতেন। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দিকে যতটা নজর ছিল ততটা আন্তরিক অনুভূতির দিকে নজর ছিল না। মঙ্গলচণ্ডীর গান কিংবা মনসা ও বাশুলীর পূজা প্রভৃতির দিকে অত্যধিক নজর দেওয়ার কারণ হলো খানিকটা তৎকালীন প্রচলিত লোকাচার এবং অন্তরের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভক্তির চেয়েও ভয়ের আধিক্যে এসব পূজা করা হতো বলে অনুমান করা যেতে পারে; মদ্যমাংস সহযোগে পূজা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে যে তৎকালে তন্ত্রের প্রভাব এদেশে যথেষ্ট ছিল। এই প্রভাবের দুটি কারণ থাকতে পারে—প্রথমতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে এসবের যথেষ্ট ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রের সাহায্যে সহজে ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ লাভ করার চেষ্টা।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত বিবরণে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিষ্ণু সেকালে বাংলা দেশে একবারে অপরিচিত ছিলেন না। বিবরণে দেখা যাচ্ছে কিছু লোকে 'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করে এবং গীতা ভাগবত পড়ে; কিন্তু এই বৈষ্ণবদের মনে ভক্তির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। সেকালের প্রভাবে তাঁরা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ওপরই নির্ভর করতেন। গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং আলোচনাও যে হতো না তা নয় কিন্তু তার মধ্যে ভক্তির চেয়ে পাণ্ডিত্যের প্রকাশই বেশি হত। অর্থাৎ বৈষ্ণব সমেত সকল ধর্মাশ্রয়ীর ধর্মের ব্যাপারে আন্তরিকতার চেয়ে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের দিকে বেশী নজর ছিল।

দেশের আপামর জনসাধারণের এই নৈরাশ্যজনক চিত্রের মধ্যেও সামান্য আশার আলোক যে ছিল না তা নয়। নবদ্বীপে সেসময়ে এই শ্রেণীর পণ্ডিত ও ধার্মিকের প্রাধান্য সত্ত্বেও সে সময়ে বৈষ্ণবদের ছোট একটি গোষ্ঠী সেখানে গড়ে উঠেছিল যাঁরা অন্তরের সঙ্গে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান ও কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করতেন অদ্বৈত আচার্য এবং এঁদের মিলনস্থল ছিল শ্রীবাস অঙ্গন।

তৎকালে নবদ্বীপে এই যুগধর্ম বিরুদ্ধ পরিবেশে কি করে গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না। এমনকি অদ্বৈতাচার্য এবং তাঁদের সঙ্গীদের জীবনী সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। তবে অদ্বৈতাচার্যের এই কৃষ্ণভক্তির মূলে তাঁর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন এবিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নেই। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য এই জ্ঞানে ।
আচার্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে[৩] ॥

এই মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শান্তিপুরে। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে নবদ্বীপ থেকে রেমুনা যাওয়ার পথে মাধবেন্দ্র শান্তিপুরে এসেছিলেন। সে সময় মাধবেন্দ্রের প্রেম দেখে অদ্বৈতাচার্য মুগ্ধ হন এবং মাধবেন্দ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

চৈতন্যদেবের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেম সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে পরবর্তীকালে বিরাট কৃষ্ণপ্রেমী বৈষ্ণবসমাজের সৃষ্টি করেছিল তার প্রথম অঙ্কুর এই মাধবেন্দ্র পুরীর মধ্যেই ছিল বলে স্বীকার করা হয়েছে।—

জয় শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অঙ্কুর[৪] ॥

মাধবেন্দ্র ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর বলেই তাঁর ভক্তির যে বীজ সুপ্ত ছিল তার প্রকাশ তখনও বিশেষভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করলেও তাঁর প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ অদ্বৈত ছাড়া এদিকে তাঁর আর কোনও গৃহী শিষ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে বলা হয়েছে গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁর শিষ্য ছিলেন কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ছাড়া এই বক্তব্য স্বীকার করা যায় না। মাধবেন্দ্র পুরীর অপর শিষ্য ঈশ্বর পুরী বাঙ্গালী হলেও সন্ন্যাসী ছিলেন এবং রাজগৃহে থাকতেন :

অদ্বৈত আচার্যকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণভক্তের যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁরা তৎকালীন নবদ্বীপের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। যখন সকল লোকে পার্থিব সুখসম্পদ নিয়ে মত্ত এবং ধর্মের নামে লোকাচার ও কিছু আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সন্তুষ্ট, তখন এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী "দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়" কৃষ্ণকথা আলাপ এবং কীর্তনে সময় অতিবাহিত করতেন।

অদ্বৈতের এই গোষ্ঠী যে তৎকালে জনপ্রিয়তালাভ করতে পারে নি এবং এঁদের দলবৃদ্ধিও যে হয় নি তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। দেশে তখন মুসলমান শাসন চলছে। যবন-শাসকদের পীড়নে হিন্দু প্রজারা শঙ্কিত। কাজেই শ্রীবাস অঙ্গনে যখন উচ্চস্বরে হরিনাম হতো তখন পাড়া প্রতিবেশীরা

---

৩. চৈ. চ. ১।৬ ৪. ঐ ১।৯

যবনদের উৎপীড়নের ভয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠতেন। এর ফলে অদ্বৈতের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতো। ভক্তিপথের এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল।

চৈতন্যদেব জন্মাবধি ভক্ত ছিলেন না। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর মধ্যে ভক্তির প্রথম উন্মেষ দেখা দেয় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়—যখন তিনি গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর জীবনের এই ২৩ বৎসর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত হয়েছে। এসময়ে অদ্বৈতাচার্যের গৃহেও তাঁর যাতায়াত ছিল কিন্তু কৃষ্ণভক্তি, কীর্তন প্রভৃতি তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করত না। শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদের তিনি নানা ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে অপদস্থ করে আনন্দ পেতেন। কিন্তু গয়া থেকে যে চৈতন্যদেব প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি গয়াযাত্রার পূর্বের চৈতন্যদেব থেকে ভিন্ন।

ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্যের গোষ্ঠী যা ছিল তার কিছু বৃদ্ধি হয়েছিল। মুকুন্দ গদাধর আদি নবীন ভক্তের দল এঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল। নূতনের মধ্যে এসেছিলেন যবন হরিদাস। সে যুগে ভক্ত হলেও যবনকে ব্রাহ্মণ কর্তৃক আশ্রয়দান কেউই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি—একথা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। একে রাজরোষভয়, তার ওপর বেদবিধির বিরুদ্ধাচারণ—এসব নানা কারণে এই ভক্তের দল সকলের আরও অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেম। এই সময়ে গয়া থেকে প্রত্যাগত চৈতন্যদেব (তখন নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত) কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হয়ে অদ্বৈতের দলের মধ্যমণি হয়ে বসলেন। এর ফলে তাঁদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। এতদিন তাঁরা ছিলেন নগণ্য, রাজরোষে ভীত, বিরোধীদের উপহাসভাজন। আর এখন তাঁরা পরম শক্তিশালী একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হলেন। এরপর নিত্যানন্দ এসে তাঁদের দলবৃদ্ধি করলেন। ভক্তি এবং সাধনার গুণে তিনি সহজেই চৈতন্যদেবের পাশে নিজের স্থান করে নিলেন।

কিন্তু গয়া থেকে ফেরার এক বৎসর পর চৈতন্যদেব কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচল চলে গেলেন। নবদ্বীপের অন্তরঙ্গদের মধ্যে জগদানন্দ, গদাধর পণ্ডিত আদি কয়েকজন নীলাচলে তাঁর কাছে অবস্থান করতেন। অন্যান্যরা চৈতন্যদেবের ইচ্ছানুসারে দেশে থেকে যান। তাঁরা বৎসরে একবার রথযাত্রার সময় তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন।

অদ্বৈতাচার্যকে কেন্দ্র করে এই ভক্তগোষ্ঠীর সৃষ্টি হলেও চৈতন্যদেব চলে যাওয়ার পর তিনি এই গোষ্ঠীকে একত্র করে রাখতে পারেন নি। চৈতন্যদেব এই

গোষ্ঠীতে যোগদান করার পর তিনি এই গোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এই ভক্তের দল বৃদ্ধি পেয়েছিল। অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী নবদ্বীপে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি কিন্তু চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত প্রভাবে এই গোষ্ঠী নবদ্বীপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি চলে যাওয়ায় যে স্থান শূন্য হলো তা' পূর্ণ করার কেউ রইলেন না। ফলে সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন। নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডে ফিরে গেলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ কাটোয়ার কাছে অগ্রদ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত গেলেন কুমারহট্টে। নিত্যানন্দ খড়দহে বসবাস করতে লাগলেন, এবং গদাধর দাস গেলেন খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রামে। যবন হরিদাসও কিছুকালের মধ্যে নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে চলে গেলেন। মুরারি গুপ্ত প্রমুখ নবদ্বীপবাসীরাই শুধু সেখানে থেকে গেলেন।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাঁরা এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ক্রমে তাঁদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে উঠতে লাগল আদর্শগত ঐক্যের অভাবে। নীলাচলে চৈতন্যদেব যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন নানাস্থানে থাকলেও তাঁরা এই এক আকর্ষণে নীলাচলে একত্রিত হতেন মাত্র, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল একথা মনে হয় না। নীলাচলে আসার পথে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল না পেয়ে নিত্যানন্দ শিবানন্দকে পদাঘাত করেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিত মারফৎ যে তর্জা পাঠিয়েছিলেন তাতেও এঁদের মধ্যে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবের বর্তমানে তাঁদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তা' আরও বেড়ে থাকবে। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের কোনও দিন মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল না। এঁদের দুজনের আনন্দ-কলহ বলে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে আনন্দের চেয়ে কলহের ভাগ বেশী। এঁদের মধ্যে বিভেদের সূচনা এখানেই দেখা যায়। এঁদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র ছিলেন চৈতন্যদেব, তাঁর অবর্তমানে এই বিভেদ যদি আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

চৈতন্যদেবের অবর্তমানে এই বিরোধ যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তার বিবরণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন—

এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া ।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া ॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়[৫] ॥

এই গ্রন্থের অন্য এক স্থানে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কেহো বলে মহাতেজ অংশ অধিকারী ।
কেহো বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥
কি বা জীব নিত্যানন্দ কি বা ভক্ত জ্ঞানী ॥
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে[৬] ॥

আবার—

চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান ।
তাহা না সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান ॥
তবে যে দেখহ হের অন্যোন্যে বাজে ।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহো নাহি বুঝে ॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয় ।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয় ॥
সর্বভাবে ভজ কৃষ্ণ যে কারে না নিন্দে ।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে ॥
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার ।
তান প্রিয়ে তাহে মতি রহুক আমার ॥
সর্বগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তিলভ্য হয় ॥
অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর ।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈত কিঙ্কর[৭] ॥

---

[৫] চৈ. ভা. ২।১৩ । [৬] চৈ. ভা. ২।২৪ [৭] ঐ

এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বৃন্দাবনদাসের সময় চৈতন্য-পরিকরদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নিজ নিজ গোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর পক্ষকে হেয় প্রমাণ করার জন্য রেষারেষি লেগেছিল। আলোচ্য অংশগুলিতে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত ও গদাধরের শিষ্যদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। নিত্যানন্দকে গালি দেওয়ার লোকেরও বোধহয় অভাব ছিল না। নিত্যানন্দের শিষ্যের কাছে তাঁর নিন্দা করার জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করে বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন।

চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস যে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা দেখিয়েছেন তা তিনি এই গ্রন্থে রক্ষা করতে পারেন নি। অন্ততঃ তিনি নরহরি সরকার সম্বন্ধে যে সুবিচার করেন নি সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলায় নরহরি সরকারের বড় ভূমিকা ছিল, সেকথা আমরা চৈতন্যপরিকরবৃন্দের রচিত পদসমূহ থেকে জানতে পারি কিন্তু বৃন্দাবনদাস সযত্নে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন।

চৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দকে কেন্দ্র করে যে সব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যেই যে শুধু মতভেদ ছিল তা নয়। অন্ততঃ একটি গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যেও যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে! অদ্বৈতাচার্যের শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন--

প্রথমেতে একমত আচার্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত আচার্য আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র[৮]॥

এখানে যে মতভেদের কথা বলা হয়েছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে। দ্বাদশ তরঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক চৈতন্যদেবের শাস্তি পাওয়ার জন্য জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু আর।
অদ্বৈত অন্তর বুঝে ঐছে শক্তি কার॥
অদ্বৈতাচার্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভালমতে॥

---

[৮] চৈ. চ. ১।১২

অদ্বৈত শঙ্কর প্রভৃতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে ॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেঁহো না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা[৯] ॥

মোটের উপর, চৈতন্যদেবের তিরোধানের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ খুব বৃদ্ধি পেল। এঁদের সকলের সাধনার ধরন ও লক্ষ্যও এক ছিল না। কবিকর্ণপূর তাঁর গ্রন্থে প্রচার করলেন যে চৈতন্যদেব সাধনার উপায় নন, তিনিই উপেয়। নরহরি সরকার গৌরনাগরবাদ প্রচার করলেন। আরও অনেক ভক্ত ভিন্ন মত প্রচার করলেন।

এইভাবে চৈতন্যপরিকরবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে বসে নিজ নিজ পন্থানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন। যুবক শ্রীনিবাসের অধ্যয়নকালে বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের পন্থা সম্বন্ধে কৌতূহল জেগে থাকবে। বিশেষতঃ চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ শ্রীনিবাসকে আরও বিভ্রান্ত করে থাকবে যার জন্য তিনি চৈতন্যদেবের মনোমত ভাগবত ব্যাখ্যা শোনার জন্য গদাধর পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি তখন অসমর্থ থাকায় পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে গদাধর দাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। গদাধর দাস, নরহরি সরকার প্রভৃতি তৎকালীন চৈতন্যপরিকর এ সময়ে বৃন্দাবনে গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থরাজির কথা শুনে থাকবেন। তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মিলনের সূত্র হিসেবে এই গ্রন্থরাজি বিশেষ কাজে লাগবে এবং শ্রীনিবাস তখন এ বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন দেখে তাঁরা তাঁকে গোস্বামীদের কাছে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে তিনি এখানে উপযুক্ত শিষ্যবৃন্দ গড়ে তুলেছিলেন, এমন সময় গদাধরদাস ও নরহরি দেহত্যাগ করেন। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে একথা চিন্তা করে রঘুনন্দন শ্রীনিবাসকে জীবাদির সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন পাঠিয়েছিলেন বলে অনুমান বর যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে শ্রীনিবাসাচার্য এই দুই চৈতন্য-পরিকরের তিরোভাব তিথিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একত্র করার আয়োজন করেন। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের অর্থাৎ সীতা দেবা, জাহ্নবাদেবী, রঘুনন্দন প্রভৃতির সহায়তায় এঁরা এই দুই মহোৎসবে

একত্রিত হন এবং কয়েক সপ্তাহ একত্রে অতিবাহিত করেন। তাঁরা কিছুকাল শ্রীনিবাসাচার্যের গৃহেও অতিবাহিত করেছিলেন, অনুমান করা যায় যে, এসময়ে তাঁরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হন এবং তাঁদের করা ভাগবত ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করেন। এঁদের মিলন সম্পূর্ণ হলো খেতরীর মহোৎসবে। সেখানে তাঁরা গোস্বামীদের কৃত বিধানানুযায়ী প্রিয়া সহ গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকে শুধু স্বীকারই করলেন না সেই বিধি অনুযায়ী পূজাও করলেন। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। মোটের উপর, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যে শূন্যতা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা রোধ করলেন শ্রীনিবাসাচার্য। ক্রমশঃ শ্রীনিবাস আচার্যকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী শিষ্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো তাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। গদাধর দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধানের পর এদেশে প্রভাবশালী চৈতন্যপরিকর আর কেউ রইলেন না। সেজন্যই রঘুনন্দন ও যদুনন্দন প্রমুখ মহাজনরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নেতৃস্থানীয় শ্রীজীব গোস্বামীর নেতৃত্বকে স্বীকার করা শ্রেয়ঃ মনে করে থাকবেন। এদেশে জীবের উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্য যিনি শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, উপযুক্ত সংগঠকও ছিলেন। এজন্যই বীরভদ্র তাঁকে লিখেছিলেন যে মহাপ্রভু তাঁর এক শক্তিদ্বারা গোস্বামী-ভ্রাতৃদ্বয় দ্বারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অপর এক শক্তিদ্বারা আচার্যকে দিয়ে গ্রন্থ প্রচার করাচ্ছেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আচার্যের প্রভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শ্রীনিবাসাচার্যের অবদানের ইতিহাস তাঁর জীবনীতে যতটুকু পাওয়া যায়, সে তুলনায় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর অবদানের কথা প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর লেখা একটি চতুঃশ্লোকী ভাষ্য পাওয়া যায়। এটি হরিদাস বাবাজী শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালায় প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী (এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সূত্র) ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের চারিটি শ্লোকে বলা হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের শ্রীধর স্বামী থেকে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে—এমনকি শ্রীনিবাসাচার্যের পরবর্তী যুগেও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত বিভিন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এই শ্লোকের বাক্যসমূহের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করে ভাগবতের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শ্রীনিবাসাচার্য জীব গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। কাজেই তাঁর লেখা টীকাতেও প্রাচীন ধারা অনুসৃত হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় স্থলবিশেষে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বলে হরিদাস দাস বাবাজী অভিমত প্রকাশ করেছেন[১]। এসম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে চতুঃশ্লোকের পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু প্রথমে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। এরপর আমরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কৃত চতুঃশ্লোকের ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আচার্যের ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করে আচার্যের বৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলোচনা আরম্ভ স্বরূপ বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা এক সময়ে সৃষ্টির কথা চিন্তা করতে করতে সমুদ্রে দুবার উচ্চারিত দুই অক্ষরযুক্ত একটি বাক্য শুনতে পেলেন। এই বাক্যটি হলো 'তপ'। বক্তাকে দেখতে ইচ্ছা করলেও তিনি সমুদ্র ও নিজ বাসস্থান ছাড়া অপর কিছু দেখতে না পেয়ে তপস্যার দ্বারা তাঁকে দর্শন করতে মনস্থ করলেন, এবং দেবতাদের পরিমাণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। ভগবান নারায়ণ তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বৈকুণ্ঠে সলক্ষ্মী দর্শনদান করলেন

এবং জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় অব্যর্থ সাধনা বলে দিলেন। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে শ্রীমদ্ভাগবত থেকে নারায়ণের বক্তব্য মূল শ্লোক ছয়টি ও পরে তার অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করছি।

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩০
যাবাহনং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩১
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ সোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩২
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৩
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৪
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা[২] ॥ ৩৫

অনুবাদ-শ্রীভগবান বললেন—সাক্ষাৎ অনুভব ও গভীর ভক্তির সঙ্গে আমার রহস্য সমেত অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্বজ্ঞান ও তার সাধন-প্রণালী তোমাকে বলছি। তুমি গ্রহণ কর। ৩০

আমি যত বড়, আমার যা স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যেরূপ, আমার অনুগ্রহে এই সকলের যথার্থ অনুভব তোমার হোক। ৩১

সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম। আমি ভিন্ন সৎ অর্থাৎ স্থূল, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং এই দুইএর কারণ কিছুই ছিল না। এই সৃষ্টির পরেও আমি—আমিই আছি এবং এই সৃষ্ট জগৎরূপে যা কিছু প্রতীত হয়, তাও আমি এবং যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তাও আমি। ৩২

যেজন্য কোন বস্তু না থাকলেও সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং যেজন্য আত্মা থাকলেও আত্মার জ্ঞান হয় না, তাকেই আত্মার মায়া বলে জানবে। ৩৩

যেমন আকাশাদি মহাভূতগণ মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট না হলেও

---

[২] পুরীদাস সম্পাদিত সং পৃ. ১১৮

জগৎসৃষ্টির পর এদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আমিও সেরকম প্রাণিবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট না হলেও সৃষ্টির পর প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট হয়েছি। ৩৪

যিনি পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক, তিনি যেন একথা জানতে ইচ্ছা করেন যে বস্তু সর্বদা সকল অবস্থাতেই থাকতে পারে। ৩৫

এই ছয়টি শ্লোকের মধ্যে শেষের চারটি শ্লোক চতুঃশ্লোক নামে বিখ্যাত। বিশেষতঃ শেষোক্ত শ্লোকটির নানা ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে শ্রীধর স্বামী সম্মত ব্যাখ্যা হলো—

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বিচারের দ্বারা তাঁকে জানতে হবে যে, যে পরম বস্তু অন্বয় অর্থাৎ অনুবৃত্তি (আমি যে আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করছি সেই তত্ত্ব যিনি জানেন, তাঁর নিকট গিয়ে সেই তত্ত্ব অবধারণ করা) এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি (আত্মতত্ত্ব অবগত হয়েও প্রতিনিবৃত্ত হওয়া) অনুসারে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান থাকেন, তাই আত্মা।

এই শ্লোকের অন্যরকম ব্যাখ্যাও দেখা যায়—এ ব্রহ্ম নয়। এ ব্রহ্ম নয়—এরূপ ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধ পদ্ধতিতে এবং এ ব্রহ্ম, এ ব্রহ্ম—এরূপ অন্বয় পদ্ধতিতে একথাই সিদ্ধ হয় যে সর্বাতীত এবং সর্বস্বরূপ ভগবানই সর্বদা এবং সর্বত্র স্থিত আছেন—এটাই বাস্তবিক তত্ত্ব। যিনি আত্মা অথবা পরমাত্মার তত্ত্ব জানতে চাইবেন—তাঁর একথাই জানার আবশ্যকতা থাকবে।

আলোচ্য ৩২-৩৫ শ্লোকগুলি থেকে কি ভাবে সমগ্র ভাগবতের অর্থ সংগ্রহ হতে পারে তা রাধারমণ গোস্বামী তাঁর দীপিকাদীপনীতে বলেছেন। তাঁর মতে "আমিই অগ্রে ছিলাম" (অহমেবাসমেবাগ্রে ৩২)। এই বাক্যদ্বারা সর্বকারণের কারণ শ্রীভাগবত প্রতিপাদ্য আশ্রয়তত্ত্ব বলা হয়েছে। এর দ্বারা দ্বাদশ স্কন্ধের অর্থসংগ্রহ হয়েছে। "পশ্চাতেও আমি" (পশ্চাদহং ৩২) এই উক্তি দ্বারা পুরুষ প্রধানাদি সকল বিষয় বলা হয়েছে। এর দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধের অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। "পরিদৃশ্যমান যা কিছু" (যদেতচ্চ ৩২) এই বাক্যে বিসর্গ, স্থান, উতি, মন্বন্তর, ও ঈশানকথা বলা হয়েছে। এই বাক্যের অর্থ "কার্যভূত এই জগৎ আমি" —সুতরাং এর দ্বারা চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম ও নবম স্কন্ধের অর্থ বলা হয়েছে। "তারপর যা কিছু অবশিষ্ট রইল তাও আমি" (সোঽবশিষ্যতে ৩২) এই বাক্যে নিরোধ বলা হয়েছে অর্থাৎ দশম স্কন্ধের বক্তব্য এই বাক্যে আছে। "অর্থব্যতীত" (ঋতেঽর্থং ৩৩) ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে মায়ার প্রভাবে মায়া সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি জীবের সংসার ও জীবেশ্বর বিভাগের কথা বলা হয়েছে, এসমস্ত প্রথম স্কন্ধের

বক্তব্য। "যেমন মহাভূতসমূহ" (যথা মহান্তি ভূতানি ৩৫) ইত্যাদি বাক্যে পোষণ বলা হয়েছে, এটি ষষ্ঠ স্কন্ধের বক্তব্য। "এইমাত্র জিজ্ঞাসা করবে" (এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং ৩৫) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাধন সূচনায় মুক্তির কথা বলা হয়েছে যা একাদশ স্কন্ধের বক্তব্য[৩]।

ভাগবতের চতুঃশ্লোকের পটভূমিকা, বিষয়বস্তু এবং বৈষ্ণব দর্শনে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এবার বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনরা এর টীকা প্রসঙ্গে কি বলেছেন দেখা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীজীব গোস্বামীর কথা বলা যায়। তাঁর রচিত ভাগবত-সন্দর্ভে এই চতুঃশ্লোকের ভাষ্য দেওয়া আছে। এই আলোচনায় দেখা যায় শ্রীজীব বলছেন যে রহস্য (৩০-শ্লোক) শব্দ দ্বারা ভগবৎ-প্রেমের কথা বলা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দের কথা বলা হয়েছে যা একমাত্র ভক্তের জ্ঞাতব্য। এই শব্দের সাহায্যে ভাগবত এমন এক 'অনির্দেশ্য" বস্তুকে নির্দেশ করছে যা বেদও বলতে পারে নি। এই রহস্য একমাত্র ভক্তির দুটি পর্ব সাধনা ও প্রেমের সাহায্যেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব সংক্ষেপে সাধন-ভক্তি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এখানে বিশদভাবে আলোচনা না করার কারণ তিনি এই দুটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রীতিসন্দর্ভে করেছেন। তাঁর মতে সাধন-ভক্তি গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা গেলেও প্রেমভক্তি একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় ভক্তের মনে স্বতঃ উদয় হয়। সাধন-ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেও প্রেমভক্তির দ্বারাই ভগবৎ লাভ হয়। বেদের সাহায্যে সাধন-ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না বরং এর সাহায্যে ভক্ত প্রেমভক্তির উপযুক্ত হতে পারে মাত্র। এভাবে আলোচনা করে শ্রীজীব দেখিয়েছেন যে ভাগবত হলো সর্ব শাস্ত্রের সমন্বয় এবং এমনকি "সর্ববেদার্থতত্ত্বে" রও ওপরে। কাজেই ভাগবত কথার ওপর আর কিছু নেই[৪]।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে চতুঃশ্লোকীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে। যদিও এই গ্রন্থ সম্ভবত শ্রীনিবাসাচার্যের তিরোধানের পর রচিত হয়েছে তা সত্ত্বেও আচার্যের টীকা আলোচনার পূর্বে চরিতামৃতের বক্তব্য আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ এই গ্রন্থের বক্তব্যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাজনদের তৎকালীন চিন্তাধারার সূত্র পাওয়া যেতে পারে। চরিতামৃতের এই অংশটি কাশীতে বসে চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রকাশানন্দকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলা হলেও অনুমান করা যেতে

[৩] শ্রীনি. প্র. ভূমিকা দ্রঃ। [৪] E. H. V. F. পৃ. ২৮৬

পারে যে এটি এবিষয়ে বৃন্দাবনের মহাজনদের বক্তব্য মাত্র। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ দেখা যায় চৈতন্যদেব কাশীতে যখন নাম সংকীর্তন করছিলেন তখন প্রকাশানন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রেমোন্মাদ চৈতন্যদেবকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে চৈতন্যদেবের চরণবন্দনা করেন। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের কাছে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছে করেন। সেসময়ে চতুঃশ্লোকের উল্লেখ করে চৈতন্যদেব বলেন—

ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

এরপর পূর্বোক্ত ৩০তম শ্লোকের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছিলেন—

আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম।
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥

এরপর ৩১তম শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দকে বলেন—

এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥
আমার কৃপায় এসব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥

এরপর ৩২তম শ্লোকের ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বলেন——

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে।
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

আলোচ্য শ্লোকটির আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার ॥

যে বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥

৩৩তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করে চৈতন্যদেব বলেন—

'এই' শব্দে হয় জ্ঞান বিবেক।
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

৩৪তম শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ চৈতন্যদেব বলেছিলেন—

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার ॥

ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার ॥
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্তব্য।
গুরু পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

পূর্বোক্ত ৩৫তম শ্লোকের ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বলেন—

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥
ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের আলোচনা শুধুমাত্র ৩১ থেকে ৩৫তম শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এর পূর্বের শ্লোক দুটিকেও তাঁদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শ্রীনিবাসাচার্যের চতুঃশ্লোকী ভাষ্যেও দেখা যায় তিনি তাঁর টীকা শুধুমাত্র চারটি শ্লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মোট ছয়টি শ্লোকেরই টীকা রচনা করেছেন। আচার্যের টীকার অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো।

শ্রীভগবানুবাচেতি—ভগবান জ্ঞান, শক্তি, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ

এই ষড় গুণযুক্ত। ত্রিপাদ বিভূতিযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি ভগবান পূর্ণ কিন্তু চাতুষ্পাদ বিভূতিযুক্ত গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতমঃ। (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে) গোপাল এরূপ বলেছেন — আমার পূর্ণ ষড়গুণযুক্ত বহুবিধ প্রকাশ আছে, কিন্তু গোপালের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।" অতএব এস্থলে সর্বাতিশয় অনন্ত গুণবান গোলোকবাসী শ্রীহরি বক্তা।

(৩০তম শ্লোকের) জ্ঞানং ইত্যাদি — মোক্ষ বিষয়িণী বুদ্ধিকে জ্ঞান, ভক্তি বিষয়িণী বুদ্ধিকে পরম জ্ঞান প্রীতিবিষয়ণী বুদ্ধিকে পরমগুহ্যজ্ঞান বলে। শিল্পশাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ--শ্রীবিগ্রহের ত্রিভঙ্গিম সুগঠন, করচরণ, রেখাবিন্যাস প্রভৃতি। শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞানের অর্থ--শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক কল্প। রহস্য রাস, নিকুঞ্জমোহনমন্দিরে শ্রীরাধা সম্ভোগরূপ পরমসুখ প্রধান অঙ্গবিশিষ্ট। অঙ্গং—বিভাব. অনুভাব, সাত্ত্বিক লক্ষণ, সঞ্চারিভাব, সুহৃদ্রূপ সখ্যভাব, বৈরিভাব, বাৎসল্য, বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান, প্রবাসাদি, দিব্যোন্মাদ, চিত্রজল্পাদি প্রভৃতি। চ—অনন্তবাচক। ময়া—নিগূঢ় নিজলীলাবিশারদ রসিকশিরোমণি স্বয়ং ভগবান। গদিতং—ভরতাদি মুনিমানস থেকে যা ব্যক্ত হয়েছে। গৃহাণ—দুর্লভবস্তু মহানিধি পরমাগ্রহপূর্বক গ্রহণ কর।

(৩১তম শ্লোকের) যাবানহং—গোলোকধামস্থিত গোপবেশী গোপপতি। যথাভাবো—উজ্জ্বলাদি ভাবসমূহ। যদ্রূপগুণকর্মকঃ—কোটিক-দর্পলাবণ্যধারী অসাধারণগুণচতুষ্টয় সমন্বিত মুরলীমোহনাদিসম্পন্ন শ্যামসুন্দর। কর্ম—রাস-লীলার বিনোদ যাতে বর্তমান। তথৈবেত্তি—এসব তত্ত্ব নিগমনিগূঢ় বলে নিগমকর্তা ব্রহ্মারও অগোচর এবং দুর্বোধ্য। এজন্য তাঁকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে।

(এরপর ব্রহ্মসংহিতা থেকে 'গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি' 'গোলোক এব নিবসতি' গৌতমীয়তন্ত্র থেকে 'কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্' প্রভৃতির উদ্ধৃতি আছে)

(৩২তম শ্লোকের) অহমেব—পূর্বোক্ত মহানুভব গোপালরূপী অগ্রে সর্বলোকমুকুটমণি শ্রীগোলোক। আসমেব- রাসলীলায় আমি বিরাজমানই ছিলাম আস্ধাতু দীপ্তি পাওয়া অর্থে প্রযোজ্য সৎ—সৎ রক্ষার্থঅসুরবধাদি। অসৎ—প্রাকৃত দর্শনাদি। পরং—নিজ গৃহিণী গোপীদের পরকীয়াভাব। প্রশ্ন হতে পারে শ্রীহরি নিত্যই গোলোকে রাসলীলায় মত্ত থাকলে) তিনি ছাড়া এই জগৎ আদি কে করেন? তার উত্তরে পশ্চাদহং—সর্বলোকমূলে মূলাধারে

সঙ্কর্ষণ ও কচ্ছপাদি রূপীদ্বারা। যোঽবশিষ্যেত—কার্যকারণভেদাভেদশূন্য হয়ে সর্বলোকমধ্যে বিলাস, পুরুষ, গুণাবতার, লীলাবতারশেষ, প্রাভব, বৈভব, পদ্মনাভ, ক্ষারোদশায়ী প্রভৃতি অংশ কলারূপে আমি সকল কাজ সমাধান করে থাকি। অহং--পরন্তু স্বয়ং গোকুলে সব করে থাকি।

(৩৩তম শ্লোকের) তবে কেন সকলে এই তত্ত্ব অনুভব করেন না? সেজন্য তিনি বলছেন—ঋতেঽর্থং—এটাই পরমকৌতুক। তৎ—তাঁর ভ্রূক্ষেপদ্বারা সকল ভুবন নখরাগ্রে নৃত্য করে। আত্মনো—আমার মায়ায় এসব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থং—পরমপুরুষার্থরূপ। যৎ—যার প্রভাবে করছে না। আত্মনি—আত্মতুল্য স্ত্রীপুত্রাদি। প্রতীয়েত—করায়। বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত—আভাসে ঘটাদির জ্ঞান করায় না। (এখানে আচার্যের বক্তব্য—শ্রীহরির কাজ হলো সত্যস্বরূপ। পরমাত্মা জীবে পরম পুরুষার্থরূপ প্রেম করান না, অথচ অসত্যস্বরূপ আত্মতুল্য স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রেম প্রয়োগ করান। এরূপ বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত—চিন্ময় বস্তুর আভাসে ঘটাদি বস্তুর পৃথক সত্তার অনুভব হয় না কিন্তু চিন্ময় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে ঘটাদি বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব বোধ হয়।)

(৩৪তম শ্লোকের) পুনরায় মহাশয় (শ্রীহরি) তাঁর স্বরূপের বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এবং লীলার প্রকটত্ব ও অপ্রকটত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তদ্বারা নিরূপণ করছেন। যথা মহান্তি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত বিভু ও পরিচ্ছিন্ন এবং প্রকট ও অপ্রকটরূপে বিরাজ করে। বিভুরূপে পৃথিবী অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী অথচ লোষ্ট্রাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন। বিভুরূপে জল কারণ, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডাধার অথচ করকাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন। অগ্নিরূপ বিভুরূপে সূক্ষ্ম, ব্রহ্মা প্রভৃতিস্বরূপ এবং দীপাশিখাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন। বায়ু সর্বগত হয়ে ব্যাপী এবং বাত্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন। আকাশও সর্বগতরূপে ব্যাপী অথচ ঘটাকাশাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন।

এবমহং—যাঁর অন্তর্বাহ্য নেই এবং যাঁর পূর্বাপর নেই (ভা ১০।৯।১৩) ইত্যাদিরূপ বিভু (অর্থাৎ সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী)। এই বিভুত্ব সত্ত্বেও আমি পরিচ্ছিন্ন থাকি যথা ভাগবতের ১০।৯।১৪ শ্লোকে আছে মা যশোদা যাঁকে প্রাকৃতবালকবৎ বন্ধন করেছেন ইত্যাদি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে আমি বিভু, আবার দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি স্বরূপে আমি পরিচ্ছিন্ন। ভক্তিরসামৃতের ২।১।১৯৮ শ্লোকে আছে—বিভু হলেও যিনি মায়ের ভুজদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্রোড়ে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন ইত্যাদি। অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিবলে সাধ্য। অপরদিকে—পৃথিবী আদি যখন অপঞ্চীকৃত অবস্থায় তন্মাত্র গন্ধাদিরূপে অবিমিশ্রিত থাকে,

তখন তারা সূক্ষ্মরূপেও থাকে বলে সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হলেও যোগিগণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তারা আবার মিশ্রিত অবস্থায় স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়ে মূর্তিধারণ করলে দৃশ্যমান হয়। সেরকম শ্রীভগবানও বিরাট পুরুষের অন্তর্যামিস্বরূপে অদৃশ্য অথচ দ্বিভুজাদিরূপে দৃশ্যমান হন। (এরপর পরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণরূপের উদাহরণ স্বরূপ গীতার ১০। ৪২, ১৮। ৬১, ৭। ১৪ ও ১৬। ২০ শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি, লীলার অদৃশ্যমান দৃশ্যমানের উদাহরণস্বপ লঘুভাগবতামৃত ১। ৭১৫, ভাবার্থদীপিকা ১০, উপক্রমণিকা ৬ এবং প্রকটাপ্রকটত্বের উদাহরণস্বরূপ ভাগবতের ১০। ১। ২৮ ও ১: ১০। ২৬ শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি আছে)।

(৩৫তম শ্লোকের) এবার (শ্রীহরি) মধুরভাবে প্রসঙ্গটির সমাপন করেছেন। আত্মনঃ—আমার পূর্বোক্ত সুগুপ্ত সর্বগুহ্যতম পরমরহস্য তত্ত্ব। জিজ্ঞাসুনা—জানতে ইচ্ছুক শিষ্যদ্বারা। এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং—পরমবস্তু কি? একথা বার বার জানা। পরম সাধন, পরম পুরুষার্থ, বিচারনিপুণ শ্রীভাগবতে অনুরক্ত রসিকজনের সঙ্গপরায়ণ, প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত জীবনীভূত, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মসুধাআস্বাদকারী, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণপদ্মের মধুকর, শ্রীরাধাপদনখচন্দ্রচকোর শ্রীগুরুর কাছে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা করা কর্তব্য। রহস্যং—স্বকীয়া, পরকীয়া, গোপীদের পরকীয়া ভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়। কি প্রকার শিক্ষণীয়? অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্—অন্বয় দ্বারা, আনুগত্য অর্থাৎ নিরন্তর সেবা দ্বারা। ব্যতিরেক বিশিষ্ট অতিরেক ঔৎকট্যের দ্বারা—পরমার্তি অর্থে। যৎ—শ্রীগুরুর অনুগমন। সর্বত্র—সর্বভজনসাধনে অনুসরণ। সর্বদা—সর্বকালে জীবনে মরণে বিপদে সম্পদে দূরে নিকটে দিনে রাত্রে সংকীর্তনে মহাপ্রসাদে অনুশীলনে ইত্যাদি। (এর পর গুরুর নিকট ধর্ম-শিক্ষার শাস্ত্রোক্তি—ভাগবতের ১১। ৩। ২১-২২, ১০। ৮০। ৩২-৩৩, ১১। ২০। ১৭ ও ১১। ১৭। ২৭ শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি।) অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গুরুর চেয়ে পরম তত্ত্ব নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে মোটামুটিভাবে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় শ্রীজীবগোস্বামী ৩০তম শ্লোকের রহস্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাধনভক্তি এবং এই ভক্তিলাভের উপায় হিসাবে গুরুর কাছে শিক্ষা করার কথা বলেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ৩৪তম শ্লোকের আলোচনাকালে সাধনভক্তি এবং সেই প্রসঙ্গে গুরুর কাছে এসব কথা শোনার কথা বলা হয়েছে। আচার্যের টীকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩৫তম শ্লোকের জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাসু প্রসঙ্গে তিনি গুরুর শরণাপন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরুর স্থান সম্বন্ধে জানা যায়। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে দেখা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ একাধিক গুরুকে বন্দনা করেছেন—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

(গুরুগণকে, ঈশ্বরভক্তগণকে, ঈশ্বরাবতারগণকে, ঈশ্বরের প্রকাশগণকে, ঈশ্বরের শক্তিসমূহকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক ঈশ্বরের বন্দনা করি)

এখানে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ একাধিক গুরুর কথা বলেছেন। শ্লোকের শেষে বাংলা পয়ারে তিনি মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি গুরুগণ বলতে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বলতে চেয়েছেন।

মন্ত্রগুরু অর্থাৎ দীক্ষাগুরু প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

গুরু যে কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর এই উক্তির স্বপক্ষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১। ১৮। ২৭ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্লোকের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তিনি আচার্যকে অর্থাৎ গুরুকে কৃষ্ণের স্বরূপ বলে জানতে উপদেশ দিয়েছেন।

শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্য—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

অর্থাৎ ভগবান দুভাবে শিক্ষাগুরুর কাজ করেন। তিনি বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষা দেন আবার তিনিই অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ঐ বিষয়ে অনুভব করান।

যিনি অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শিক্ষাকে অনুভূত করাতে পারেন তাঁর বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলেছেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

এর মানে, শ্রীকৃষ্ণ চৈত্তরূপে অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী গুরুরূপে

সাধারণ জীবের চক্ষুগোচর হন না, সেজন্য তিনি মহান্তস্বরূপ শিক্ষাগুরু হন।

অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ এবং কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা থেকে যা জানা গেল, শ্রীনিবাসাচার্যের উপসংহারে যেন তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাঁর ভাষ্যের উপসংহার থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি গুরুকে পরম তত্ত্ব বলে গুরুবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাপ্রশাখা বর্ণন

বিভিন্ন সূত্র থেকে এযাবৎ শ্রীনিবাসাচার্যের মোট ১৬২ জন শিষ্যের নাম পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নাম পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি একাধিক শিষ্যের নাম—যেমন, গোবিন্দ, রূপ প্রভৃতি। গোবিন্দ নামে আচার্যের দুজন শিষ্য পদকার হিসাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। এঁদের একজন হলেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, অপরজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকার গোবিন্দদাস কবিরাজ। এছাড়া গোবিন্দ নামে আচার্যের আরও কয়েকজন শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। রূপ নামে আচার্যের অন্ততঃ দুজন শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের একজন রূপ কবিরাজ এবং অপরজন রূপ ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন।

আচার্যের শিষ্যবৃন্দের নামের তালিকায় কয়েকটি নামের একই সূত্রে একাধিকবার উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিকবার উল্লেখ থাকায় মনে হয় এঁরা একাধিক ব্যক্তি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় বা অন্য সূত্র থেকে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না যা থেকে এবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যেতে পারে।

যে সূত্র থেকে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদের নামের তালিকা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো আচার্যশিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচক। আচার্যের জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণের কাহিনী এগারোটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন[1]। এই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কবিরাজ প্রায় ছেচল্লিশজন আচার্যশিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সামান্য পরিচয় দেওয়া আছে। অন্যান্যদের শুধুমাত্র নাম উল্লেখ থাকায় তাঁদের পরিচয়ের ব্যাপারে কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

অনুরাগবল্লীতে সপ্তম মঞ্জরীতে আচার্যের শাখা বর্ণন পাওয়া যায়। এটিকে একটি নামের তালিকামাত্র বলা যেতে পারে, কারণ দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া কোনও শিষ্যের পরিচয় এতে দেওয়া হয় নি। তালিকাটি কর্ণপূর কবি-

---

[1] গু. লে. সূ. ৬৮-৭৮ শ্লোক

রাজের তালিকার অনুরূপ। তবে এই তালিকায় গুণলেশসূচকে বর্ণিত নামগুলি ছাড়া আরও কুড়িজন শিষ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের শাখাবর্ণন নেই। গ্রন্থের শেষভাগে নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন—

শিষ্যগণ নাম হেথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু[২] ॥

শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থখানি লুপ্ত হওয়ায় নরহরি চক্রবর্তী সংগৃহীত আচার্য-শিষ্যদের নামের তালিকা এখন পাওয়া যায় না। তবে ভক্তিরত্নাকরে আচার্যের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মোট ছাব্বিশজন শিষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এঁদের সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে।

নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্তী খেতরীর উৎসব প্রসঙ্গে আচার্যের সাতজন শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের সকলের কথাই ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে।

প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের শাখাবর্ণন আছে। এখানে আচার্যের একশত ষোলজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এই সংখ্যা অনুরাগবল্লীতে বর্ণিত শিষ্য-তালিকার চেয়ে পঞ্চাশ জন বেশী। এই পঞ্চাশজনের নাম কোথা থেকে কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে জানবার উপায় নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় কর্ণানন্দ গ্রন্থে। বস্তুতঃ গ্রন্থটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আচার্যের শাখা ও প্রশাখা বর্ণন।

গ্রন্থকার শাখাবর্ণনের আরম্ভে তালিকা প্রাপ্তির সূত্র সম্বন্ধে বলেছেন—

ঠাকুর মহাশয় যেথা করিলা বর্ণন।
কর্ণপুর কবিরাজ যা কৈল চয়ন ॥
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে[৩]।

গ্রন্থকার ঠাকুর মহাশয় বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন সেকথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। নরোত্তম ঠাকুরকে সাধারণতঃ ঠাকুর মহাশয় বলে সম্বোধন করা হতো। কিন্তু তিনি আচার্যের শিষ্য-তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন বলে জানা

---

[২] ভ. র. ১৪।১৯৩ [৩] ক. ১ম নির্যাস।

যায় নি। এই ঠাকুর মহাশয় কি তবে প্রেমবিলাসকার? কারণ কর্ণানন্দকার যে এই গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থদুটির তালিকার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও মনে হয় কর্ণানন্দের ওপর প্রেমবিলাসের প্রভাব আছে। আচার্যের শাখা বর্ণন লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি আচার্যের শিষ্যদের নাম এমনভাবে আলোচনা করছেন যা থেকে মনে হয় তাঁর প্রাপ্ত সূত্রটি অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ বহু নূতন শিষ্যের নাম এবং অনেক শিষ্যের খানিকটা পরিচয়ও এখানে দেওয়া আছে, যা প্রেমবিলাসে নেই।

হরিদাস দাস বাবাজী কৃত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে শ্রীনিবাসাচার্যের একশত তেতাল্লিশজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। একই নামের একাধিক শিষ্যকে তিনি একই তালিকায় কয়েক ভাগে আলোচনা করেছেন। সেগুলিকে পৃথক করে ধরলে নামের সংখ্যা আরও বেশী বলে ধরা যেতে পারে। গ্রন্থকার এই তালিকা সংগ্রহের জন্য মুখ্যতঃ অনুরাগবল্লী, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের ওপর নির্ভর করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংস্কৃত পুথি আছে। এই পুথির আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাবর্ণন। প্রাপ্ত পুথিটি খণ্ডিত, মাত্র প্রথম দুটি পত্র আছে। শেষাংশ না থাকায় এটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয় নি। তবে এর লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার[৪] এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন[৫]। সেক্ষেত্রে এটিকে আচার্যের প্রায় সমসাময়িক রচনা বলে অনুমান করা যেতে পারে।

আলোচ্য পুথিটির প্রাপ্ত পত্র দুটিতে মোট উনিশটি শ্লোক আছে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটিতে বন্দনা ও অবশিষ্ট চৌদ্দটি শ্লোকে আচার্যের মোট উনপঞ্চাশজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এই পুথির শাখা বর্ণনার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার বিষয়। কর্ণপূর কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক গ্রন্থকার প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে আচার্যের পরিবারবর্গের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর অন্যান্য শিষ্যদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই পুথিতে প্রথমে সস্ত্রীক রামচন্দ্র ও আরও সতেরোজন কবিরাজের নাম দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। প্রাপ্ত উনিশটি শ্লোকের মধ্যে আচার্যের দুই শ্যালক ছাড়া তাঁর পরিবারের আর কারু নাম পাওয়া যায় নি।

---

৪. ষো. শ. প. সা - পৃ. ১০০। ৫. ম. বা. সা. ত. কা. - পৃ. ১১৭

গৌরপদতরঙ্গিণীতে সতেরোজন এমন পদকারের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের নাম আচার্যের শিষ্য-তালিকায় পাওয়া যায়। এই শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে পদকার বলে কয়েকটি শাখাবর্ণনে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই অনুমান করা যায় এই গ্রন্থে উল্লিখিত এই পদকাররা আচার্যশিষ্য হতে পারেন। নানা কারণে অন্যান্য নামগুলি সম্বন্ধে সংশয় আছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত সকল পদকারের জীবনী নিয়েও এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন; সে সময় দুই একজন ছাড়া আলোচ্য পদকারদের কাউকেই আচার্যশিষ্য বলে উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ না করার পক্ষে অবশ্য উপযুক্ত কারণও আছে। সে সময়ে আচার্যশিষ্যদের মধ্যে কারা পদকার ছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও হয় নি। কাজেই এঁদের পরিচয় না পাওয়ায় তিনি বোধহয় সেকথার উল্লেখ করেন নি।

পদকল্পতরুতে ত্রিশজন এমন পদকারের নাম পাওয়া যায় যাঁদের নাম আচার্যের শাখা-বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের কয়েকজনকে পদকার বলে শাখা-বর্ণনগুলিতে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই কল্পতরুতে ধৃত এই সব পদকার কর্তৃক রচিত পদগুলির অন্ততঃ কয়েকটি আচার্য-শিষ্যদের রচনা হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত এই গ্রন্থে ধৃত বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত পদগুলির কথা বলা যেতে পারে। বৃন্দাবনদাস বলতে সাধারণতঃ চৈতন্যভাগবতকারই বোঝায়। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামে যে কয়টি পদ কল্পতরুতে পাওয়া যায় তার সবগুলিই চৈতন্যভাগবতকার কর্তৃক রচিত নয়। এর মধ্যে আচার্যশিষ্য ও কবিরাজ বলে পরিচিত বৃন্দাবনদাসের পদও দুই একটি আছে তা' আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদের পরবর্তী অংশে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব। এছাড়া মোহনদাস নামে একজন পদকারের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আলোকপাত করতে পারেন নি। আচার্যশিষ্যদের মধ্যে মোহনদাস নামে একজন পদকার ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে এই গ্রন্থে ধৃত পদগুলি আচার্যশিষ্য মোহনদাসেরই রচনা। গৌরপদতরঙ্গিণীতেও মোহনদাস রচিত কয়েকটি পদ আছে।

গৌরপদতরঙ্গিণীর মতন এই গ্রন্থেও এমন কয়েকটি পদকারের নাম পাওয়া যায় যাঁদের সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় আজও জানা যায় নি। এসব নাম আচার্যের শিষ্যতালিকায় পাওয়া যায় অথচ পদকার হিসেবে তাঁদের কোনও পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। সম্পাদক মহাশয়ও এঁদের পরিচয় সম্বন্ধে

বিশেষ আলোকপাত করতে পারেন নি। মনে হয় গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদক যে কারণে আচার্য-শিষ্যদের পরিচয় দিতে পারেন নি, সেই কারণে পদকল্পতরুর সম্পাদকও এসম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারেন নি।

পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া যায়[6]। এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীনিবাসাচার্যের ও পরবর্তী অংশে নরোত্তম ঠাকুরের কয়েকজন শিষ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ধবদাস আচার্যের বংশধর রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই তালিকাটির খানিকটা গুরুত্ব আছে। এর প্রথমাংশে ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে আচার্যের এমন কয়েকজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় যাঁদের এই পরিচয় সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য এযাবৎ পাওয়া যায় নি। এদিক থেকে বিচার করলে এই তালিকার খানিকটা গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। এছাড়া এমন কোন নাম এই তালিকায় নেই যা ইতিপূর্বে অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি।

আচার্যের শিষ্যদের যে সব নাম আলোচ্য সূত্রগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—

১। আচার্যের পরিবার ও আত্মীয় শিষ্য,
২। কবিরাজ শিষ্যবর্গ,
৩। আচার্যের সে সব শিষ্য যাঁরা পদকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন,
৪। আচার্যের সেই সব শিষ্য, যাঁদের নামের ভণিতায় পদ পাওয়া যায়, অথচ পদকার হিসাবে কোন সূত্রে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি,
৫। ছয় চক্রবর্তী,
৬। ছয় ঠাকুর,
৭। আচার্যের সেই সব শিষ্য, যাঁরা সপরিবারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং
৮। অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ।

১। আচার্যের পরিবার ও আত্মীয় শিষ্য—ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় আচার্যের প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবীই বোধহয় আচার্যের প্রথম শিষ্য। এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—

আচার্যের বিবাহকালে দীক্ষামন্ত্র দিতে।
ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে[7]॥

প. ক. ত. ৩০৯২ পদ। ৭. ভ. র. ৮।৪১৫

এই বর্ণনার পূর্বে কোথাও আচার্য কর্তৃক কাউকে দীক্ষাদানের কথা এই গ্রন্থে নেই।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যতালিকায় ঈশ্বরী দেবীর নাম গুণলেশসূচকেও পাওয়া যায়। এছাড়া অনুরাগবল্লী, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের শিষ্যতালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায়।

আচার্যের শিষ্যতালিকায় তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় গুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে। গুণলেশসূচকে তাঁর নাম 'গৌরপ্রিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমবিলাসে তাঁর বিবাহপূর্ব নাম বলা হয়েছে পদ্মাবতী। এসম্বন্ধে অপর কোনও গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই।

আচার্যের পরিবারের অন্যান্য যাঁদের তাঁর শিষ্য বলে বিভিন্ন শাখাবর্ণনায় বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আচার্যের পুত্র ও কন্যাদের নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্যের পুত্রকন্যাদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় অনুরাগবল্লীতে। আচার্যের শিষ্যতালিকা বর্ণনা প্রসঙ্গেই এই গ্রন্থে এঁদের সকলের নাম বলা হয়েছে। কিন্তু গুণলেশসূচকে কনিষ্ঠপুত্র গতিগোবিন্দ এবং কন্যা হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কাঞ্চনের নাম ছাড়া আচার্যের অপর পুত্রকন্যাদের নাম পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে যমুনা দেবী ছাড়া অন্যান্য সকল পুত্রকন্যার নাম আচার্যের শিষ্য-তালিকায় পাওয়া যায়। মনে হয় তাঁরা সকলে অনুরাগবল্লীকে অনুসরণ করেছেন।

কর্ণপূর কবিরাজ যখন আচার্যপুত্র বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণ এবং কন্যা যমুনার নাম আচার্যের শিষ্যতালিকায় উল্লেখ করেন নি তখন স্বভাবতঃ আচার্য কর্তৃক তাঁদের দীক্ষাদান প্রসঙ্গে সন্দেহের উদয় হয়। অপর পক্ষে মনোহরদাস আচার্যের শাখাভুক্ত এবং তিনি গুণলেশসূচকের সঙ্গে পরিচিত। সেক্ষেত্রে গুণলেশসূচকে না থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন অনুরাগবল্লীতে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তখন তাঁর উক্তি বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করা কঠিন। এই দুই গ্রন্থের বর্ণনার সামঞ্জস্য রেখে অনুমান করা যেতে পারে বৃন্দাবনদাস, রাধাকৃষ্ণ ও যমুনা দীক্ষান্তে অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন বলে কর্ণপূর কবিরাজ তাঁদের আচার্যের শাখাভুক্ত করেন নি। কিন্তু এঁরা দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে অল্পবয়সে দেহত্যাগ করলেও মনোহরদাস অনুরাগবল্লীতে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।

স্ত্রীপুত্র ও কন্যাদের পর আচার্য-শিষ্যতালিকার অপর উল্লেখযোগ্য নাম হলো তাঁর শ্যালকদ্বয় শ্যামদাস ও রামচরণ চক্রবর্তী। এঁরা দুজনেই আচার্যের প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর ভাই। গুণলেশসূচকে এঁদের দুজনের নাম না থাকলেও অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পুথিতেও এঁদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আচার্যশিষ্য হিসেবে এঁদের স্বীকার করা যেতে পারে। পদকল্পতরুর উদ্ধবদাসের পদটিতে এঁদের দুজনকেই আচার্যশিষ্য এবং ভক্তিগ্রন্থরচনাকার বলে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে আচার্যের শিষ্য হিসাবে তাঁর শ্বশুরদ্বয় গোপাল চক্রবর্তী ও রঘুনন্দন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন শিষ্য-তালিকায় এই নাম দুটি না থাকায় কেবলমাত্র এই দুটি গ্রন্থের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে এঁদের আচার্যের শিষ্য হিসাবে স্বীকার করা যায় না।

রামকৃষ্ণ ও কুমুদ চট্টরাজ দুই ভাই। এঁরা দুজনেই আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে গুণলেশসূচক থেকে প্রেমবিলাস পর্যন্ত সকল গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে। এঁরা সম্পর্কে আচার্যের বৈবাহিক ছিলেন বলে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণের পুত্র গোপীবল্লভ এবং কুমুদের পুত্র চৈতন্য যথাক্রমে হেমলতা ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে বিবাহ করেছিলেন বলে এই গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে। গোপীবল্লভ এবং চৈতন্য আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে গুণলেশসূচক থেকে প্রেমবিলাস পর্যন্ত সকল গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে।

২। কবিরাজ শিষ্যবৃন্দ—আচার্যের যে সব শিষ্য কবিরাজ বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বৈদ্যকুলোদ্ভব চিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ। গুণলেশসূচকে এঁর নাম দিয়ে আচার্যের শাখা বর্ণন আরম্ভ হয়েছে, কাজেই শিষ্য হিসাবে রামচন্দ্রের গুরুত্ব যে অনেকখানি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রেমবিলাসে এবং কর্ণানন্দেও আচার্যের শাখা বর্ণন আরম্ভ হয়েছে রামচন্দ্রের নাম দিয়ে। অনুরাগবল্লীতে আচার্যের নিজ পরিবারের বর্ণনার পর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে রামচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে করা হয়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাওয়া যায়[৮]। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা

---

[৮] চৈ. চ. ১।১১।

হয়েছে। এসম্বন্ধে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের অনুমানকে যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে। তাঁর মতে দুই ভাই পিতার জীবদ্দশাতে নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর তাঁরা শাক্ত হয়ে যান। এরপর অনেক দিন বাদে প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে গোবিন্দদাস আচার্যের কাছে পুনর্দীক্ষা গ্রহণ করেন[9]।

রামচন্দ্রের পর আচার্যশিষ্য হিসাবে গোবিন্দদাস কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। কর্ণপূর কবিরাজ থেকে প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ সকল গ্রন্থেই আচার্যের নিকট তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যে অষ্ট কবিরাজের নাম সুপরিচিত। একসময়ে কবিরাজ বলতে যে মাত্র এঁদেরই বোঝাতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

শ্রীরামচন্দ্রগোবিন্দকর্ণপূরনৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ গোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ[10] ॥

কর্ণানন্দে আচার্যশিষ্য কবিরাজদের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে বিখ্যাত অষ্ট কবিরাজের বর্ণনা দিয়ে অন্যান্য কবিরাজের কথা বলা হয়েছে[11]। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে আট কবিরাজ বলতে এঁদের নামই করা হয়েছে[12]। কাজেই আট কবিরাজ বলতে রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, কর্ণপূর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুলকে বোঝাতো এবং এঁরা যে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য ছিলেন এবিষয়ে দ্বিমত নেই।

কবিরাজ পণ্ডিতের উপাধি এই অর্থে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে এঁদের কবিরাজ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তবে এঁরা শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না। এঁরা সকলেই ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলে পরবর্তীকালেও স্বীকার করা হয়েছে[13]।

রামচন্দ্র কবিরাজ স্মরণদর্পণ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে

---

[9] ম. বা সা. ত. কা. — পৃ. ১৪৪। [10] ঐ-পৃ. ১১৭। [11] ক. ৬ষ্ঠ বি.।
[12] গৌ. বৈ. জী. —শ্রীনিবাসাচার্য দ্রঃ। [13] প ক. ত. ৩০১২ পদ।

জানা যায়[১৪]। এছাড়া দুর্লভামৃত, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা এবং পদ্যমালাও এঁর রচনা বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন[১৫]। এই গ্রন্থগুলি ছাড়া রামচন্দ্র কর্তৃক রচিত কয়েকটি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি পুথিতে রামচন্দ্র ভণিতায় যে সতেরোটি পদ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি এঁর রচনা বলে ডঃ সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন[১৬]। এছাড়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সঙ্কলিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ৪১০ নং পদটিও রামচন্দ্র কবিরাজের বলে ডঃ সেন মনে করেন[১৭]। সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতেও এই পদটি আছে এবং এটি আচার্যশিষ্য রামচন্দ্রের রচনা বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারও স্বীকার করেছেন[১৮]।

ডঃ সেন রামচন্দ্র মল্লিকের ভণিতায় একটি পদ ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই পদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে তাঁর মন্তব্য ছিল যে রচয়িতা সপ্তদশ শতাব্দীর কোন কবি হবেন। তিনি পরবর্তীকালে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' আচার্যশিষ্য রামচন্দ্রকেই এই পদটির রচয়িতা বলে স্বীকার করেছেন[১৯]। 'মল্লিক' পদবী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত যে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে রচিত বলে এখানে তিনি তাঁর পদবীর উল্লেখ করেছেন। ডঃ সেন বিশেষভাবে বিচার করে তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন এবং এসম্বন্ধে অন্ত কোন পণ্ডিতের বিরুদ্ধ তথ্য না পাওয়ায় ডঃ সেনের মতকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রামচন্দ্র কবিরাজের সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যপ্রভোরষ্টকম্' হরিদাস বাবাজী তাঁর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-গ্রন্থমালায় প্রকাশ করেছেন।

রামচন্দ্র ভণিতায় পদকল্পতরুতে দুটি ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে তিনটি পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি পদ দুটি গ্রন্থেই থাকায় রামচন্দ্র ভণিতায় এই গ্রন্থদুটিতে প্রাপ্ত পদসংখ্যা দাঁড়ায় চার। এই রামচন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে গ্রন্থদুটির সম্পাদকদ্বয় কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুমান ইনি বংশীবদনের বংশধর রামচন্দ্র হবেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর ৩৩৩ পৃষ্ঠায় ধৃত 'হা হা মোর কি ছার অদৃষ্ট' পদটি যে এঁর রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থদ্বয়ে ধৃত এই ভণিতায় রচিত পদগুলিও এঁরই রচনা বলে অনুমান হয়।

গোবিন্দদাসের পদ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ডঃ

---

[১৪] ঘো. শ. প. সা. —পৃ. ১০১ [১৫] বা. সা. ই—পৃ. ৪৬৭ [১৬] ঐ [১৭] ঐ
[১৮] গো. প. তাঁ. মু. ভূমিকা [১৯] বা. সা. ই. —পৃ. ৪৬৭

বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সাতশতাধিক পদের সংকলন প্রকাশ করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে গোবিন্দদাসের কবি-প্রতিভা ও পদ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ বিশেষ নেই। তবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে পদাবলী সাহিত্যে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে আমরা সামান্য আলোচনা করেছি।

কর্ণপূর কবিরাজ কর্তৃক রচিত ‘শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচকের একটি শ্লোকই এযাবৎ নরোত্তমবিলাসের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছিল। হরিদাস দাস বাবাজী এই রচনার দুটি পুঁথি বরানগর ও বৃন্দাবনে আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছেন। এটি ছাড়া তাঁর অপর কোনও রচনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। গুণলেশসূচকে আচার্যের শিষ্যতালিকায় তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। পুঁথি সমেত সকল গ্রন্থে আচার্যশিষ্য হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি বুধুরীর নিকটবর্তী বাহাদুরপুর নিবাসী ছিলেন[২০]।

নৃসিংহ নামে আচার্যের দুজন শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা দুজনেই কবিরাজ আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের একজন কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী ছিলেন। এঁর এক ভাইএর নাম ছিল নারায়ণ কবিরাজ। দ্বিতীয়জন মানভূমের একজন সামন্তরাজ ছিলেন[২১]। এঁদের কোন্ জন অষ্ট কবিরাজের অন্যতম ছিলেন বলা কঠিন। পুঁথিতে বর্ণিত অন্যান্য কবিরাজ-শিষ্যদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

নৃসিংহ কবিরাজ কর্তৃক রচিত নবপদ্যের দুটি শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ রচনাটি এযাবৎ পাওয়া যাচ্ছিল না। হরিদাস দাস বাবাজী শ্রীনিবাসাচায-গ্রন্থমালায় কলানিধি চট্টরাজ কর্তৃক রচিত ‘আদেশামৃতস্তোত্রম্’ নামে যে রচনাটি প্রকাশ করেছেন সেটিকে নানা কারণে নৃসিংহ কবিরাজ কর্তৃক রচিত নবপদ্য বলে আমরা অনুমান করি। এছাড়া নৃসিংহ দেব ভণিতায় পদকল্পতরুতে যে পদগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলিও প্রকৃত পক্ষে কার রচনা তা আলোচনার বিষয়। অপর নৃসিংহ কবিরাজ সম্বন্ধে আলোচনার সময় এঁদের দুজনের রচনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করা হবে।

অষ্ট কবিরাজের অন্যতম ভগবান কবিরাজের নাম গুণলেশসূচকে পাওয়া

---

[২০] গৌ· বৈ· জী.

[২১] ষো শ. প. সা —পৃ. ১০১

যায় না। এছাড়া অপর সকল গ্রন্থে আচার্যশিষ্য হিসাবে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরাগবল্লীতে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বীরভূমে যে তিনজন প্রধান বৈদ্যরাজ ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভগবান কবিরাজের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। অপর দুজন হলেন যথাক্রমে তাঁর অনুজ রূপ কবিরাজ ও ভগবানের পুত্র নিমু কবিরাজ। উদ্ধবদাসের পদে তাঁকে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা বলে স্বীকার করা হলেও তাঁর কোন রচনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি।

গুণলেশসূচকে আচার্যশিষ্য তালিকায় বল্লবী কবিরাজের নামও পাওয়া যায় না। অনুরাগবল্লীতে এক বল্লবীদাস কবিরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে বল্লবীকান্ত কবিরাজ বলে যঁার কথা বলা হয়েছে অনুমান করা যায় তিনিই অনুরাগবল্লীতে উল্লিখিত বল্লবীদাস হবেন। উদ্ধবদাসের পদেও এঁকে বল্লবীদাস বলা হয়েছে। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে এঁকে বল্লবী কবিপতি বলা হয়েছে। বল্লবী কবিরাজ বনবিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। রামদাস ও গোপালদাস নামে তাঁর দুই ভাইও আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। প্রেমবিলাসে আচার্য শাখাবর্ণন প্রসঙ্গে পাওয়া যায়—'রামদাস, গোপালদাস বল্লবী কবিপতি। আচার্যের তিন শিষ্য বুদ্ধে বৃহস্পতি'। মনে হয় এই রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হরিদাস দাস বাবাজী একথা বলে থাকবেন। কিন্তু এখানে একথা স্পষ্ট করে বলা নেই যে এঁরা তিন ভাই। একথা অপর কোন গ্রন্থেও উল্লেখ করা নেই যে এঁরা তিন ভাই ছিলেন। কাজেই দাস বাবাজীর এই উক্তিকে স্বীকার করা যায় না। বল্লবী কবিরাজকে ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা বলে উদ্ধবদাসও তাঁর পদে উল্লেখ করেছেন।

বল্লবীদাসের কোনও পদ এযাবৎ পাওয়া যায় নি বলে ডঃ মজুমদার অভিমত প্রকাশ করেছেন[২২]। গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে বল্লভ ও বল্লভদাস ভণিতায় বহু সংখ্যক পদ ধৃত হয়েছে। গৌরপদতরঙ্গিণীকার এই নামের দশজনের পরিচয় দিয়ে এঁদের মধ্যে পদকার কোন্ জন তা নির্ণয় করেন নি। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে পদকার নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। কিন্তু এই দুই গ্রন্থেই বল্লভ ভণিতায় এমন সব পদ আছে যেগুলো বিশ্লেষণ করলে

---

[২২] ষো. শ. প. সা. পৃ. ১০১

পদকারকে নরোত্তমশিষ্য না বলে আচার্যশিষ্য বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতেও এই পদকার আচার্যশিষ্য[২৩]। তাঁর মতে নরোত্তম-শিষ্যের নাম রাধাবল্লভ। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় বল্লভ ভণিতার যে পদগুলি পাওয়া যায় সেগুলো আচার্যশিষ্যের রচনা। বল্লবী কবিপতি ছাড়া এই নামে আচার্যশিষ্যদের মধ্যে কেউ পদ রচনা করতেন বলে জানা যায় না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এগুলো এঁরই রচনা।

অষ্ট কবিরাজের অন্যতম গোপীরমণ ও তাঁর অনুজ দুর্গাদাসের নাম গুণলেশসূচকে পাওয়া যায়। অনুরাগবল্লীতেও দুই ভাইএর নাম একসঙ্গে উল্লেখ করা আছে। ভক্তিরত্নাকরে গোপীরমণের নাম না পাওয়া গেলেও খেতরীর উৎসব উপলক্ষ্যে নরহরি নরোত্তমবিলাসে তাঁর উল্লেখ করেছেন। প্রেমবিলাসে তাঁকে 'বৈদ্যজাতি' ও কর্ণানন্দে 'বৈদ্যমহাশয়' বলা হয়েছে। পুথিতেও প্রথম আটজন কবিরাজের মধ্যে গোপীরমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি গোয়াসের অধিবাসী ছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলা হয়েছে।

ষোড়শ সাহিত্যের পদাবলী সাহিত্যে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অষ্ট কবিরাজকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করলেও একই সময়ে তাঁর প্রকাশিত অপর গ্রন্থ—'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' এ তিনি মাত্র সাতজনকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। ভক্তিরত্নাকরে কবিরাজদের নাম আলোচনা-কালে গোপীরমণের নামের উল্লেখ না থাকায় তিনি এই গ্রন্থে তাঁকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করেন নি[২৪]। অথচ অষ্ট কবিরাজের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি কর্ণানন্দের যে শ্লোকটি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন তাতে আচার্যশিষ্য বলে অন্যান্যদের সঙ্গে গোপীরমণের নাম উল্লেখ করা আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে গোপীরমণ কবিরাজের নাম ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত নেই। কিন্তু এই গ্রন্থে কোনও নামের উল্লেখ না থাকলে তিনি আচার্যের শিষ্য নন এমন কথা মনে করার কোনও যুক্তি নেই। তার প্রধান কারণ—এই গ্রন্থে আচার্যের শাখা-বর্ণনা নেই, ঘটনা প্রসঙ্গে শিষ্যদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। দশম তরঙ্গের যে ছত্রগুলো উল্লেখ করে ডঃ মজুমদার গোপীরমণ কবিরাজের শিষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেটি আচার্যের খেতরি যাত্রার পূর্বে বুধরিগ্রামে যেবার তিনি গোবিন্দ কবিরাজকে দীক্ষাদান করেন সেবারের সঙ্গী-শিষ্যদের নামের তালিকা মাত্র। হতে পারে গোপীরমণ তখনও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি বলেই তাঁর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় নি।

গোপীরমণ নামে তাঁর এক শিষ্য ছিল বলেই এই গ্রন্থের চতুর্দশ তরঙ্গে যে গোপীরমণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাকে হৃদয়ানন্দশিষ্য বলে পৃথক করা হয়েছে।

গোপীরমণ ভণিতায় একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় (১৬০৮)। ডঃ সুকুমার সেনের মতে পদকার আচার্যশিষ্য কিংবা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত অম্বিকা কালনার হৃদয়ানন্দশিষ্য হতে পারেন। সতীশ রায় মহাশয় উদ্ধবদাসের পদ উদ্ধৃত করে এঁকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। হৃদয়ানন্দশিষ্য গোপীরমণ চক্রবর্তী পদ রচনা করতেন বলে কোনও প্রমাণ নেই। কাজেই এই পদটির রচয়িতা অষ্ট কবিরাজের অন্যতম গোপীরমণ বলে স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই।

গুণলেশসূচকে এক গোকুলের নাম পাওয়া যায়। অনুরাগবল্লীতে 'প্রেমপূর' শ্রীগোকুলদাস কবিরাজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর আদি নিবাস ছিল কড়ুই। পরবর্তীকালে তিনি পঞ্চকূটের অন্তর্গত সেরগড়ের অধিবাসী হয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে এই বক্তব্যের সমর্থন আছে। কর্ণানন্দের বর্ণনায় এক গোকুলদাসের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পরিচয়ে জানা যায় তিনি কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্যের পুত্র। এঁকে অন্যান্য গ্রন্থে গোকুলানন্দ বলা হয়েছে। কর্ণানন্দের অন্যত্র একজন গোকুলানন্দের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি। ইনি আচার্যের অপর শিষ্য গোকুলানন্দ চক্রবর্তী থেকে যে পৃথক ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, যে গোকুলানন্দের পরিচয় যদুনন্দন দেন নি, তিনি আমাদের আলোচ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম গোকুলদাস হবেন।

উদ্ধবদাসের পদটিতে দুজন গোকুলের নাম পাওয়া যায়। এক ক্ষেত্রে 'শ্রীদাস গোকুলানন্দ' ও অপরক্ষেত্রে 'ভগবান গোকুলাখ্যান' বলা হয়েছে। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে হরিদাসাচার্যের পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের কথা বলা হয়েছে বলে অনুমান কর' যেতে পারে। ভগবান কবিরাজের সঙ্গে যে গোকুলের কথা বলা হয়েছে তিনি সম্ভবতঃ আমাদের আলোচ্য অষ্ট-কবিরাজের অন্যতম গোকুল।

উদ্ধবদাসের পদটিতে দুজন গোকুলকেই ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা বলা হয়েছে। পদকল্পতরুতে গোকুল ও গোকুলানন্দ এই দুই ভণিতায় দুটি প দপাওয়া যায়।

পদকর্তাদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পদকল্পতরুর সম্পাদক মহাশয় যে এই গোকুলকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন তা তাঁর রচনায় প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি 'শ্রীদাস গোকুল' বলতে 'শ্রীগোকুলদাস' বলে একজন পদকার ধরে নিয়েছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় অবশ্য রায় মহাশয়ের এই ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন। উদ্ধবদাসের পদ উল্লেখ করেও রায় মহাশয় গোকুল ও গোকুলানন্দকে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন কেন বোধগম্য হলো না। গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় অবশ্য এঁদের দুজনকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোকুলদাস ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে গোকুলদাস ভণিতায় যে পদটি পাওয়া গিয়েছে সেটি যে আচার্যশিষ্য আমাদের আলোচ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম গোকুলদাসের রচনা, সেকথা ডঃ সুকুমার সেন[২৫] ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার[২৬] স্বীকাব করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাপ্ত পুথিতে বন্দনার পর ষষ্ঠ থেকে দশম—এই পাঁচটি শ্লোকে মোট আঠারোজন কবিরাজের কথা বলা' হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে শ্লোকগুলিকে উদ্ধৃত করা হলো—

সস্ত্রীকো (কৌ) রামচন্দ্র-শ্রীগোবিন্দ-কবি-পার্থিবৌ।
তৎপুত্রোদিব্যসিংহাখ্য (ঃ) কবিরাজশ্রিয়া যুতঃ ॥ ৬ ॥
কর্ণপূরোনৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।
বল্লবীদাস-কবিরাজঃ শ্রীগোপীরমণ-গোকুলৌ ॥ ৭ ॥
কবিরাজৌ বাসুদেব-শ্রীবৃন্দাবনদাসকৌ।
বনমালিকবিনৃপঃ শ্রীদুর্গাদাস-শ্রীরূপকৌ ॥ ৮ ॥
সোদররূপকবিরাজ-শ্রীনিমাঞিকবিভূমিপঃ।
তয়োর্বিমাতৃজঃ শ্যামদাসঃ কবিমহীপতিঃ ॥ ৯ ॥
নারায়ণ-কবিখ্যাতকঃ শ্রীনৃসিংহসহোদরৌ।
অষ্টাদশ-ইমে খ্যাতাঃ কবিরাজ-মহীতলে ॥ ১০ ॥

পুথিতে লিপিকর-প্রমাদ থাকায় এখানে বানানগুলো শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রমাদের জন্য কয়েকক্ষেত্রে খানিকটা সংশয় বর্তমান। যেমন সপ্তম শ্লোকে 'বল্লবীদাস-কবিরাজৌ' লেখা ছিল। দ্বিবচনার্থে 'কবিরাজৌ'

---

[২৫] H. B. L. —পৃ ১৮৭ ' [২৬] ষো. শ. প. সা. —পৃ. ১০১

ব্যবহার করায় বল্লবীদাস নামে দুজন কবিরাজকে স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীদাস নামে আচার্যের একজন শিষ্য ছিলেন—একথা গোকুলদাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। আবার নবম শ্লোকে দ্বিবচনার্থক 'কবিভূমিপৌ' শব্দটিকে সঠিক বলে স্বীকার করলে এখানে রূপ কবিরাজ ও নিমাঞি কবিরাজকে স্বীকার করতে হয়। এই দুইক্ষেত্রে সঠিকভাবে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে স্বীকার করলে কবিরাজের সংখ্যা উনিশজন হয়। আবার এই দুই ক্ষেত্রে একবচন ধরলে সতেরোজন কবিরাজের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দশম শ্লোকে পরিষ্কারভাবে অষ্টাদশজন কবিরাজের কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে এখানে দুটির একটি ক্ষেত্রে কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই ভুল আছে। যেহেতু বল্লবীদাস একটি নাম এবং শ্রীদাসকে পৃথকভাবে উল্লেখ করলে বল্লবী-শ্রীদাস বলে উল্লেখ করা উচিত ছিল সেজন্য এখানকার দ্বিবচনার্থক 'কবিরাজৌ' ভুল করে লেখা হয়েছে ধরে নিয়ে এটিকে সংশোধন করে 'কবিরাজঃ' পাঠ ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'সোদর রূপ কবিরাজ এবং নিমাই কবিরাজ।' কিন্তু এই পূর্ব ছত্রেই একজন রূপ কবিরাজের কথা বলা হয়েছে, এবং আচার্যশিষ্য-তালিকায় দুজন রূপের নাম থাকলেও একজন রূপ কবিরাজ নামে এবং দ্বিতীয়জন রূপ ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। কাজেই এই অর্থকে ঠিক বলে ধরা যায় না। সেক্ষেত্রে 'কবিভূ মপৌ' এর পরিবর্তে 'কবিভূমিপঃ' নির্ভুল পাঠ ধরলে অর্থ হয় 'সহোদরপ্রতিম শ্রীনিমাই কবিরাজ'। পূর্ববর্তী ছত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে অর্থ করে নেওয়া চলে নিমাই কবিরাজ রূপ কবিরাজের সহোদরপ্রতিম ছিলেন।

এই দুই ক্ষেত্রের ত্রুটি সংশোধন করে নিলে কবিরাজের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে সতেরোজন। এবার সমস্যা থাকে অষ্টাদশ কবিরাজ তাহলে কে কে? ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি আচার্যের দুজন শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। এঁদের একজন অর্থাৎ মানভূমের সামন্তরাজ নৃসিংহ দেবকে অষ্ট কবিরাজের অন্যতম ধরলে বাকী থাকে নারায়ণ-সহোদর ও কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী নৃসিংহ কবিরাজ। দশম শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে "নারায়ণ-কবিখ্যাতঃ শ্রীনৃসিংহসহোদরঃ'। এর অর্থ হয় 'নৃসিংহ কবিরাজের সহোদর নারায়ণ'। কিন্তু "সহোদরৌ" নির্ভুল পাঠ ধরলে 'নারায়ণ কবিরাজ এবং তাঁর সহোদর নৃসিংহ' এই অর্থ করা যায়। সেক্ষেত্রে 'সহোদরঃ'- র পরিবর্তে 'সহোদরৌ'

নির্ভুল পাঠ ধরে নেওয়া হয়েছে। এবার গ্রন্থকার বর্ণিত অষ্টাদশ কবিরাজের নাম পেতে কোন অসুবিধা হয় না।

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে আচার্যের আঠারোজন কবিরাজ শিষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে বলে দশম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের পূর্বে আলোচিত আটজন কবিরাজের নাম বাদ দিলে আমাদের বর্তমান পাঠ অনুসারে যে দশজনের নাম এখানে পাওয়া যায় সেগুলি হলো যথাক্রমে—দিব্যসিংহ, বাসুদেব, বৃন্দাবনদাস, বনমালী, দুর্গাদাস শ্রীরূপ, নিমাই, শ্যামদাস, নারায়ণ এবং তাঁর ভাই নৃসিংহ; কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্যাসে অষ্ট কবিরাজ সমেত আরও যে সব কবিরাজের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নাম যথাক্রমে—দিব্যসিংহ, বাসুদেব, বৃন্দাবনদাস, বনমালী, দুর্গাদাস রূপ কবিরাজ, নিমাই, শ্যামদাস ও নারায়ণ। দেখা যাচ্ছে পুথিতে বর্ণিত তালিকার সঙ্গে কর্ণানন্দের তালিকার শুধু নামেরই নয়, ক্রমেরও আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। পুথির অশুদ্ধ পাঠ মতন এখানেও মোট সতেরোজনের নামই পাওয়া যাচ্ছে। দুটির তালিকার সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় কর্ণানন্দকার এই পুথির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তিনি এখানে বর্ণিত নামগুলি তাঁর গ্রন্থে তালিকাভুক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি অশুদ্ধ পাঠ থেকে পুথিতে উক্ত আঠারোজন কবিরাজের মধ্যে অষ্টাদশ জনের সন্ধান পান নি।

কবিরাজ গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ যে আচার্যের শিষ্য ছিলেন সে কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখেছি। এখন পুথি ও কর্ণানন্দের কবিরাজ-তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ধবদাসের তালিকায়ও ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি, তবে এঁর ভণিতায় একটিমাত্র পদ সংকীর্তনামৃতে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন[২৭], [২৮]। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

গুণলেশসূচকে বাসুদেব কবিরাজের নাম নেই। অনুরাগবল্লীতে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ভক্তিরত্নাকরে তাঁর সম্বন্ধে পৃথকভাবে বলা না হলেও এই গ্রন্থে উল্লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর প্রথম পত্রে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া

---

[২৭] H. B. L. —পৃ. ১৮৪ [২৮] বা. সা. ই. —পৃ. ৪৮২

যায়। এখানে দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্যের কাছে লিখিত পত্রে তিনি জানতে চেয়েছেন ‘শ্রীবাসুদেব কবিরাজ কোথায় কেমন আছেন।’ এই বাসুদেব কবিরাজ যে আচার্যের শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী সে কথা পরবর্তী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন [২৯]। শ্রী জীব গোস্বামী যাঁকে কবিরাজ বলে স্বীকার করেছেন এবং আচার্যের কাছে পত্র লিখে তাঁর সংবাদ জানতে চাইছেন নিঃসন্দেহে তিনি সেকালে একজন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে তাঁকে কবিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। উদ্ধবদাসের পদে অবশ্য এঁর উল্লেখ নেই।

বাসুদেব কবিরাজ রচিত কোন পদের সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি। ডঃ সুকুমার সেন বাসুদেব দাস নামে এক পদকারের দুটি পদের সন্ধান দিয়েছেন। এর প্রথমটি তিনি কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু ও অপরটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি পুথিতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন[৩০]। এই পদকারের কোন পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। উদ্ধৃত পদদুটির মধ্যে শেষোক্ত পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এটি বাসুদেব কবিরাজের হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ আচার্যের শিষ্যমহলে তখন যে রচনাশৈলীর বিকাশ দেখা দিয়েছিল, আলোচ্য পদটিতে তার পূর্ণ প্রভাব বর্তমান।

আচার্য-শিষ্য-তালিকায় মোট তিনজন বৃন্দাবনের নাম পাওয়া যায়। এঁদের কারুরই বিশেষ পরিচয় কোথাও দেওয়া নেই। তবে এঁদের একজনকে বৃন্দাবন কবিরাজ বলা হয়েছে। গুণলেশসূচকে একজন বৃন্দাবনের নাম পাওয়া যায়, ইনি আমাদের আলোচ্য বৃন্দাবন কবিরাজ কি না বলা যায় না। অনুরাগবল্লীতে একজন বৃন্দাবনদাসের নাম পাওয়া যায়, তবে তিনিও কবিরাজ কি না সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কোন উল্লেখ নেই।

ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেন তিনজন বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস।[৩১] তাঁর আলোচ্য দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাস ‘রস-নির্যাস’ নামে এক পদাবলী সংগ্রহের সংকলয়িতা[৩২]। এই সংকলন-গ্রন্থে রসকল্পবল্লী-রচয়িতা গোপালদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির রচিত পদ সংগৃহীত হয়েছে বলে ডঃ সেন লিখেছেন। গ্রন্থের প্রথমে বারটি শ্লোকে চৈতন্যদেব, কৃষ্ণ,

---

[২৯] ভ. র. ১৪।২১ [৩০] H. B. L. —পৃ. ৩৬৪-৬ [৩১] H. B. L. —পৃ. ৬৩
[৩২] ঐ — পৃ. ৩১৭

রাধা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাসাচার্য এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের বন্দনা করা হয়েছে। পুঁথিটি শ্রীখণ্ডে পাওয়া গিয়েছে বলে ডঃ সেন উল্লেখ করেছেন। এই বৃন্দাবন দাসের কোন পরিচয় ডঃ সেন দিতে পারেন নি।

ডঃ সুকুমার সেন অপর এক বৃন্দাবন দাসের রচনার কথা তাঁর এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ৩৩। তাঁর আলোচ্য বৃন্দাবন দাসের সংস্কৃত রচনা তিনি আগে আলোচনা করেছেন। কিন্তু পদকল্পতরুর ৬৬৮, ৫৭৩ ও ২৭১২ সংখ্যক পদ, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুর কয়েকটি পদ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০৫১ সংখ্যক পুঁথিতে ধৃত বিশুদ্ধ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের পদ থেকে তিনি একরূপ নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এগুলি ভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের রচনা নয়। তাঁর এই পদকার বৃন্দাবন দাস রসনির্যাসের সংকলয়িতা বৃন্দাবন দাসও হতে পারেন। ডঃ সেন কর্তৃক আলোচিত এই বৃন্দাবন দাস আচার্যশিষ্য বৃন্দাবন দাস কবিরাজ হওয়া অসম্ভব নয়।

গোপালদাস ও হরিবল্লভ নামে আচার্যের দুজন শিষ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এমন হতে পারে রসনির্ণয়ে এঁদের পদ ধৃত হয়েছে কিন্তু ডঃ সেন এঁদের রামগোপাল ও বিশ্বনাথ বলে ভুল করেছেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃন্দাবনদাস একই ব্যক্তি ও আচার্যশিষ্য হতে পারেন। এই গ্রন্থের গুরু নির্ণয়ের ক্রম থেকেও এই সন্দেহ হয়।

পুঁথি এবং কর্ণানন্দ ছাড়া অনুরাগবল্লীতে বনমালী কবিরাজের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে তাঁর নাম নেই। উদ্ধবদাসের পদেও এঁর উল্লেখ নই। বনমালী কবিরাজের কোন রচনার সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

দুর্গাদাস কবিরাজকে কর্ণপূর কবিরাজ গোপীরমণের অনুজ বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরাগবল্লীতেও বলা হয়েছে যে এঁরা দুই ভাই। প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে এঁরা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। দুর্গাদাস কবিরাজ রচিত কোন গ্রন্থ কিংবা পদ এযাবৎ পাওয়া যায় নি। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায় না।

দুর্গাদাস কবিরাজের পর পুঁথিতে রূপ কবিরাজের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

৩৩, ঐ-পৃ, ৩২১-২

গুণলেশসূচকে রূপের উল্লেখ নেই। অনুরাগবল্লীতে এঁর পরিচয়স্বরূপ বলা হয়েছে যে ইনি ভগবান কবিরাজের ছোট ভাই। ভক্তিরত্নাকর এবং কর্ণানন্দে এই বক্তব্যের পুনরুক্তি করা হয়েছে। প্রেমবিলাসে এঁর উল্লেখ নেই। ভগবান ও রূপ কবিরাজের বাসভূমি বীরভূমে ছিল বলে অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে। এসম্বন্ধে কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি। রূপ কবিরাজের কোন রচনার সন্ধানও পাওয়া যায় নি।

গুণলেশসূচকে নিমাই কবিরাজের নাম না থাকলেও অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে এই নাম পাওয়া যাচ্ছে। তবে অনুরাগবল্লী ও কর্ণানন্দে এঁকে ভগবান কবিরাজের পুত্র এবং ভক্তিরত্নাকরে এঁকে ভগবান কবিরাজের ও রূপ কবিরাজের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলা হয়েছে যে এঁরা চার ভাই ছিলেন। কিন্তু চতুর্থজনের নাম পাওয়া যায় নি। পুথিতে নিমাইকে রূপ কবিরাজের ভাই বলা হয় নি। আমাদের পাঠ সঠিক ধরলে তার অর্থ হয় রূপ কবিরাজের সহোদরপ্রতিম নিমাই। সেক্ষেত্রে অনুরাগবল্লীর বক্তব্যকে ঠিক বলে ধরে নিতে পারি। রূপ ও নিমাই সম্পর্কে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র হলেও কাছাকাছি বয়সের এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে বোধহয় পুথিতে 'সহোদরপ্রতিম' বলা হয়েছে।

পুথি ও কর্ণানন্দ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে শ্যামদাস কবিরাজের নাম পাওয়া যায় নি। পুথিতে এঁকে নিমাই কবিরাজের বৈমাত্রেয় ভাই বলা হয়েছে। পুথি ও অনুরাগবল্লীর বিবরণকে গ্রাহ্য করলে স্বীকার করতে হয় ভগবান কবিরাজের দুই বিবাহ ছিল এবং ইনি তাঁর অপর পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলা হয়েছে ইনি শ্রীদাস কবিরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় নি। বরং উদ্ধবদাসের পদটিতে 'শ্রীদাস গোকুলানন্দ'কে একসঙ্গে উল্লেখ করাতে মনে হয় পদকর্তা এখানে হরিদাসাচার্যের পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের কথা বলতে চেয়েছেন। এই শ্রীদাসের নাম যে শ্যামদাস ছিল সে কথাও কোন গ্রন্থে বলা নেই। কাজেই উপযুক্ত তথ্যের অভাবে হরিদাস দাস বাবাজীর বক্তব্যকে বর্তমানে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে শ্যামদাস ভণিতায় কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এছাড়া সংকীর্তনামৃতে একটি বাংলা ও দুটি ব্রজবুলিতে রচিত পদ এবং অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ব্রজবুলিতে পাঁচটি পদ সমেত মোট এগারোটি পদ

পাওয়া গিয়েছে।

পদকর্তা শ্যামদাস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য মোট চারজন শ্যামদাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন[৩৪]। এঁরা হলেন আচার্যের শ্যালক শ্যামদাস চক্রবর্তী, শ্যামদাস চট্ট, ব্যাসাচার্যের পুত্র শ্যামদাস এবং শ্যামসুন্দর দাস। এখানে শ্যামদাস কবিরাজের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, হয় তিনি সে সময়ে এঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে খোঁজ পান নি কিংবা এঁদের মধ্যে একজন কবিরাজ ছিলেন বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে দেখা যেতে পারে এঁদের কাকে কবিরাজ বলে স্বীকার করা যায়।

আচার্যের শ্যালক শ্যামদাস যে কবিরাজ নন সে কথা পুথি থেকে প্রমাণ করা যায়। গ্রন্থকার নিমাই কবিরাজের বৈমাত্রেয় ভাই শ্যামদাস এবং আচার্য শ্যালক শ্যামদাসের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। কর্ণানন্দে শ্যামদাস চট্ট ও শ্যামদাস কবিরাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যাসাচার্যের পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্তীকেও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার বাকী থাকে শ্যামসুন্দর দাস। তিনি যে পদরচয়িতা নন সেকথা ডঃ সেন নিজেই স্বীকার করেছেন। সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয় শ্যামদাস কবিরাজ ডঃ সেন কর্তৃক আলোচিত চারজন শ্যামদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি।

ডঃ সেন তাঁর আলোচনায় শ্যামদাস ভণিতায় রচিত পদগুলির প্রশংসা করেছেন। সেক্ষেত্রে অন্যান্য শ্যামদাসরা যখন পদ-রচয়িতা বলে পরিচিত নন তখন এই রচনাগুলিকে শ্যামদাস কবিরাজের রচনা বলে স্বীকার করলে বোধহয় অযৌক্তিক হয় না।

পদকল্পতরুর সম্পাদক মহাশয় শ্যামদাসের পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নি। তিনি ভক্তিরত্নাকরে আচার্য-শ্যালক শ্যামদাসের নাম পেয়ে এবং গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করে পদকল্পতরুতে ধৃত পদগুলি আচার্য-শ্যালকের রচনা বলে স্বীকার করেছেন, যদিও গ্রন্থে ধৃত পদগুলির প্রকৃত রচয়িতা কে সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি।

---

[৩৪] H. B. L. পৃ. ১৭৮-৯

গুণলেশসূচকে আচার্যের শিষ্যতালিকায় একজন নারায়ণের উল্লেখ আছে। অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে এঁকে নৃসিংহদাস কবিরাজের ভাই নারায়ণ কবিরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এঁর উল্লেখ থাকলেও বিশদ পরিচয় দেওয়া হয় নি। এঁর রচিত কোনও পদ কিংবা গ্রন্থের সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে দুই নৃসিংহ কবিরাজ ছিলেন। এঁদের একজনকে মানভূমের সামন্তরাজ, অপরজনকে নারায়ণ কবিরাজের ভাই ও কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী নৃসিংহ কবিরাজ ধরে নিলে পুথিতে মোট আঠারজন কবিরাজের নাম পাওয়া যাচ্ছে বলে স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে এ কথাও তবে স্বীকার করতে হয় যে পুথিতে সামন্তরাজ নৃসিংহদেবকেই প্রধান অষ্ট কবিরাজের অন্যতম বলা হয়েছে। দ্বিতীয় নৃসিংহের পরিচয় হিসাবে নারায়ণের ভাই বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সমস্যা থেকে যায় যে নবপদ্য তবে কার রচনা? সামন্তরাজ যদি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম হন তবে এই নবপদ্য যে তাঁরই রচনা সে কথা মনে করার অবশ্য কোনও যুক্তি নেই, কারণ নরহরি চক্রবর্তী রচনাকারের কোন পরিচয় দেন নি। অষ্ট কবিরাজের মধ্যে নৃসিংহ কবিরাজের নাম পেয়ে এটি তাঁর রচনা বলে আমরা অনুমান করে নিয়েছি মাত্র। অবশ্য এমন হওয়াও সম্ভব যে এটি কাঞ্চনগড়িয়াবাসী নারায়ণ-ভ্রাতা নৃসিংহ কবিরাজের রচনা।

কর্ণানন্দে কাঞ্চনগড়িয়াবাসী নৃসিংহ কবিরাজ ছাড়া বনবিষ্ণুপুরবাসী একজন নরসিংহ কবিরাজের কথা বলা হয়েছে। কর্ণানন্দের বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করলে সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আচার্যের তিনজন একই নামের শিষ্য ছিলেন এবং এঁরা তিনজনই কবিরাজ ছিলেন। কিন্তু একথা কোথাও বলা হয় নি। মনে হয় কর্ণানন্দে সামন্তরাজ নৃসিংহদেবই ভ্রমক্রমে বনবিষ্ণুপুরবাসী বলে উল্লিখিত হয়ে থাকবেন।

পদকল্পতরুতে নৃসিংহদেবের ভণিতায় দুটি পদ পাওয়া যায়। এছাড়া নরসিংহদেব ভণিতাযুক্ত একটি পদও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সংকীর্তনামৃতেও নরসিংহদেব ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গিয়েছে বলে ডঃ সেন জানিয়েছেন[৩৫]। নৃসিংহ ভণিতাযুক্ত পদদুটি যে আচার্য-শিষ্যের রচনা সে বিষয়ে সকল পণ্ডিত

---

৩৫. H, B. L. পৃ. ১০৭

একমত। তবে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে ইনি নারায়ণভ্রাতা নৃসিংহ, কারণ তাঁর মতে এই পদদুটিতে পদকারের সংস্কৃত ভাষায় দখলের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যেহেতু নৃসিংহের ভণিতায় দুটি শ্লোকের উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া গিয়েছে অতএব ইনি আচার্যের বিখ্যাত পদকার শিষ্য কবি নৃসিংহ হবেন। নরসিংহ ভণিতাযুক্ত পদটিও এঁর বলে তিনি অনুমান করেছেন।

নৃসিংহ ভণিতাযুক্ত পদদুটি আচার্য শিষ্যের রচনা বলে ডঃ মজুমদারও স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে ইনি সামন্তরাজ নৃসিংহদেব। নরসিংহদেব ভণিতাযুক্ত পদটি সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। মনে হয় ইনি নৃসিংহদেব থেকে পৃথক ব্যক্তি বলে তাঁর ধারণা ছিল।

নরসিংহদেবকে আচার্যশিষ্য বলে ডঃ সুকুমার সেন স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ইনি নরোত্তমশিষ্য। কিন্তু নরোত্তমশিষ্য নরসিংহ পদকার ছিলেন বলে কোন উল্লেখ এযাবৎ পাওয়া যায় নি। কাজেই ডঃ সেনের অভিমতকে স্বীকার করা যায় না।

মনে হয় নৃসিংহদেব ও নরসিংহদেবকে পৃথক ব্যক্তি বলে স্বীকার করার কোন কারণ নেই। সে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা যেতে পারে ইনি আচার্যশিষ্য সামন্তরাজ নৃসিংহ। কারণ দুটি ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে 'দেব'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করার বিষয়। অনুমান করা যায় যে নৃসিংহ নামে আচার্যের দুজন পদকার শিষ্য থাকায় কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী নৃসিংহ থেকে নিজেকে পৃথক করার জন্য মানভূমরাজ নিজের নামের সঙ্গে 'দেব' উপাধি ব্যবহার করে থাকবেন। সামন্তরাজ হিসাবে 'দেব' উপাধি ব্যবহার অসঙ্গত নয় বলে অনুমান করা যেতে পারে।

সামন্তরাজ নৃসিংহ 'নৃসিংহদেব' নামে পরিচিত ছিলেন বলে স্বীকার করে নিলে মনে হয় অপরজন 'নৃসিংহ কবিরাজ' বলে পরিচিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে নবপদ্য দ্বিতীয়জনের রচনা বলে স্বীকার করা যায় কারণ ভক্তিরত্নাকরকার তাঁকে নৃসিংহ কবিরাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্যাসে অষ্ট কবিরাজ সমেত মোট উনিশজন কবিরাজের নাম বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা যা দেখেছি তাতে অনুমান করা চলে যে কর্ণানন্দকার পুঁথির পাঠ থেকে মোট সতেরোজনের নাম পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁদের কথা প্রথমে বলেছেন। পরে আরও দুটি নাম তিনি এই

তালিকায় যোগ করেছেন। এঁদের মধ্যে সতেরোজন সম্বন্ধে আমরা এপর্যন্ত আলোচনা করেছি। অবশিষ্ট যে দুজন কবিরাজের কথা এই গ্রন্থে বলা হয়েছে তাঁরা হলেন বল্লবী কবিরাজের দুই ভাই রামদাস এবং তাঁর অনুজ গোপালদাস।

গুণলেশসূচকে ও অনুরাগবল্লীতে একজন রামদাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর কোনও পরিচয় এই দুই গ্রন্থে দেওয়া নেই। ভক্তিরত্নাকরে কোনও রামদাসের উল্লেখ নেই। কর্ণানন্দে আচার্যশিষ্য-তালিকায় ও পুথিতে একাধিক রামদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের কাউকেই কবিরাজ কিংবা বল্লবী কবিরাজের ভাই বলে বলা হয় নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে একজন রামদাসের কথা বলা হয়েছে। এঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ইনি বল্লবী কবিপতির পুত্র এবং বনবিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। বর্ণনার প্রথমাংশ, অর্থাৎ রামদাস কবিপতির পুত্র ছিলেন—একথা ভুল বলে মনে হয়। বল্লবীদাস বনবিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। রামদাসও বনবিষ্ণুপুরের অধিবাসী হতে পারেন।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য-তালিকায় অনেক গোপালদাসের নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু বল্লবী কবিপতির ভাই বলে এঁদের কারও পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে বল্লবী ও রামদাসের ভাই হিসাবে একজন গোপাল দাসের নাম পাওয়া যায়। কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্যাসে উনিশজন কবিরাজের মধ্যে এঁকেও একজন কবিরাজ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া এঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। পদাবলী সাহিত্যে একজন গোপাল দাসের নাম প্রসিদ্ধ। ইনি রসকল্পবল্লীর রচয়িতা রামগোপাল দাস। গোবিন্দদাসের ভণিতায় পদকল্পতরুতে ধৃত দুটি পদ রসকল্পবল্লীতে তাঁর নামে পাওয়া যায়[৩৬]। এছাড়া পদকল্পতরুতে গোপাল দাসের ভণিতায় পাঁচটি ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে একটি পদ পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর একটি পদ গোপালভট্টের রচনা হওয়া সম্ভব বলে ডঃ সেন স্বীকার করেন। অবশিষ্ট রচনা রামগোপাল দাসের বলে তাঁর অনুমান। এর মধ্যে আচার্যশিষ্য গোপাল দাসের রচনা থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়। বিশ্বভারতীর পুথিশালায় প্রাপ্ত একটি পুথি—পদমেরুতে এই ভণিতায় রচিত একটি পদ পাওয়া যায়।

---

৩৬. H. B. L. পৃ ২৬৫।

এটি কোন্ গোপাল দাসের রচনা তা নির্ণয় করা অবশ্য কঠিন কাজ।

এই প্রসঙ্গে পদমেরুর খানিকটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনাতেও এই পুথির কথা উল্লেখ করেছি। এই পুথির সঙ্কলয়িতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত পুথির লিপিকাল ১২৬৪ সাল। পুথিতে চার রকমের হস্তাক্ষর আছে। এর প্রাচীনতমটি ১২১০। ১২ সালের হবে বলে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অনুমান করেন[৩৭]। এই বৃহৎ পুথির পদসংখ্যা মোট ১৪৬০। পুথিটি অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত আছে।

৩। **আচার্যের পদকার শিষ্যবৃন্দ**—কবিরাজ খ্যাতি সম্পন্ন যে কুড়িজন আচার্যশিষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হলো এঁদের ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম উদ্ধবদাসের পদে পাওয়া যায় যাঁদেব ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা বলে তিনি পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা হলেন—আচার্যপুত্র গতিগোবিন্দ অথবা গোবিন্দগতি, শ্রীদাস, গোকুলানন্দ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, রামচরণ, ব্যাসাচার্য এবং শ্যামদাস চক্রবর্তী।

গতিগোবিন্দ কর্তৃক রচিত নিত্যানন্দ বিষয়ক দুটি পদ গৌরপদতরঙ্গিণী'ত ধৃত হয়ে.ছ। এই পদ দুটির একটি পদকল্পতরুতেও ধৃত হয়েছে। তৃতীয় একটি পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৪১৬ সংখ্যক পুথিতে পেয়েছেন বলে ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ ক'রছেন[৩৮]। এছাডা তিনি বীররত্নাবলী নামে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের প্রশস্তিমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটি চারটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

হরিদাসাচার্যের পুত্র শ্রীদাস যে আচার্য-শিষ্য ছিলেন একথা প্রায় সকল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা ছিলেন সে কথা একমাত্র উদ্ধবদাসের রচনা থেকে জানা যাচ্ছে।

হরিদাসাচার্যের অপর পুত্র গোকুলানন্দও ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা ছিলেন বলে উদ্ধবদাস উল্লেখ করেছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোকুলানন্দ ও গোকুলানন্দ দাস ভণিতায় চারটি পদ পাওয়া যাচ্ছে। পদকল্পতরুতে গোকুলানন্দ ভণিতায় যে পদটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। এছাড়া আরও কয়েকটি পদের সন্ধান ডঃ সুকুমার সেন পেয়েছেন[৩৯]। উদ্ধবদাসের বক্তব্য সত্য হলে এগুলি হরিদাসাচার্যপুত্র গোকুলানন্দের রচনা বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

---

৩৭. পু. প. ২য় খণ্ড—পৃ. ১৫৫ ৩৮. H. B. L. পৃ, —২১৩ ৩৯. ঐ পৃ. —১৮৫।

গোবিন্দ চক্রবর্তী, যিনি ভাবুক চক্রবর্তী নামেও বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর রচনা সম্বন্ধে নূতন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের নাগর ভাব নিয়ে তিনি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন বলে পদামৃতসমুদ্রের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছেন[৪০]। রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে তাঁর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। পদকল্পতরুতে তাঁর রচিত দশটি পদ পাওয়া যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোবিন্দদাস কবিরাজ ও চক্রবর্তীর রচনা পৃথক করে দেখানো হয় নি। তবে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই পদগুলির মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ মিশে আছে। 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার গোবিন্দ চক্রবর্তীর মোট তেইশটি পদ পৃথক করে প্রকাশ করেছেন।

রামচরণ বলতে আচার্যের শ্যালক ও শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তীকেই বোঝায়। ইনি ছাড়া যখন আচার্যের অপর কোন শিষ্যের এই নাম পাওয়া যায় না, তখন অনুমান করতে হবে ভক্তিগ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে উদ্ধবদাস এঁর কথাই বলেছেন। রামচরণের কোন রচনার সন্ধান অবশ্য বর্তমানে পাওয়া যায় না।

ব্যাসাচার্য ছিলেন বীর হাম্বীরের সভাপণ্ডিত। পরে আচার্য তাঁকে নিজ পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। পুথিতে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ব্যাস ভণিতায় দুটি পদ পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় বীর হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্যের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও এই রচনাদুটি তাঁর কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ এই পদ দুটিতে রাজা কিংবা আচার্যের কোন উল্লেখ নেই। পদ দুটি রূপসনাতন-বন্দনা। সেদিক থেকে বিচার করলেও এই দুটিকে আচার্যশিষ্য ব্যাসাচার্যের রচনা বলে স্বীকার করতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

শ্যামদাস চক্রবর্তী নামে আচার্যের তিনজন শিষ্য ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন আচার্যের শ্যালক, দ্বিতীয়জন ব্যাসাচার্যের পুত্র এবং তৃতীয়জন বাহাদুরপুরের বংশীদাস চক্রবর্তীর ভাই। এখানে উদ্ধবদাস কোন্‌জনের কথা বলতে চাইছেন তা নির্ণয় করা কঠিন। তাছাড়া এই নামের ভণিতায় কোন পদ কিংবা কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ফলে এসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

---

[৪০] বো, শ, প সা, — পৃ. ১০৩

৪। আচার্যের শিষ্যবৃন্দ, যাঁরা পদকার হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত নন—

পদকার হিসাবে স্বীকৃতিলাভ না করলেও বীর হাম্বীর কবি ছিলেন। ভক্তি-রত্নাকর ও বর্ণানন্দে তাঁর রচিত দুটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয় তিনি আর কোনও পদ রচনা করেন নি বলে পদকার হিসাবে স্বীকৃতি পান নি।

আচার্যশিষ্যবৃন্দের মধ্যে অন্যান্য যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন বলে ডঃ সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে মোহনদাস ও রাধাবল্লভ দাস অন্যতম[৪১]। এই প্রসঙ্গে আচার্যশিষ্য বলে তিনি বল্লভ দাস ও যদুনন্দন দাসের নামও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আচার্য-শিষ্য তালিকায় এঁদের নাম পাওয়া যায় না। আচার্যকন্যা হেমলতার শিষ্য তালিকায় অবশ্য এই নাম দুটি পাওয়া গিয়েছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পদকার হিসাবে আচার্যের অন্যান্য যে শিষ্যদের নাম করেছেন তাঁরা হলেন মোহনদাস, বংশীদাস, রাধাবল্লভ ও কবিবল্লভ[৪২]। দেখা যাচ্ছে ডঃ সেন ও ডঃ মজুমদার—এঁরা দুজনেই আচার্য-শিষ্য মোহনদাস ও রাধাবল্লভের পদরচনা সম্বন্ধে একমত। এই দুজন ছাড়া ডঃ মজুমদার আচার্যশিষ্য বংশীদাস এবং কবিবল্লভকেও পদরচয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোহনদাসের ভণিতায় পাঁচটি, পদকল্পতরুতে ত্রিশটি পদ পাওয়া যায়। কীর্তনানন্দে দুটি এবং সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংগৃহীত পুথিতে আরও একুশটি পদ পাওয়া যায় বলে ডঃ সুকুমার সেন জানাচ্ছেন[৪৩]। এছাড়া বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত 'পদমেরু' নামক পুথিতে মোহনদাসের ভণিতায় চৌদ্দটি পদ পাওয়া গিয়েছে।

আচার্যশিষ্য ছাড়া অন্য কোনও মোহনদাস না থাকায় পদকার হিসাবে তাঁকে সকলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পদকল্পতরুতে রাধাবল্লভের ভণিতায় সাতটি পদ পাওয়া যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোট চৌদ্দটি পদ রাধাবল্লভ ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে রূপ সনাতন সম্বন্ধে তিনটি, রঘুনাথ ভট্ট সম্বন্ধে একটি, রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে দুটি, জ্ঞানদাস সম্বন্ধে একটি, নিত্যানন্দ সম্বন্ধে দুটি এবং শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে দুটি পদ পাওয়া যায়।

৪১, বা, সা, ই, — পৃ, ৪৮৬। ৪২. ষো. শ. প. সা. — পৃ. ১০৩ ৪৩. H. B. L. — পৃ. ১৫৬

রাধাবল্লভ নামে আচার্যের মোট তিনজন শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে পদকার কোন্ জন সে বিষয়ে গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুর সম্পাদকদ্বয়ের সংশয় দেখা যাচ্ছে। প্রথম সম্পাদক এঁদের কোন্‌জন পদকার সে সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করেন নি। দ্বিতীয় সম্পাদকের মতে সুধাকর মণ্ডলের পুত্র রাধাবল্লভই পদকার। রসকল্পবল্লীতে রাধাবল্লভ চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এ থেকে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর পদকর্তা হবেন[৪৪]। ডঃ সেনের অভিমত যুক্তিসঙ্গত। রাধাবল্লভ রঘুনাথদাস গোস্বামীকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি সনাতন গোস্বামীর সূচক ও সহজতত্ত্ব নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়[৪৫]।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যতালিকায় কবিবল্লভের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আচার্যের লিপিকারের কাজ করতেন. সেজন্য আঁখরিয়া' কবিবল্লভ নামে আচার্যের শিষ্যসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কবিবল্লভ ভণিতায় পদকল্পতরুতে একটিমাত্র পদ 'সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়' পাওয়া যায়। এই পদটি এককালে বিদ্যাপতির রচিত পদ বলে প্রচলিত ছিল। এই পদের প্রথম কলিতে উজ্জ্বলনীলমণির মতানুমোদিত অনুরাগের লক্ষণ ও পরবর্তী কলিগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদটি শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর পরবর্তী কোনও বঙ্গীয় কবির রচনা বলে পদকল্পতরুর সম্পাদক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন[৪৬]। ডঃ সুকুমার সেনও তাঁর মত সমর্থন করেছেন[৪৭]।

পদকল্পতরুর সম্পাদক আলোচ্য পদটির পদকর্তা কবিবল্লভের পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে কবিবল্লভ, এবং নরোত্তম-শিষ্য শ্রীবল্লভ একই ব্যক্তি। তিনি নিজের নামের আগে কবি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকবেন। এক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতই ঠিক বলে মনে হয়। তাঁর মতে রসকদম্বের রচয়িতা রাজবল্লভপুত্র কবিবল্লভ এই পদটি রচনা করেছেন। সেই হিসাবে এটিকে আচার্যশিষ্য আঁখরিয়া কবিবল্লভের রচনা বলে স্বীকার করা যায় না।

পদকল্পতরুতে বংশীদাস ভণিতায় কোট সতেরোটি পদ পাওয়া যায়।

---

৪. ঐ পৃ. ৪৬৬। ৪৫. প. ক. ত. — পৃ. ৫০। ২০০ ৪৬. ঐ পৃ. ৫৬। ২৯। ৪৭. H. B. L. পৃ. ১৬৪

এছাড়া গৌরপদতরঙ্গিণ তে বংশী ভণিতায় কয়েকটি পদ আছে। পদকল্পতরুতে এঁর পরিচয় সম্বন্ধে সম্পাদক কোন আলোচনা করেন নি। গৌরপদতরঙ্গিণীব সম্পাদক মহাশয়ের আলোচনা দেখে মনে হয় তিনি বংশী ও বংশীবদনকে এক ব্যক্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু এই গ্রন্থে ধৃত পদগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি পদ আচার্যশিষ্য বংশীদাস রচিত বলে ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন[৪৮]।

বংশীদাস ঠাকুর নামে আচার্যের একজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি বাহাদুরপুরের অধিবাসী ছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রাপ্ত পদটি এঁরই রচনা বলে স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে মনে হয় গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে বংশী ও বংশীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির কয়েকটি এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।

এপর্যন্ত শ্রীনিবাসাচার্যের সেই সব শিষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো যাঁরা পদরচয়িতা বলে তৎকালে স্বীকৃতিলাভ না করলেও বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ কর্তৃক পদকার বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সামান্য কয়েকটি পদ রচনা করায় পূর্ববর্তী যুগে তাঁদের পদকার বলে স্বীকার করা হয় নি। এঁরা ছাড়া আচার্যের শিষ্য তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, বিভিন্ন পদাবলী-গ্রন্থে যাঁদের ভণিতায় পদ পাওয়া গিয়েছে। এঁদের পরিচয় সম্বন্ধে সকল পণ্ডিত এখনও নিঃসংশয় হতে পারেন নি। এঁরা হলেন—আত্মাবাম, কৃষ্ণদাস, প্রেমদাস, ব্রজানন্দ, মথুরাদাস, বঘুনাথ, হরিবল্লভ, এবং হরিরাম।

আত্মাবাম ভণিতায় গৌবপদতরঙ্গিণী, পদকল্পতক ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়েছে। আত্মারাম ভণিতার পদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে দ্বিজ গঙ্গারামের ভণিতায় পাওয়া যায়। যেহেতু ক্ষণদাগীতচিন্তামণি পদকল্পতরু থেকে প্রাচীন গ্রন্থ, সেজন্য ডঃ সেন এই গ্রন্থে ধৃত পদটির এ ভণিতাকে ঠিক বলে ধরে নিয়েছেন[৪৯]। এটি দ্বিজ গঙ্গারামের রচিত হলেও অন্যান্য গুলি বোনও এক আত্মারামের রচনা সেকথা অবশ্য সবলেই স্বীকাব করেছেন। এখন সমস্যা এই আত্মারামের পরিচয় কি? গৌরপদতরঙ্গিণীব সম্পাদকের মতে ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দভক্ত ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত। এর স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ দেন নি। পদকল্পতরুর সম্পাদক এই

---

[৪৮] ঐ—পৃ, ৪৮৬-৮। [৪৯] H, B. L, পৃ, ১৪২

মত গ্রহণ করেন নি, কিন্তু এই পদকার কে, সেসম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নি। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে ইনি প্রেমবিলাসকার নিত্যানন্দদাসের পিতা হতে পারেন। প্রেমবিলাস আদৌ জাহ্নবা দেবীর কোন শিষ্য কর্তৃক রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থে প্রদত্ত গ্রন্থকার-পরিচয়কে সত্য বলে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। এঁকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক নিত্যানন্দভক্ত বলে অনুমান করার কারণ হলো এঁর রচিত পদগুলির প্রায় অধিকাংশই নিত্যানন্দের বন্দনা। আচার্যশিষ্য হয়েও পরবর্তী-কালে কেউ নিত্যানন্দের বন্দনাগান করতে পারেন না—একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে আচার্যের অনেক শিষ্য নিত্যানন্দ এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বন্দনা গান করেছেন। কাজেই আলোচ্য আত্মারাম আচার্যশিষ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যতালিকায় দুজন আত্মারামের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের একজন ছিলেন মথুরানিবাসী, অপরজন ছিলেন এদেশীয়। আলোচ্য পদকর্তা আচার্যশিষ্য হলে শেষোক্তজনই পদরচয়িতা হবেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোট আটাশটি পদ কৃষ্ণদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস ভণিতায় একটি, দুঃখী কৃষ্ণদাস ভণিতায় দুটি, দীন ও দীনহীন কৃষ্ণদাস ভণিতায় নয়টি ও কৃষ্ণদাস ভণিতায় এগারোটি পদ পাওয়া যাচ্ছে। অবশিষ্ট পাঁচটি চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যাচ্ছে বলে সম্পাদক এগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বলে স্বীকার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবনীতে মোট তেত্রিশ জন কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সম্পাদক এঁদের মধ্যে উনিশজন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং মোট চৌদ্দজন বাঙ্গালী কৃষ্ণদাসের মধ্যে কারা পদরচয়িতা সে সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

পদকল্পতরুতে কৃষ্ণদাস ভণিতায় মোট বাইশটি পদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের সম্পাদকও মোট এগারোজন কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে আলোচনা করলেও এঁরা দুজনেই তাঁদেব তালিকা থেকে আচার্যশিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টের নাম বাদ দিয়েছেন। ডাঃ সুকুমার সেন অবশ্য অন্যান্য কৃষ্ণদাসের সঙ্গে এঁকেও সম্ভাব্য পদকারের তালিকায় উল্লেখ করেছেন[৫০]।

---

[৫০] ৫০. H. B. L. — পৃ. ৪২০

পদমেরুতে কৃষ্ণদাসের ভণিতায় মোট কুড়িটি পদ পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থে কবি কর্ম্মী কৃষ্ণদাসের ভণিতায় একটি এবং কবি কৃষ্ণদাস ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণদাসের নামের সঙ্গে এই বিশেষণ ইতিপূর্ব্বের কোন পদে পাওয়া যায় নি।

পদমেরুতে যে পদগুলি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে একটিমাত্র পদ পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট উনিশটি পদই নূতন। এর মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও যেমন আছে তেমনি রাধাকৃষ্ণলীলার এমন পদও পাওয়া যায় যা বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্মত। এগুলির মধ্যে 'শ্রমজলে বিথারল দোহ বয়ান' (১৬৩ ক) 'অলসে অবশ অঙ্গ রাধা কান' (১৬৩ ক ও খ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুর সম্পাদকদ্বয় যে সব কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় শ্রীনিবাসাচার্যের পূর্ববর্তী, না হয় তাঁর প্রভাবমুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু এসব পদ থেকে অনুমান করা যায় যে এগুলি আচার্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কোনও পদকারের রচনা। এদিক থেকে বিচার করলে গেলে আচার্যশিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টের পদরচনার সম্ভাবনা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

প্রেমদাসের ভণিতায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে সতেরোটি এবং পদকল্পতরুতে উনিশটি পদ ধৃত হয়েছে। পদমেরুতে মোট আটটি পদ প্রেমদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে চারটি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হয়েছে।

প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী। এছাড়া বংশীশিক্ষা নামে অপর একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। আমাদের আলোচ্য পদগুলিও এঁর রচনা বলে গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুর সম্পাদকদ্বয় এবং ডঃ সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এই পদগুলি যে একমাত্র সিদ্ধান্তবাগীশেরই রচনা সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসার মত উপযুক্ত তথ্য এখনও কেউ দিতে পারেন নি। আচার্যশিষ্য প্রেমদাস সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এযাবৎ পাওয়া যায় নি। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে আলোচ্য পদগুলির কয়েকটি তাঁর রচনা।

ডঃ সুকুমার সেন ব্রজবুলির সাহিত্যের ইতিহাসে দুজন ব্রজানন্দের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের একজন হলেন আচার্যশিষ্য[৫১] এবং অপরজন

---

[৫১] H B. L. পৃ. ১৭৬।

নয়নানন্দের পৌত্র[৫২]। পদকল্পতরুতে ব্রজানন্দ ভণিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর সম্পাদক এই পদকারের কোন পরিচয় দিতে পারেন নি। তবে এই পদটি আচার্যশিষ্যের রচনা বলে ডঃ সেন অনুমান করেছেন। পদকল্পতরুতে ধৃত পদটি ছাড়া ব্রজানন্দ ভণিতায় আরও দুটি পদ পদমেরুতে পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীনিবাসাচার্যের দুজন শিষ্যের নাম ছিল মথুরাদাস। এঁদের একজন ছিলেন মথুরার অধিবাসী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে অপর শিষ্য পদকল্পতরুতে সংগৃহীত মথুরাদাস ভণিতায় রচিত পদটির রচয়িতা। পদকল্পতরুকার এঁর কোন পরিচয় দিতে পারেন নি।

পদকল্পতরুতে রঘুনাথদাস ভণিতায় তিনটি পদ ধৃত আছে। এর একটি জয়দেবের বন্দনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৩২২ সংখ্যক পুথিতে শ্রীনিবাসাচার্যের বন্দনামূলক অপর একটি পদ এঁর নামে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে চৈতন্যবন্দনার একটি পদ পাওয়া গিয়েছে[৫৩]। গুণলেশসূচকে রঘুনাথ নামে আচার্যের এক শিষ্যের উল্লেখ আছে। অনুরাগবল্লী কিংবা ভক্তিরত্নাকরে কোনও রঘুনাথের উল্লেখ নেই। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে দুজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পুথিতে রঘুনাথ ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য পদগুলি এঁদের দুজনের মধ্যে একজনের রচনা বলে ডঃ সেনের অনুমান।

হরিবল্লভ ভণিতায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে দুটি এবং পদকল্পতরুতে চারটি পদ পাওয়া যায়। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এই ভণিতায় চল্লিশটি পদ পাওয়া যায়। কীর্তনানন্দে এই ভণিতায় দুটি পদ আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই নামে পদ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। সেজন্য সকলেই একবাক্যে হরিবল্লভের ভণিতায় রচিত সকল পদকে বিশ্বনাথের রচনা বলে স্বীকার করেন। আচার্যের এক শিষ্যের নাম হরিবল্লভ সরকার ঠাকুর ছিল বলে অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ এবং প্রেমবিলাসে উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাসে এঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। ইনি পদরচনা করেছিলেন বলে এসব গ্রন্থে অবশ্য উল্লেখ নেই। তৎসত্ত্বেও তিনি যে কোন পদই রচনা করেন নি—একথা জোর করে বলা চলে না।

গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে যথাক্রমে তিনটি ও দুটি পদ হরিরামের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। প্রথম গ্রন্থের সম্পাদকের মতে ইনি রামচন্দ্র

---

[৫২] ঐ—পৃ. ৩১৬ [৫৩] ঐ—পৃ. ১৯৭

কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য। সম্পাদক তাঁর মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নি। দ্বিতীয় গ্রন্থের সম্পাদক লিখেছেন যে হরিরাম নামে আচার্যের শিষ্য থাকলেও ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্র-শিষ্য হরিরাম আচার্যকে 'কীর্তন-লম্পট' বলা হয়েছে। সেজন্য তিনি এঁকেই পদকর্তা বলে স্বীকার করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আচার্যের পরিবারভুক্ত শিষ্যদের নাম নিয়ে আলোচনার পর শ্রীনিবাসাচার্যের সে সব শিষ্যদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো যাঁরা পদকার ছিলেন। এঁদের মধ্যে আটজন অষ্ট কবিরাজ নামে সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে আরও কবিরাজ শিষ্যের নাম এই তালিকায় যুক্ত হওয়ায় পুথিতে মোট আঠারোজন কবিরাজ শিষ্যের নাম দেখা যায়। কর্ণানন্দে এই তালিকার প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু একজনের নাম নিয়ে সংশয় থাকায় যদুনন্দন এখান থেকে মোট সতেরজনের নাম গ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। এই নামের সঙ্গে আরও দুজন-এর নাম যোগ করে কর্ণানন্দে বর্ণিত আচার্যের কবিরাজ শিষ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশজনে। পুথির নামের তালিকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা দেখেছি যে দুজন নৃসিংহ কবিরাজের অস্তিত্ব স্বীকার করলে পুথির অষ্টাদশ কবিরাজ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না এবং আচার্যের কবিরাজ শিষ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট কুড়িজন।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে আলোচ্য কুড়িজন স্বীকৃত কবিরাজ শিষ্য ছাড়া আচার্যের আরও কয়েকজন শিষ্য ছিলেন যাঁরা ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। উদ্ধবদাসের একটি পদ থেকে আমরা এরকম সাতজনের নাম পেয়েছি এবং এযাবৎ প্রাপ্ত তাঁদের রচনা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছি। অবশ্য এঁদের সকলের রচনার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না।

কবিরাজ ও ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা বলে স্বীকৃত এই সাতাশজন শিষ্য ছাড়া আচার্য-শিষ্যতালিকায় আরও এমন অনেক নাম আছে নানা গ্রন্থে যাঁদের ভণিতায় পদ পাওয়া গিয়েছে। এঁদের কয়েকজনকে আচার্যশিষ্য বলে বর্তমান যুগের পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। এঁদের সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা আরও কয়েকজন আচার্যশিষ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যাঁদের ভণিতায় পদ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে এখনও খানিকটা সংশয় আছে। আমরা আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এঁদের

মধ্যে কয়েকজন আচার্যশিষ্য থাকা অসম্ভব নয়।

৫। **ছয় চক্রবর্তী**—অষ্ট কবিরাজের মতন আচার্য-শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ছয় চক্রবর্তীও বিখ্যাত ছিলেন। কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্যাসে ছয় চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—গোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্যামদাস চক্রবর্তী, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীব্যাস চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং গোকুলানন্দ চক্রবর্তী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে যে ছয় চক্রবর্তীর নামের তালিকা আছে[৫৪] তার সঙ্গে কর্ণানন্দের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কর্ণানন্দে উল্লিখিত রামচন্দ্র চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে শ্রীদাস চক্রবর্তী ও নারায়ণ চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। হরিদাস দাস বাবাজী এই ছয় চক্রবর্তীর নাম কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন জানা যায় না। কাজেই এই দুই তালিকার মধ্যে কোন্‌টি অধিক নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব নয়। যদুনন্দন ছয় চক্রবর্তীর নামের পর আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে হরিদাস দাস বর্ণিত শ্রীদাস চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু নারায়ণ চক্রবর্তীর নাম নেই। কর্ণানন্দে উল্লিখিত অবশিষ্ট ছয়জন হলেন মহারাজ চক্রবর্তী, শ্রীবীর হাম্বীর, শ্রীদাস চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, রূপঘটক চক্রবর্তী এবং শেষজন সম্বন্ধে যদুনন্দন বলেছেন "আর ভক্ত চক্রবর্তী ঠাকুরের ঠাকুর।" এঁর পরিচয় সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয় নি।

দুটি তালিকা মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে আচার্যের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে 'ছয় চক্রবর্তী' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। তবে অষ্ট কবিরাজের মতন এই ছয় চক্রবর্তীর তালিকা সর্ববাদিসম্মত নয়। ফলে দুই তালিকা মিলিয়ে মোট আটজন চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কর্ণানন্দে আরও ছয়জনের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা এই গ্রন্থরচনার যুগে চক্রবর্তী বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে একজনের নাম হরিদাস দাস বাবাজীর তালিকায় পাওয়া গেল। এঁকে বাদ দিলে আরও পাঁচজন—মোট তেরোজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা আচার্যশিষ্য চক্রবর্তীর নামে এককালে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

গোবিন্দ নামে আচার্যের দুজন শিষ্য কবি হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ

---

[৫৪] গৌ. বৈ জা. শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর দ্রঃ

করেছিলেন এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ অন্যতম। অপর গোবিন্দও ভক্তি, পাণ্ডিত্য ও পদরচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি হলেন পূর্বে বহরমপুরের নিকট মহুলা গ্রাম ও পরবর্তীকালে বোরাকুলি গ্রামবাসী। কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনায় জানা যায় এই বিপ্র বাল্যকাল থেকেই 'প্রবলভজনাদ্‌ভাবকং প্রেমমূর্ত্তিং' ছিলেন[৫৫]। অনুরাগবল্লীতে এঁকে 'ভাবক চক্রবর্তী বলা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে এঁকে গোবিন্দ চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোবিন্দ কবিরাজ থেকে পৃথক করার জন্য বোধহয় এঁকে পরবর্তীকালে গোবিন্দ চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হতো।

আচার্যের তিনজন শিষ্যের নাম ছিল শ্যামদাস চক্রবর্তী। এঁদের একজন ছিলেন আচার্যের শ্যালক। দ্বিতীয়জন বুধুরীর নিকটস্থ বাহাদুরপুরনিবাসী বংশীদাস চক্রবর্তীর ভাই শ্যামদাস এবং তৃতীয়জন হলেন ব্যাস চক্রবর্তীর পুত্র শ্যামদাস। কর্ণানন্দে আচার্য-শ্যালককেই ছয় চক্রবর্তীর অন্যতম বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

কর্ণানন্দে রামচন্দ্রকে তৃতীয় চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁকে আচার্য-শ্যালক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভক্তিরত্নাকর ছাড়া অপর সকল গ্রন্থে এঁকে রামচরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।, এমনকি আচার্যের শাখাবর্ণনার ক্ষেত্রেও কর্ণানন্দে এঁকে রামচরণ বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীর ছয় চক্রবর্তীর তালিকায় এঁর নাম নেই।

কর্ণানন্দে চতুর্থ চক্রবর্তী বলে ব্যাসাচার্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাসাচার্যের পরিচয় নূতন করে দেওয়া অনাবশ্যক।

পরবর্তী চক্রবর্তী সম্বন্ধে কর্ণানন্দে বলা হয়েছে—"আর কহি চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর। সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর॥" এই রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নি। আচার্যের শিষ্যতালিকায় একজনমাত্র রামকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইনি আচার্যের বৈবাহিক রামকৃষ্ণ চট্টরাজ। এঁকে চক্রবর্তীতালিকাভুক্ত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে যে ছয়জন চক্রবর্তীর নাম দেওয়া আছে, সেই তালিকায় অবশ্য রামকৃষ্ণের নাম নেই।

কর্ণানন্দের ছয় চক্রবর্তীর তালিকায় ষষ্ঠ নাম হলো গোকুলানন্দ।

---

[৫৫] গু. লে. সূ. —৮২ শ্লোক

কর্ণানন্দে দুজন গোকুলানন্দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী হরিদাসাচার্যের পুত্র গোকুলানন্দের কথা। পরবর্তী পর্যায়ে একজন গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্তীর কথা বলা হয়েছে। এঁর কোন পরিচয় এই গ্রন্থেও দেওয়া নেই। কর্ণানন্দে উক্ত ষষ্ঠ চক্রবর্তীর কোনও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে যখন ছয় চক্রবর্তীর তালিকায় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এঁদের দুজনের নামই পাওয়া যাচ্ছে এবং কর্ণানন্দের পরবর্তী ছয়জন চক্রবর্তীর নামের তালিকায় শ্রীদাসের নামের উল্লেখ আছে তখন অনুমান করা যায় কর্ণানন্দকার প্রথম তালিকায় গোকুলানন্দ বলতে হরিদাসাচার্যের পুত্রের কথাই বলেছেন।

প্রথম ছয়জন চক্রবর্তীর পর কর্ণানন্দে আচার্যের আর ছয়জন চক্রবর্তী-শিষ্যের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে রাজা বীর হাম্বীরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যন্ত যে ছয়জন আচার্যের চক্রবর্তীশিষ্যের নাম পাওয়া গেল এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। এঁদের মধ্যে 'রাজচক্রবর্তী' বলে বীর হাম্বীরের নাম উল্লেখ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। এই প্রসঙ্গে বীর হাম্বীরের নাম উল্লেখ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরাও খুঁজে পাচ্ছি না।

কর্ণানন্দের দ্বিতীয় চক্রবর্তী তালিকার দ্বিতীয় নাম হলো শ্রীদাস। ইনি নিঃসন্দেহে হরিদাসাচার্যের অপর পুত্র শ্রীদাস। হরিদাস দাস বাবাজীর ছয় চক্রবর্তীর তালিকায় এঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে। দুই সূত্রে যখন দুজনের নাম পাওয়া গেল তখন অনুমান করা যায় এঁদের পদবী চক্রবর্তী ছিল।

কর্ণানন্দে পরবর্তী নাম হলো রামজয়। কিন্তু আচার্য-শিষ্যতালিকায় এই নাম কোন গ্রন্থে নেই, এমনকি কর্ণানন্দে আচার্য-শিষ্যতালিকায়ও এই নাম পাওয়া যায় না। রামজয় নামে নরোত্তম ঠাকুরের দুজন শিষ্য ছিল বলে প্রেমবিলাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের একজন ছিলেন রামজয় চক্রবর্তী ও অপরজনের নাম রামজয় মৈত্র। মনে হয় এই রামজয়দ্বয়ের মধ্যে কর্ণানন্দকার কোনও গোলমাল করে ফেলতে পারেন।

রাধাবল্লভ নামে আচার্যের পাঁচজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে চক্রবর্তী কেউ নেই। আচার্যের পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর এক শিষ্যের নাম রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ছিল বলে কর্ণানন্দে উল্লেখ আছে। মনে হয় যদুনন্দন এই নামের ব্যাপারেও কোন ভুল করে থাকবেন।

কর্ণানন্দের পরবর্তী নাম হলো রূপ ঘটক। ইনি চক্রবর্তী নামে পরিচিত

ছিলেন বলে কোন গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গে যখন চারটি নামে ভুল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এই নামকেও অন্যতম চক্রবর্তী বলে স্বীকার করা যায় না।

চক্রবর্তী তালিকায় কর্ণানন্দের সর্বশেষ নাম হলো ঠাকুরের ঠাকুর। এঁর কোন পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হয় নি। গ্রন্থকার কি এখানে ঠাকুরদাস ঠাকুরের কথা বলতে চাইছেন? কিন্তু বর্ণনা থেকে এরকম অনুমান করাও সঙ্গত মনে হয় না কাজেই এই নামও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে কর্ণানন্দে ছয় চক্রবর্তী বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রামকৃষ্ণের নাম নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামে আচার্যের কোন শিষ্যের নাম কোন গ্রন্থে, এমনকি কর্ণানন্দে বর্ণিত আচার্যশিষ্য তালিকাতেও, পাওয়া যায় না। তাছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীর ছয় চক্রবর্তীর তালিকার মধ্যেও কোন রামকৃষ্ণের নাম নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে কর্ণানন্দের এই নাম গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া রামজয়, রাধাবল্লভ ও রূপ ঘটকের নামও একই কারণে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। বীর হাম্বীরের নামও এই তালিকাভুক্ত করার কোন সঙ্গত কারণ গ্রন্থকার দেখাতে পারেন নি। 'ঠাকুরের ঠাকুর' বলতে কা'কে বলছেন সে কথাও তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি। কাজেই এই নামও গ্রহণযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে কর্ণানন্দে বর্ণিত বারোজন চক্রবর্তীর মধ্যে মাত্র ছয়জন—গোবিন্দ, শ্যামদাস, রামচন্দ্র, ব্যাস, গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের নামই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীর নামের তালিকার সঙ্গে এখন সামান্য পার্থক্য রইল। এখানে রামচন্দ্রের পরিবর্তে নারায়ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

আচার্যের শিষ্যতালিকায় দুজন নারায়ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের একজন হলেন গোয়াস পরগণার রায়পুর নিবাসী নারায়ণ চৌধুরী এবং অপরজন হলেন নারায়ণ মণ্ডল। এছাড়া অন্য কোন নারায়ণের পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এই নামকেও আচার্যশিষ্যের নাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এই নাম বাদ দিলে ছয় চক্রবর্তী হিসাবে গোবিন্দ চক্রবর্তী, আচার্যশ্যালক শ্যামদাস ও রামচন্দ্র চক্রবর্তীদ্বয়, ব্যাসাচার্য এবং হরিদাসাচার্য-পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে স্বীকার করতে হয়।

ছয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে দুটি তালিকা বিচার করে দেখা গেল এই দুটির

কোনোটিকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। হরিদাস দাস বাবাজী প্রদত্ত তালিকায় একটি নাম সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে, কিন্তু কর্ণানন্দে প্রদত্ত তালিকায় ভুলের সংখ্যা আরও বেশী। এই দুটি তালিকা থেকে মোটামুটি ছয়জন আচার্য-শিষ্যের নাম পাওয়া গেল যাঁদের ছয় চক্রবর্তী বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

৬। ছয় ঠাকুর—গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে শ্রীনিবাসাচার্যশাখায় ছয়জন ঠাকুরের উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, কুমুদানন্দ কুলরাজ, রাধাবল্লভ মণ্ডল, জয়রাম চক্রবর্তী, রূপ ঘটক ও ঠাকুরদাস ঠাকুর। আচার্যের কোন জীবনীগ্রন্থে কিংবা অন্য কোন জায়গায় ছয় ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় নি। এই নামগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেকথা হরিদাস দাস বাবাজী উল্লেখ করেন নি।

আচার্যের দুই বৈবাহিকের নাম রামকৃষ্ণ চট্ট ও কুমুদ চট্ট। কুমুদানন্দ কুলরাজ বলে আচার্যের কোন শিষ্য ছিল না। কোন গ্রন্থে এঁদের ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয় নি। রাধাবল্লভ মণ্ডলকেও কোন গ্রন্থে ঠাকুর বলা হয় নি। পুথিতে অবশ্য মোহনদাসের সহোদর রাধাবল্লভ দাসকে ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরাগবল্লীতে কাণসোনার জয়রাম চক্রবর্তীকে ঠাকুর বলে উল্লেখ করা আছে। পুথিতে একজন রূপদাস ঠাকুরের কথা বলা হয়েছে। ইনি রূপ ঘটক এবং রূপ কবিরাজ থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। এখানে বোধহয় এঁর কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে একজন ঠাকুরদাস ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কোন গ্রন্থে এঁর কোন উল্লেখ নেই।

আলোচ্য ছয়জন ঠাকুরের মধ্যে প্রথম তিন জনকে ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হতো এমন কোন তথ্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি, তবে শেষের তিন জন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থে ঠাকুর বলে উল্লেখ আছে। অবশ্য রূপদাস ঠাকুরের সঙ্গে রূপ ঘটকের ভুল করা হয়েছে। হরিদাস দাস বাবাজী এঁদের নাম কোথায় পেয়েছেন তা যেমন জানা যায় নি তেমনি অন্য কোনও সূত্রে এই তালিকা পাওয়া যায় নি। সেজন্য এই তালিকা সঠিক কি না সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা যায় না।

৭। যাঁরা সপরিবারে আচার্যশিষ্য ছিলেন—যাঁরা সপরিবারে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর, হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী

এবং গোবিন্দ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কলানিধি চট্টরাজের জামাতা, রাজেন্দ্র বন্দ্যো, সুধাকর মণ্ডল ও রাধাবল্লভের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।

পুথিতে আচার্যের কবিরাজ শিষ্যবৃন্দ প্রসঙ্গে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁরা সস্ত্রীক আচার্যশিষ্য ছিলেন—সস্ত্রীকো (কৌ) রামচন্দ্র-শ্রীগোবিন্দ-কবিপার্থিবৌ। এরপর, কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এঁদের সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। গুণলেশসূচক ও অনুরাগবল্লীতে এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা বলা থাকলেও তাঁদের স্ত্রীদের কথা বলা হয় নি। শুধুমাত্র কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এঁদের পত্নীদ্বয়ের উল্লেখ থাকলে অবশ্য সন্দেহের কারণ থাকত, কিন্তু পুথিতে উল্লেখের পর এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাস থেকেই জানা যায় যে এঁদের পত্নীদ্বয়ের নাম ছিল যথাক্রমে রত্নমালা ও মহামায়া।

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও যে আচার্যশিষ্য ছিলেন তা এই তিন সূত্র থেকে জানা যায়।

বীর হাম্বীরের পুত্র ধাড়ি হাম্বীর যে আচার্যের শিষ্য ছিলেন একথা গুণলেশসূচক এবং অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ না থাকলেও ভক্তিরত্নাকর ও পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসেও আচার্য-শিষ্যতালিকায় যুবরাজের নাম পাওয়া যায়। কাজেই ধাড়ি হাম্বীরের শিষ্যত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বীর হাম্বীরের পত্নী যে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে[৫৬]। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করা হয়েছে বলে অন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে না থাকলেও স্বীকার করা যেতে পারে যে রাজপত্নী আচার্যের শিষ্যা ছিলেন। এঁর নাম সুলক্ষণা ছিল—একথা প্রথম প্রেমবিলাসে পাওয়া যাচ্ছে। এপর্যন্ত যখন এই নাম নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি তখন আপাতত স্বীকার করা যেতে পারে রানীর নাম ছিল সুলক্ষণা।

কলানিধি চট্টের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় গুণলেশসূচকে। এই গ্রন্থে এঁকে আচার্যের বৈবাহিকদ্বয় রামকৃষ্ণ ও কুমুদ চট্টের বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে।

---

[৫৬] ভ. র. ৯।২৭০-১

অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে এঁর নামের উল্লেখ নেই। আচার্যশিষ্যের রচনা প্রামাণ্য গ্রন্থ। কাজেই অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ না থাকলেও তাঁকে আচার্যশিষ্য হিসাবে স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই। ইনি কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে উল্লেখ আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে হরিদাস দাস বাবাজী 'আদেশামৃত-স্তোত্রম্' এঁর রচনা বলে শ্রীনিবাসাচার্য-গ্রন্থমালায় উল্লেখ করেছেন। আমরা অবশ্য এই রচনাটি নৃসিংহ কবিরাজের রচনা বলে ইতিপূর্বে অনুমান করেছি।

কলানিধির নামের উল্লেখ না থাকলেও অনুরাগবল্লীতে চট্টরাজ পরিবারের আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা হলেন রাধাবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোবিন্দরায় গৌরাঙ্গবল্লভ, চৈতন্যদাস, বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস। একমাত্র কৃষ্ণদাস ছাড়া এঁদের কারুর নাম অন্য শাখা-বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে না। অনুরাগবল্লীর বর্ণনাকে অস্বীকার করার কারণ নেই। সেজন্য একমাত্র এই গ্রন্থে পাওয়া গেলেও স্বীকার করে নেওয়া যায় যে এঁরা আচার্যের শিষ্য ছিলেন।

কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসেও কৃষ্ণদাস চট্টের উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাসে এঁকে ফরিদপুর নিবাসী বলা হয়েছে। নদীয়া জেলার ফরিদপুরে এঁর শ্রীপাট আছে বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলা হয়েছে।

রাজেন্দ্র বাঁড়ুজ্যে 'চট্টরাজ ঠাকুরের জামাতা' আচার্যশিষ্য ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। ইনি কোন্ চট্টরাজের জামাতা সে কথার উল্লেখ নেই। কর্ণানন্দ এবং প্রেমবিলাস ছাড়া অপর কোন গ্রন্থে এঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেমবিলাসে এঁকে কলানিধি চট্টরাজের জামাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমবিলাসের এই উল্লেখের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোন প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

চট্টরাজ বংশের দুই কন্যা মালতী ও ফুল্ল আচার্যের শিষ্যা ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কর্ণানন্দে ফুল্লের পরিবর্তে ফুল্লবি এবং প্রেমবিলাসে ফুল্লব্বি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলা হয়েছে যে ইনি ফুল্লরী নামেও খ্যাতা ছিলেন। এঁরা কার কন্যা ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। একমাত্র প্রেমবিলাস থেকে জানা যায় যে এঁরা কলানিধি চট্টরাজের কন্যা ছিলেন এবং রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন।

সপরিবারে যাঁরা আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যাসাচার্যের নামও উল্লেখযোগ্য। গুণলেশসূচকে ব্যাসাচার্যের কথা বলা হলেও তাঁর পত্নী ও পুত্রের কথা আচার্যের শিষ্যতালিকায় নেই। অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরে ব্যাসাচার্য-পত্নীর উল্লেখ নেই তবে অনুরাগবল্লীতে ব্যাসাচার্যের পুত্র শ্যামদাস আচার্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এঁদের দুজনের উল্লেখ আছে।

গুণলেশসূচকে বলা হয়েছে সুধাকর স্ত্রীপুত্রসহ আচার্যশিষ্য হয়েছিলেন। অনুরাগবল্লীতে একজন সুধাকর মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ধবদাসের পদে রাঢ় দেশের একজন সুধানিধি মণ্ডলের নাম আছে। একজন ছাড়া দুজন সুধাকর কিংবা কোন সুধানিধির নাম আচার্যশিষ্য-তালিকায় নেই। কাজেই ধরে নেওয়া যায় এঁরা একই ব্যক্তি। সুধাকরের স্ত্রীপুত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে কর্ণানন্দে এবং প্রেমবিলাসে। এঁদের নাম যথাক্রমে শ্যামপ্রিয়া ও রাধাবল্লভ বলে এই গ্রন্থ দুটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেমবিলাসে দেখা যায় রাধাবল্লভ ছাড়া গোপাল ও কামদেব নামে সুধাকর মণ্ডলের আর দুই পুত্র আচার্যের শিষ্য ছিলেন। কর্ণানন্দে এই নাম দুটি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এঁরা যে সুধাকর মণ্ডলের পুত্র সে কথা বলা হয় নি। অনুরাগবল্লীতে সুধাকরের সহচর বলে একজন নারায়ণ মণ্ডলের নাম পাওয়া যাচ্ছে যিনি আচার্যের শিষ্য ছিলেন। গোপাল মণ্ডল এঁর ভাই বলেও অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। প্রেমবিলাস অপেক্ষা অনুরাগবল্লীর তথ্য অধিক নির্ভরযোগ্য। বিশেষতঃ অন্য কোন গ্রন্থ এমনকি কর্ণানন্দেও প্রেমবিলাসের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে গোপাল ও কামদেব সুধাকরের পুত্র নন।

সুধাকর মণ্ডলের পুত্রের নাম রাধাবল্লভ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অনুরাগবল্লীতে দেখা যাচ্ছে কামদেব মণ্ডলের দুই পুত্র রাধাবল্লভদাস ও রমণদাস আচার্যশিষ্য ছিলেন। কামদেবের কোন পরিচয় এই গ্রন্থে নেই। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে এঁদের উল্লেখ থাকলেও কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি।

অনুরাগবল্লীর তথ্য কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাস অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। কর্ণানন্দ বর্ণিত আচার্যশিষ্য চক্রবর্তীদের নামের তালিকা যে নির্ভরযোগ্য নয় তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। প্রেমবিলাসের বিবরণ অনৈতিহাসিক, তাও

আমরা আচার্য-জীবনী আলোচনাকালে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আলোচনা করেছি। কাজেই গুণলেশসূচক ও অনুরাগবল্লীর বিবরণের ওপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে সুধাকর মণ্ডল স্ত্রীপুত্র সহ আচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন। এঁদের নাম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সুধাকরের এক সহচর নারায়ণ তাঁর ভাই গোপাল মণ্ডল সহ আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া কামদেব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি তাঁর দুই পুত্র রাধাবল্লভদাস ও রমণদাস সহ আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

পদকার হিসাবে গোবিন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পুথিতে বলা হয়েছে যে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র মাধবেন্দ্র আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কর্ণানন্দে বলা হয়েছে যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রী আচার্য-পত্নী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্যা ছিলেন। কিন্তু পুথির বিবরণের পর কর্ণানন্দের বিবরণকে স্বীকার করা যায় না। গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র মাধবেন্দ্রের নাম কোন শিষ্যতালিকায় এযাবৎ পাওয়া যায় নি। তবে পুথির উক্তিকে স্বীকার করে আচার্য-শিষ্যতালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। গোবিন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রীর নাম সুচরিতা বলে ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রাপ্ত কোন সূত্রে এই নাম পাওয়া যায় নি। ডঃ সেনও তাঁর প্রাপ্ত সূত্রের উল্লেখ করেন নি। গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র মাধবেন্দ্র সম্পর্কে যে সূত্রের উল্লেখ করেছেন সেটি আমাদের আলোচ্য পুথি। এই পুথির যে অংশ তিনি প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন সেখানে কিংবা অন্যক্ষেত্রেও 'সুচরিতা' নাম পাওয়া যায় নি।

কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে করুণাদাস ও তাঁর পুত্রদ্বয় জানকীরাম ও প্রকাশদাসের উল্লেখ আছে। এঁদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এঁরা করণ-কুলজাত এবং পদবী ছিল মজুমদার। এঁরা আচার্যের বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং পুত্রদ্বয় আচার্যের পত্রাদি লিখে দিতেন। আচার্য সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের বিশ্বাস উপাধি দেন। অন্য কোন গ্রন্থে এঁদের কোন উল্লেখ না থাকায় আচার্যশিষ্য হিসাবে এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

যাঁরা সপরিবারে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে নানা সূত্র থেকে জানা গিয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন অনেক প্রভাবশালী পরিবার আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়, বীর হাম্বীর, গোবিন্দ চক্রবর্তীর

চট্টরাজ পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হয়তো আরও অনেক পরিবার আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকবেন কিন্তু তাঁদের কথা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় নি।

৮। অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ—এ পর্যন্ত আচার্যের যে সব শিষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে তাঁরা ছাড়া আরও বহু শিষ্যের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এঁদের কারো পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, আবার কারো শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করেই গ্রন্থকার ক্ষান্ত থেকেছেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় একই সূত্রে একই নামের কয়েক স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই এঁদের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি। এসব ক্ষেত্রে ধরে নিতে হয়েছে এক নামধারী হলেও এঁরা পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। এইসব আচার্যশিষ্যদের নামের আক্ষরিক ক্রমানুযায়ী আলোচনা করলে তাঁর সকল শিষ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যেতে পারে, সেইসঙ্গে আচার্যের এক নামধেয় কতজন শিষ্য ছিলেন এবং এসব নাম নিয়ে কি রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে তা'ও খানিকটা বুঝতে পারা যাবে।

আত্মারাম নামে একজন শিষ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় গুণলেশসূচকে। পুঁথিতে একজন আত্মারাম ঠাকুরের উল্লেখ আছে। অনুরাগবল্লীতেও একজন আত্মারামের নাম পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে দুজন আত্মারামের পরিচয় দেওয়া আছে। এঁদের একজনকে ফরিদপুর নিবাসী এবং অপরজনকে মথুরানিবাসী বলা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে এই নামের উল্লেখ নেই।

গুণলেশসূচক থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল গ্রন্থেই আচার্যের শিষ্যতালিকায় একজন আত্মারামের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পদাবলী-সাহিত্যেও একজন আত্মারামের নাম পাওয়া গিয়েছে যাঁর পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতরা আজও সন্দিহান। আচার্যের পদাবলী-রচয়িতা শিষ্যদের সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মনে হয় কর্ণানন্দে উল্লিখিত ফরিদপুর নিবাসী আত্মারাম পদাবলীকার হলেও হতে পারেন। অন্যপক্ষে প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে মথুরানিবাসী আত্মারামের উল্লেখ না থাকলেও কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে যখন বিশেষ পরিচয় দিয়ে অপর আত্মারামের উল্লেখ দেওয়া হয়েছে তখন এই দ্বিতীয় আত্মারামকেও আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করতে বাধা নেই।

গুণলেশসূচকে কলানিধি চট্ট নামে আচার্যের এক শিষ্যের উল্লেখ আছে।

এঁর সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে বঙ্গদেশবাসী এবং আচার্য উপাধিকারী একজন কলানিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কোন গ্রন্থে এই কলানিধি আচার্যের উল্লেখ না থাকলেও এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত বিশেষ পরিচয়সহ আলোচ্য আচার্যশিষ্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করা যেতে পারে।

কুমুদ নামে আচার্যের দুজন শিষ্য ছিলেন বলে কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। এঁদের একজন কুমুদ চট্টরাজের কথা অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে এঁকে আচার্যের জামাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু অপর, কুমুদানন্দ ঠাকুর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। কর্ণানন্দে এঁর কোন পরিচয়ও দেওয়া হয় নি। কাজেই দ্বিতীয় কুমুদ সম্বন্ধে খানিকটা সংশয় থেকে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ নামে আচার্যের মোট ছয়জন শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম শুধুমাত্র কৃষ্ণ, একজন কৃষ্ণদাস এবং তিনজন কৃষ্ণবল্লভ। অনুরাগবল্লীতে একজন কৃষ্ণ পুরোহিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড়দেশবাসী এই কৃষ্ণ পুরোহিতের কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দেও পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এই দুই গ্রন্থে বুধইপাড়া নিবাসী আরও একজন কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি কীর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণানন্দকার যখন পরিচয়সহ এঁর কথা উল্লেখ করেছেন তখন অন্য কোন গ্রন্থে না থাকলেও এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এঁকে কৃষ্ণ পুরোহিত থেকে পৃথক ব্যক্তি এবং আচার্যের অন্যতম শিষ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

চট্ট পরিবার সম্বন্ধে আলোচনাকালে কৃষ্ণদাস চট্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর থাকেন তিনজন কৃষ্ণবল্লভ। এঁদের একজন, হরিদাসাচার্যের পৌত্র এবং গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের কথা অনুরাগবল্লীতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণবল্লভ বাল্যকালেই আচার্যের কৃপা পেয়েছিলেন বলে কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। প্রেমবিলাসেও এই কথা পাওয়া যাচ্ছে।

ভক্তিরত্নাকরে দেউলিনিবাসী একজন কৃষ্ণবল্লভের কথা বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থের সন্ধানে আচার্য প্রথম এঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কর্ণানন্দে এঁকে বল্লভ ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমবিলাসে এঁকে কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তীর উল্লেখ থাকলেও কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি। কাজেই এঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় থেকে যায়।

গোকুল নামে আচার্যের চারজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন ছিলেন হরিদাসাচার্যের পুত্র গোকুলানন্দ চক্রবর্তী। এঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও একজন গোকুলানন্দ চক্রবর্তীর কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। এসম্বন্ধেও আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। গোকুলানন্দ চক্রবর্তী ছাড়া আরও একজন গোকুলানন্দ আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে গুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ও উদ্ধবদাসের পদ থেকে জানা যায়। এঁর পূর্ব নিবাস ছিল কড়ুই গ্রাম, পরে পঞ্চকূটের সেরগড়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। এতগুলি গ্রন্থে যখন দ্বিতীয় গোকুলানন্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তখন এসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে আচার্য-শিষ্য হিসাবে একজন গোকুলদাস মহান্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ইনি বীর হাম্বীরের সমসাময়িক ও বিষ্ণুপুরনিবাসী বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের জ্ঞাত কোন সূত্রে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় নি। গ্রন্থকার এই তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তারও কোন উল্লেখ এখানে নেই। কাজেই উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এই গোকুলদাস মহান্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

গোপাল নামে আচার্যের নয়জন শিষ্যের উল্লেখ নানা সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন আচার্যের শ্বশুর গোপালদাস চক্রবর্তী— যিনি আচার্যের শিষ্য ছিলেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বীর হাম্বীর পুত্র ধাড়ি হাম্বীরের দীক্ষান্তে নাম হয়েছিল গোপালদাস। এই নাম দুটি বাদ দিলে আরও সাতজন গোপালের পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এঁরা সকলেই গোপালদাস নামে পরিচিত ছিলেন বলে জানা যায়।

গুণলেশসূচকের ৮৩তম শ্লোকে গোপালবর্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কর্ণপূর কবিরাজ কি অর্থে 'বর্গ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন অনুমান করা কঠিন। এমন হতে পারে একাধিক গোপাল আচার্য-শিষ্য থাকায় তিনি গোপালবর্গ দ্বারা এঁদের সকলকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

অনুরাগবল্লীতে কাঞ্চনগড়িয়া নিবাসী একজন গোপালদাসের কথা বলা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরেও এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। কর্ণানন্দে এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ইনি রাত্রিকালে লক্ষ হরিনাম জপ করতেন এবং নিদ্রা দূর করার জন্য নিজের শিখা ঘরের চালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন।

অনুরাগবল্লী ও পুথিতে একজন গোপালদাস ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনীতে বলা হয়েছে যে ইনি বৃন্দাবনে মুকুন্দদাস গোস্বামীর উপদেশে 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পলতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গোপালদাস ঠাকুর ছাড়া প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে বুধইপাড়া নিবাসী আরও একজন গোপালদাস ঠাকুরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়জন সম্বন্ধে অন্য কোনও গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অনুরাগবল্লীতে নারায়ণ মণ্ডলের ভাই গোপাল মণ্ডল নামে আরও এক গোপালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বল্লবীদাসের ভাই গোপাল কবিরাজের কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। আচার্যের কবিরাজশিষ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এঁর কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও দুজন গোপালদাসের কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে পাওয়া যায়। এঁদের একজন ছিলেন আচার্যশিষ্য বনমালিদাসের পিতা এবং অপরজন বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডবাসী ছিলেন। অন্য কোন গ্রন্থে এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। তবে গ্রন্থকারদ্বয় যখন বিশেষ পরিচয় সহ নাম দুটির উল্লেখ করেছেন তখন সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হলেও এঁদের আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

গোপীজনবল্লভ নামে চট্টরাজ বংশীয় একজন আচার্য-শিষ্য ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ আছে। এঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এঁর কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দেও পাওয়া যায়। এছাড়া আরও একজন গোপীজনবল্লভ ঠাকুরের কথা এই গ্রন্থ দুটিতে বলা হয়েছে। এঁর বিশেষ কোন পরিচয় এই গ্রন্থ দুটিতে দেওয়া নেই কাজেই দ্বিতীয় গোপীজনবল্লভের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে দুজন গোপীরমণদাসের কথা বলা হয়েছে। দুর্গাদাসের ভাই গোপীরমণ দাস কবিরাজ বলে পরিচিত ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় গোপীরমণ দাস বৈদ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিশেষ কোন পরিচয় দেন নি। তিনি গোয়াসের অধিবাসী ছিলেন—শুধুমাত্র একথা বলা হয়েছে। প্রথম গোপীরমণও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কাজেই উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অনুমান করা যায় যে গ্রন্থকার আসলে একজন গোপীরমণকেই দুই পৃথক ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছেন।

গোবিন্দ নামে আচার্যের মোট পাঁচজন শিষ্যের কথা নানা গ্রন্থে বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও চট্টরাজ বংশের গোবিন্দ রায় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বৃন্দাবনের শ্রীকুণ্ডের অধিবাসী এক গোবিন্দ রায়ের নাম প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসে আরও একজন গোবিন্দদাসের নামের উল্লেখ আছে। এঁর কোন পরিচয় অবশ্য এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে শেষোক্ত গোবিন্দদাস সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

চট্টরাজ বংশোদ্ভব গৌরাঙ্গবল্লভ ছাড়া আরও একজন, গৌরাঙ্গদাস চট্টরাজ নামে একজন আচার্যশিষ্য সম্বন্ধে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক গুণগান করলেও এই গ্রন্থদ্বয়ে এঁর কোন পরিচয় কোন গ্রন্থকার দেন নি। প্রামাণ্য সূত্রে আমরা গৌরাঙ্গবল্লভ চট্টরাজের উল্লেখ ইতিপূর্বে পেয়েছি কিন্তু গৌরাঙ্গবল্লভ চট্টরাজ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আমরা কোন গ্রন্থে পাই নি। মনে হয় এঁরা দুজনেই গৌরাঙ্গদাস বলতে গৌরাঙ্গবল্লভ চট্টরাজের কথা বলতে চেয়েছেন।

বীর হাম্বীরের দীক্ষান্তে নাম হয় চৈতন্যদাস। এছাড়া চৈতন্যদাস নামে আচার্যের আরও দুজন শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের একজন ছিলেন চট্টরাজ বংশের। অপর চৈতন্যদাস সম্বন্ধে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লেখ থাকলেও এঁর কোন পরিচয় দেওয়া নেই। সেজন্য এঁর সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহ থেকে যায়।

হরিদাসাচার্যের পৌত্র এবং শ্রীদাসের তিন পুত্রের অন্যতম জগদীশ আচার্য শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। কর্ণানন্দে এঁদের তিন ভাইকে ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে অনুরাগবল্লী অধিক নির্ভরযোগ্য, সেজন্য জগদীশ আচার্যকে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য বলে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীদাসের অপর পুত্র জয়কৃষ্ণ আচার্যকেও অনুরাগবল্লীতে আচার্য শাখাভুক্ত বলা হয়েছে। এখানেও কর্ণানন্দকার ভুল করেছেন বলে আমাদের অনুমান।

গুণলেশসূচকে একজন জয়রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে এঁর নাম নেই। কানসোনানিবাসী এক জয়রামদাস ঠাকুর আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসে একজন

জয়রাম চক্রবর্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে এঁরা একই ব্যক্তি হবেন।

ঠাকুরদাস ঠাকুর নামে আচার্যের এক শিষ্যের কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে, কিন্তু এঁর কোন পরিচয় এই দুই গ্রন্থের কোনটিতে দেওয়া নেই। অপর কোন ব্যক্তির সঙ্গে এই নাম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁরা কোন সূত্র থেকে এই নাম পেয়েছিলেন।

তন্তুবায় কুলোদ্ভব একজন তুলসীরাম দাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। এঁর সম্বন্ধেও কোন বিস্তৃত বিবরণ আর পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় ঠাকুরদাসের ন্যায় এই নামও গ্রন্থকারদ্বয় কোন সূত্র থেকে পেয়েছিলেন।

উৎকলবাসী এক ব্রাহ্মণ দয়ারাম চৌধুরীর কথা কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। প্রেমবিলাসে এঁকে জয়রাম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে দয়াময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপযুক্ত পরিচয় সহ নাম উল্লেখ করায় ধরে নেওয়া যায় গ্রন্থকারদ্বয় কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই নাম পেয়েছিলেন। সেকারণে এঁকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

গুণলেশসূচক ও অনুরাগবল্লীতে আচার্যশিষ্যতালিকায় একজন নাড়িক মহাশয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য গ্রন্থে এই নাম নেই। তৎপরিবর্তে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে একজন নকড়ি দাসের নাম দেখা যায়। মনে হয় নাড়িক মহাশয় পরবর্তীকালে নকড়ি দাসে পরিণত হয়ে থাকবেন।

নারায়ণ নামে আচার্যের তিনজন শিষ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের একজন হলেন নৃসিংহ কবিরাজের ভাই নারায়ণ কবিরাজ। সকল গ্রন্থেই এঁর নাম পাওয়া গিয়েছে। নারায়ণ মণ্ডলের কথা একমাত্র অনুরাগবল্লীতে পাওয়া যায়। প্রামাণ্য সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে বলে এই নাম দুটি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া কর্ণানন্দে আরও একজন নারায়ণ চৌধুরীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। যাঁর বাড়ী যোরাস পরগণার রায়পুরে ছিল বলে বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ইনি স্বীয় গুরুবাবা বাড়ীর গোবিন্দবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেক্ষেত্রে এই তৃতীয় নারায়ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে।

আচার্যশিষ্যতালিকায় একজন বনমালীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। অনুরাগবল্লীর মতে এঁদের একজন হলেন বনমালী কবিরাজ। পুথিতে অনুরাগবল্লীর

বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। গুণলেশসূচকে একজন বনমালীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান করা যায় কর্ণপূর কবিরাজ এখানে এই বনমালী কবিরাজের কথাই বলেছেন। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে একজন বনমালী দাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থদুটিতে এঁকে বৈদ্যকুলোদ্ভব বলা হয়েছে। কর্ণানন্দে এঁকে গোপালদাসের পুত্র এবং প্রেমবিলাসে এঁকে মোহনদাসের ভাই বলে বলা হয়েছে। মনে হয় ইনি পূর্বোক্ত বনমালী কবিরাজ হবেন। গ্রন্থদুটিতে প্রদত্ত পরিচয় যদি সত্য হয় তবে অপরিচিত বনমালী কবিরাজের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল বলে স্বীকার করতে হবে।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উৎকলবাসী দয়ারামের সঙ্গে বিপ্রকুলোদ্ভব এক বলরাম দাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। দয়ারাম চৌধুরীকে আমরা আচার্য-শিষ্য বলে স্বীকার করেছি। কাজেই বলরামকেও আচার্যশিষ্য স্বীকার করা যেতে পারে।

আচার্যশিষ্য-তালিকায় কর্ণপূর কবিরাজ নিজের নামের সঙ্গে একজন বংশীগোপালের নামের উল্লেখ করেছেন। অন্য কোন গ্রন্থে বংশীগোপালের নাম পাওয়া যায় নি। অনুরাগবল্লী সমেত সকল গ্রন্থে একজন বংশীদাস ঠাকুরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁর পূর্ব বাসস্থান বুধোর বাহাদুরপুর এবং পরবর্তী কালের বাসস্থান আমিনাবাজারে ছিল বলে অনুরাগবল্লীতে বলা হয়েছে। আচার্যের পদাবলীকার শিষ্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে এঁর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। মনে হয় কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত বংশীগোপাল ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত বংশীদাস একই ব্যক্তি হবেন। এই সন্দেহ হওয়ার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি হলো—কর্ণপূর কবিরাজ ও আলোচ্য বংশীদাস দুজনেই বাহাদুরপুর নিবাসী ছিলেন। গুণলেশসূচকে কবিরাজ নিজ নামের সঙ্গে স্বগ্রামবাসী বংশীর কথাও বলেছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আচার্যপুত্র বৃন্দাবন ছাড়া আচার্যশিষ্য-তালিকায় আরও তিনজন বৃন্দাবন দাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবন চট্ট সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কর্ণানন্দে আরও একজন বৃন্দাবনদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁকে বৃন্দাবনবাসী বলা হয়েছে। এঁকেও আচার্যের অপর এক শিষ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

গুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী ও পূর্বোক্ত পুঁথিতে একজন মথুরাদাসের নাম পাওয়া যায়। পুঁথিতে এঁকে রাধিকাকুণ্ড[illegible] বলা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থে

এঁর কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি। পদকল্পতরুতে মথুরাদাসের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া যায় বলে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এছাড়া মথুরানিবাসী এক মথুরাদাসের কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমরা মথুরাদাস নামে দুজন আচার্যশিষ্য ছিলেন বলে অনুমান করতে পারি।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে একজন মুক্তারামের নাম আচার্যশাখায় পাওয়া যায়। এঁর কোন পরিচয় এই গ্রন্থদুটিতে দেওয়া নেই।

প্রেমবিলাসে মুকুন্দ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তির নাম আচার্যশাখায় উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর কোন পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। উদ্ধবদাসের পদে 'রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা চট্টরাজ যাঁর ব্যাখ্যা' বলে এক মুকুন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদে উদ্ধৃত মুকুন্দ যে কুমুদ হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে প্রেমবিলাসের এই মুকুন্দ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

মোহনদাস নামে আচার্যের তিনজন শিষ্যের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে পদকার হিসাবে এক মোহনদাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রাধাবল্লভের ভাই এক মোহনদাসের নাম পুথিতে পাওয়া যায়। ইনি পূর্বোক্ত পদকার মোহনদাসও হতে পারেন। এছাড়া আরও একজন মোহনদাসের নাম পাওয়া যায় প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে। এই দুই গ্রন্থে দুজন মোহনদায় সম্বন্ধে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। কাজেই পরিচয় দেওয়া না থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে আচার্যের দুজন শিষ্যের নাম ছিল মোহনদাস:

অনুরাগবল্লীতে একজন রঘুদাস ঠাকুরের নাম আচার্য-শিষ্য-তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। এঁর কোন পরিচয় দেওয়া না থাকলেও এঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

আচার্যের শ্বশুর রঘুনন্দন চক্রবর্তীর নাম বাদ দিলে আরও তিনজন রঘুনন্দনের নাম শিষ্যতালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। পুথিতে একজন রঘুনন্দনের নাম আছে। কাজেই গুণলেশসূচকে ও অনুরাগবল্লীতে কোন রঘুনন্দনের নাম না থাকলেও অন্ততঃ পক্ষে একজন রঘুনন্দন যে আচার্যশিষ্য ছিলেন সেকথা স্বীকার করা যেতে পারে। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে দুজন রঘুনন্দনের কথা বলা হয়েছে। এঁদের একজন ঘটক নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বলে কর্ণানন্দে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বর্ণনাকে স্বীকার করে নিলে এঁকে নিতে হবে আচার্যের

অন্ততঃ দুজন শিষ্য ছিলেন যাঁরা রঘুনন্দন নামে পরিচিত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে আরও একজন রঘুনন্দনের কথা বলা হয়েছে। ইনি জাহ্নবা দেবী কর্তৃক প্রেরিত রাধিকামূর্তি গোপীনাথের বামপার্শ্বে বসানোর পর বৃন্দাবনে যে মহোৎসব হয়েছিল বৃন্দাবন থেকে সেই বার্তা বহন করে এনেছিলেন। এই রঘুনন্দন যে আচার্যশিষ্য ছিলেন সেকথা কোন গ্রন্থে বলা হয় নি। এঁকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করলেও অনুমান করা যেতে পারে ইনি পূর্বোক্ত দুজন রঘুনন্দনের একজন হবেন।

গুণলেশসূচকে একজন রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়। পুথিতেও একজন রঘুনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে। পদকারদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একজন রঘুনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে দুজন রঘুনাথের কথা বলা হয়েছে। এঁদের একজন রঘুনাথ দাস ও অপরজন রঘুনাথ কর। বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকায় দুজন রঘুনাথের নাম স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

রসিকদাস নামে প্রেমদাসের এক ভাই আচার্য-শিষ্য ছিলেন বলে প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে উল্লেখ আছে। এছাড়া রসিকদাসের অন্য কোন পরিচয় নেই এবং অন্য কোন গ্রন্থে এঁর উল্লেখ নেই। ইনি আচার্যশিষ্য হলেও হতে পারেন।

মধ্যম পুত্র ছাড়া আচার্যের আরও দুজন শিষ্যের নাম রাধাকৃষ্ণ ছিল বলে কয়েকটি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গুণলেশসূচকে একজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। কর্ণানন্দেও একজন রাধাকৃষ্ণের নাম আছে। প্রেমবিলাসে দুজন রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র এই গ্রন্থে উল্লেখ থাকায় আমরা ধরে নিতে পারি মধ্যম পুত্র ছাড়া রাধাকৃষ্ণ নামে আচার্যের একজন শিষ্যই ছিলেন।

রাধাবল্লভ নামে আচার্যের চারজন শিষ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে রাধাবল্লভ চট্টরাজ ও রাধাবল্লভ মণ্ডল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গুণলেশসূচকে একজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। ইনি কোন্ রাধাবল্লভ বলা কঠিন। পুথিতে মোহনের সহোদর এক রাধাবল্লভের কথা বলা হয়েছে। কর্ণানন্দে তিনজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন রাধাবল্লভ মণ্ডল, দ্বিতীয় জন রাধাবল্লভ রায় ও তৃতীয়জন রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর। চট্ট বংশীয় রাধাবল্লভ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছু বলা হয় নি।

পদকার হিসাবে এক রাধাবল্লভ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রেমবিলাসে রাধাবল্লভ মণ্ডল ছাড়া একজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় পদকার রাধাবল্লভ দাস ও কর্ণানন্দে বর্ণিত রাধাবল্লভ দাস একই ব্যক্তি হবেন। রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

পুথিতে মথুরাদাসের ভাই বলে পরিচিত এক রাধিকাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পুথিতে উল্লেখ আছে বলে এঁকে আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

আচার্যের শিষ্য-তালিকায় মোট ছয়জন রামদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। গুণলেশসূচকে ও অনুরাগবল্লীতে একজন রামদাসের নাম পাওয়া যায়। পুথিতে দুজন রামদাসের নাম আছে। এঁদের একজন হলেন মোহনদাসের ভাই এবং দ্বিতীয়জনকে রামদাস ঠাকুর বলা হয়েছে। পদকার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে একজন রামদাস সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এছাড়া আচার্যের আঁখরিয়া কবিবল্লভের নামও রামদাস ছিল বলে প্রেমবিলাসে উল্লেখ করা হয়েছে। বল্লবী ভ্রাতা রামদাস ও আঁখরিয়া ছাড়া আরও একজন রামদাসের কথা কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। শেষোক্তজনকে পৃথক শিষ্য বলে স্বীকার করলে এঁদের ছয়জনকেই আচার্যশিষ্য বলে স্বীকার করতে হয়।

প্রেমবিলাসে ও কর্ণানন্দে বলা হয়েছে আচার্যের রামশরণ নামে একজন শিষ্য ছিলেন। এঁর পরিচয় কিছু দেওয়া নেই এবং অন্য কোন গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নেই।

রূপ নামে আচার্যের তিনজন শিষ্যের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে রূপ কবিরাজ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। রূপ ঘটকের কথা গুণলেশসূচক, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, পুথি, অন্যান্য সব গ্রন্থে আছে। উদ্ধবদাসের পদেও রূপ ঘটকের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া রূপদাস ঠাকুর নামে একজন আচার্যশিষ্য ছিলেন বলে পূর্বোক্ত পুথিতে উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন সূত্রে আচার্যশিষ্য হিসাবে সাতজন শ্যামদাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের একজন হলেন শ্যামদাস কবিরাজ। এঁর সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তিনজন শ্যামদাস চক্রবর্তী এবং তিনজন শ্যামদাস চট্টের নাম পাওয়া যায়।

তিনজন শ্যামদাস চক্রবর্তীর একজন হলেন আচার্যশ্যালক, দ্বিতীয়জন ব্যাসাচার্যের পুত্র এবং তৃতীয়জন হলেন বাহাদুরপুর নিবাসী বংশীদাস চক্রবর্তীর

জোড়ে রাখা। প্রথমজনের উল্লেখ সকল গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়জনের কথা গুণলেশসূচক ছাড়া সব গ্রন্থে আছে। তৃতীয় শ্যামদাস সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাজেই এঁদের তিনজনের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করার কারণ নেই।

আত্মারাম ও নাড়িকের সঙ্গে এক শ্যামচট্টের উল্লেখ পাওয়া যায় অনুরাগবল্লীতে। প্রেমবিলাসে তিনজন শ্যাম ভট্টের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজনের নাম আত্মারাম ও নকড়ির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা অনুমান করেছি নাড়িক নকড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া আরও দুজন শ্যামদাস চট্টের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। কর্ণানন্দে মোট দুজন শ্যাম চট্টের নাম আছে। এঁদের কারুর পরিচয় দেওয়া নেই। এঁদের মধ্যে একজন শ্যামদাস চট্ট সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তৃতীয় জনের কথা শুধুমাত্র প্রেমবিলাসে যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন এই নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন থেকে যায় দ্বিতীয় শ্যামদাস সম্বন্ধে, যাঁর কথা প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দ—এই দুটি গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য-শিষ্য তালিকা সম্বন্ধেও এই দুটি গ্রন্থে যে অনবধানতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে উপযুক্ত পরিচয় ছাড়া দ্বিতীয় শ্যামদাস চট্টকে স্বীকার করতেও দ্বিধা থেকে যায়।

হরিদাসাচার্যের পৌত্র এবং শ্রীদাসতনয় তিনজন জয়কৃষ্ণ, জগদীশ ও শ্যামবল্লভ আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ আছে। কর্ণানন্দেও তার সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যান্য গ্রন্থে শ্যামবল্লভের নাম না থাকলেও অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ থাকার জন্যই স্বীকার করতে হবে যে ইনি আচার্যশিষ্য ছিলেন।

শ্যামভট্ট নামে আচার্যের দুজন শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। কবিবল্লভের অনুজ শ্যাম ভট্টর নাম গুণলেশসূচকে পাওয়া যায়। কাজেই এই নাম সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কৃষ্ণ পুরোহিতের ব্রজবাসী একজন শ্যাম ভট্টের কথা কর্ণানন্দে পাওয়া যাচ্ছে। এঁর অনেক শিষ্যপ্রশিষ্য ছিল বলে এই গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। সেক্ষেত্রে এই নাম সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ থাকতে পারে না।

শ্যামসুন্দর দাস নামে মথুরাবাসী এক ব্রাহ্মণের কথা কর্ণানন্দে পাওয়া গিয়েছে। মথুরানিবাসী আরও দুজন ব্রাহ্মণ আত্মারাম ও মথুরাদাসের সঙ্গে এঁর উল্লেখ আছে। বাংলার বাইরের আচার্যশিষ্যদের অনেকের নাম আমরা

এই গ্রন্থে পেয়েছি। পূর্বোল্লিখিত আত্মারাম ও মথুরাদাস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কাজেই স্বীকার করা যেতে পারে শ্যামসুন্দর দাসও আচার্যের শিষ্য ছিলেন।

প্রেমবিলাসে দুজন শ্রীদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ইনি হরিদাসাচার্যের পুত্র শ্রীদাস। দ্বিতীয়জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ইনি কবিরাজ ছিলেন। ইতিপূর্বে আচার্যের কবিরাজ শিষ্যদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে হরিদাস পুত্র শ্রীদাসই কবিরাজ ছিলেন। প্রেমবিলাসের বহু পরবর্তীকালে রচিত উদ্ধবদাসের পদেও একথা পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে। প্রেমবিলাসে যে ভুল করে একজন শ্রীদাসকেই দুজন শ্রীদাসে পরিণত করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নেই।

গুণলেশসূচকে একজন শ্রীমন্তের নাম পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে দুজন শ্রীমন্তের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের একজনকে শ্রীমন্ত চক্রবর্তী ও অপরজনকে শ্রীমন্ত ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমন্ত চক্রবর্তীকে শ্রীমন্ত ঠাকুর বলেও সম্বোধন করা স্বাভাবিক। এই দুই সম্বোধন থেকে একই শ্রীমন্ত দুজন শ্রীমন্তে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই উপযুক্ত প্রমাণাভাবে দুজনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে মোহনদাস ও মুক্তারামের সঙ্গে একজন সুখানন্দের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁর কোন পরিচয় দেওয়া নেই। এই নামগুলির সঙ্গে একজন হরিপ্রসাদের নামেরও উল্লেখ আছে।

৯। **আচার্যের প্রশাখা**—শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদের যে বিস্তৃত তালিকা এযাবৎ পাওয়া গেল এঁদের অনেকেরই প্রচুর শিষ্য ছিল বলে বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে। সেই হিসাবে আচার্যের প্রশিষ্য-সংখ্যা যে কত বিরাট তা অনুমান করা যেতে পারে। আচার্য-শিষ্যের তালিকাকেই সম্পূর্ণ বলা চলে না। কাজেই তাঁর প্রশিষ্যের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া আরও অসম্ভব বলা চলে। এপর্যন্ত যতদূর জানা যায় তাতে একমাত্র কর্ণানন্দে আচার্যের উপশাখা বর্ণনার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। অন্য কোনগ্রন্থে আচার্যের উপশাখা বর্ণনা করা হয় নি। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের শাখাবর্ণনার পর রামচন্দ্রের তিনজন প্রধান শিষ্যের নাম করা হয়েছে।

কর্ণানন্দের দ্বিতীয় নির্যাসে আচার্যের উপশাখার বর্ণনা আছে। এখানেও কোন বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার প্রয়াস করা হয় নি। রামচন্দ্র কবিরাজ,

ঈশ্বরী দেবী, হেমলতা দেবী ও গতিগোবিন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যদের নাম করা হয়েছে মাত্র।

কর্ণানন্দে আচার্যের উপশাখা বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে রামচন্দ্র কবিরাজের চারজন শিষ্যের নাম দিয়ে। এঁরা হলেন বল্লভ মজুমদার, হরিরাম আচার্য, গোপীকান্ত চক্রবর্তী এবং বলরাম কবিপতি। এছাড়া কবিরাজের অগণিত শিষ্যপ্রশিষ্য ছিল বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমবিলাসে গোপীকান্ত ছাড়া অপর তিনজনের নাম পাওয়া যায় না।

বল্লভ মজুমদার ব্রাহ্মণ ছিলেন। এছাড়া তাঁর অপর কোন পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। প্রেমবিলাসের বর্ণনাও কর্ণানন্দের অনুরূপ।

প্রেমবিলাসে হরিরাম আচার্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। নরোত্তমবিলাসে হরিরাম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে হরিরামের পিতা শিবাই আচার্য ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদিন হরিরাম ও তাঁর ভাই রামকৃষ্ণ পিতার আদেশে দুর্গাপূজার বলির জন্য ছাগ ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন, এমন সময় পথে নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অপূর্ব চেহারা ও এঁদের মুখে অহিংস বৈষ্ণব ধর্মের কাহিনী শুনে দুই ভাই পশুগুলি ছেড়ে দিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। এরপর জ্যেষ্ঠ হরিরাম কবিরাজের কাছে এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবাই আচার্য এই সংবাদে, বিশেষতঃ কায়স্থ নরোত্তম ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দীক্ষা দিয়েছেন শুনে বিষম ক্রুদ্ধ হন। হরিরাম তখন পিতার আদেশে শাক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন। এতে শিবাই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে মিথিলা থেকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারি পণ্ডিতকে আনান। কবিরাজ-শিষ্য বলরাম ও হরিরাম তাঁকেও পরাস্ত করলে শিবাই আচার্য লজ্জিত হন। রামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামের প্রশংসা ভক্তিরত্নাকরেও আছে।

হরিরামের পুত্র গোপীকান্ত চক্রবর্তীও রামচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন বলে কর্ণানন্দে বলা হয়েছে। গোপীকান্ত ভণিতায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে দুটি ও পদকল্পতরুতে একটি পদ পাওয়া যায়। গৌরপদতরঙ্গিণীর একটি পদে তিনি নিজেকে রামচন্দ্র দাস বলে স্বীকার করেছেন। পদকল্পতরুতে ধৃত পদটিতেও পদকর্তা শ্রীনিবাসাচার্যের-রূপ ও গুণ বর্ণনা করেছেন। দুই গ্রন্থের সম্পাদক এঁকে রামচন্দ্রের শিষ্য বলে স্বীকার করেছেন।

রামচন্দ্রের অপর শিষ্যের নাম বলরাম কবিপতি। প্রেমবিলাসেও রামচন্দ্রের শিষ্য হিসাবে এঁর নাম আছে। এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে বলরাম কবিপতি সম্বন্ধে হরিদাস দাস বাবাজীর বিবরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তিনি শ্যামানন্দের এক শিষ্য বলরাম কবিপতির নাম করেছেন। দাস বাবাজী নিঃসন্দেহে এখানে ভুল করেছেন। কারণ, প্রথমতঃ প্রেমবিলাসে শ্যামানন্দের শিষ্যতালিকায় কোন বলরামের নাম নেই, তিনি প্রেমবিলাসের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটি রামচন্দ্রের শাখাবর্ণনায় আছে।

বলরাম দাস ভণিতায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে ৫৩টি এবং পদকল্পতরুতে ১৩ টি বাংলা ও ব্রজবুলি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থে একাধিক বলরামের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ, যিনি বলরাম নামেও পরিচিত। দ্বিতীয়জন হলেন কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী গ্রামবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য। এছাড়া আছেন আমাদের আলোচ্য রামচন্দ্র-শিষ্য বলরাম এবং পদকল্পতরুর ভূমিকায় উল্লিখিত 'কবিনৃপবংশজ 'ভুবনবিদিতযশ ঘনশ্যাম বলরাম'। বলরাম নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে তার মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যেতে পারে বলরাম কবিরাজ নামে যখন রামচন্দ্রের একজন শিষ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে তখন এই গ্রন্থগুলিতে ধৃত পদগুলির অন্ততঃ কয়েকটি এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।

আচার্যের প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্যতালিকায় প্রথমেই নাম করা হয়েছে শ্রীদাসের তিন পুত্র জয়কৃষ্ণ, জগদীশ ও শ্যামবল্লভের। অনুরাগবল্লীতে আচার্যের শিষ্য-তালিকায় এঁদের নাম পাওয়া যায়। কর্ণানন্দের চেয়েও অনুরাগবল্লীর বক্তব্য অধিক প্রামাণ্য। কাজেই এঁরা ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য ছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না।

ঈশ্বরীদেবীর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা এবং অপর বধূ চন্দ্রমুখীর নাম উল্লেখযোগ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীকার এঁদের আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন ও মধ্যম পুত্র রাধাকৃষ্ণের স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কর্ণানন্দের দ্বিতীয় নির্যাসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন সত্যভামা। ইনি এবং দ্বিতীয়া পত্নী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য ছিলেন। মনে হয় অনবধানতাবশতঃ হরিদাস দাস বাবাজী এক্ষেত্রে ভুল করেছেন।

সত্যভামা ও চন্দ্রমুখী দেবীর নামের পর রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, বৃন্দাবন

চক্রবর্তী, বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী, রাধাবিনোদ চক্রবর্তী এবং কিশোরী চক্রবর্তীর নামের উল্লেখ আছে। কর্ণানন্দের বর্ণনায় পরিষ্কার না থাকায় এঁরা কার শিষ্য সে সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহ থেকে গিয়েছে।

আলোচ্য নামগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার প্রধান কারণ, সত্যভামা ও চন্দ্রমুখী দেবীর অগণিত শিষ্যবৃন্দের নাম বলা সম্ভব নয় একথা বলার পর এঁদের নাম বলা হয়েছে। এরপর শেষোক্ত নাম দুটির শেষে বলা হয়েছে যে এঁরা 'মাতার সেবক দুঁহে ঈশ্বরীর অনুসেবক'। স্বভাবতঃই সেক্ষেত্রে মনে হয় যে এঁরা ঈশ্বরীর শিষ্যা সত্যভামা ও চন্দ্রমুখীর শিষ্য এবং সেই হিসাবে ঈশ্বরী দেবীর অনুশিষ্য। কিন্তু প্রথম নির্যাসে শেষোক্ত দুজন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এঁরা গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র এবং ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য। এখন প্রশ্ন এই যে কর্ণানন্দের এই দুই উক্তির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য?

হরিদাস দাস বাবাজী এর যেভাবে সমাধান করেছেন তাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। তিনি ধরে নিয়েছেন রাধাবিনোদ ও কিশোরী নামে দুজন করে মোট চারজন ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন রাধাবিনোদ ও একজন কিশোরী সত্যভামার এবং অন্যজন রাধাবিনোদ ও কিশোরী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য ছিলেন। একই গ্রন্থে দুজন রাধাবিনোদ এবং দুজন কিশোরীর কথা বলা হয়ে থাকলে এঁদের পৃথক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ছিল। গ্রন্থকার সেরকম পরিচয়ও দেন নি। এসব কারণে মনে হয় গ্রন্থকারের বক্তব্য হলো এঁরা ঈশ্বরী দেবীরই শিষ্যশিষ্যা।

একথা মনে করার আরও কারণ আছে। গ্রন্থকার ঈশ্বরী দেবীর অগণিত শিষ্যশিষ্যার মধ্যে শুধুমাত্র দুই পুত্রবধূর কথা বলেই তাঁর শিষ্য-পরিচিত শেষ করলেন একথা স্বীকার করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ সত্যভামা ও চন্দ্রমুখীর অগণিত শিষ্যশিষ্যা সম্বন্ধে বলতে অপারগ হয়েও তিনি তাঁদের পাঁচ জন শিষ্যের নাম করলেন—একথাও স্বীকার করা যায় না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন গ্রন্থকার দুই পুত্রবধূর কথা একসঙ্গে বলেছেন। তারপর তিনি যদি তাঁদের শিষ্য হিসাবেই এঁদের নাম করে থাকেন তবে সত্যভামা ও চন্দ্রমুখী—এই দুজনের মধ্যে এঁরা কার শিষ্যশিষ্যা সেসম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল। কিন্তু সেরকম কোন উল্লেখও এখানে নেই। এস বকারণেই মনে হয় এঁরা সকলে ঈশ্বরীদেবীর শিষ্যশিষ্যাই হবেন।

আচার্যকন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্যতালিকায় সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্রের নাম। গৌড়ীয় জীবনীতে শ্রীনিবাসাচার্যের বংশতালিকায় গতিগোবিন্দের পুত্রদের নাম দেওয়া আছে কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ, শ্রীহরি, সুবল ও রাধামাধবের নাম। কিন্তু বিশ্বভারতীর পুথিশালায় প্রাপ্ত একটি পুথিতে আচার্যের পরিবারের তালিকা পাওয়া যায়। এই পুথিতে গতিগোবিন্দ প্রভুর সন্তানদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে "শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর সন্তান ৫। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রভু শ্রীভুবনচন্দ্র প্রভু শ্রীরাধামাধব প্রভু পক্ষান্তরে শ্রীহরিসানন্দ প্রভু শ্রীসুন্দরানন্দ প্রভু এই দুই প্রভুর শ্রীপাট বিষ্ণুপুর পূর্ব তিন ঠাকুরের বাস জাজিগ্রাম শ্রীল শ্রীআচার্য প্রভুর বাস দুই শ্রীপাটেশ্রমে শ্রীভুবনচন্দ্র প্রভু শ্রীরাধামাধব প্রভু এই দুই প্রভুর সন্তান নাই।" ইত্যাদি। এখানে 'গতিগোবিন্দের যে পুত্রদের কথা বলা হয়েছে এঁদের মধ্যে একজন ছাড়া অপর সকলের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে উল্লিখিত নামের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কেবলমাত্র জীবনীতে উল্লিখিত সুবলচন্দ্রের পরিবর্তে পুথিতে ভুবনচন্দ্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই নামটি যে ভুবনচন্দ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ পুথির দুস্থানে একই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি নামের মধ্যে কোনটি ঠিক তা অপর একটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া নির্ণয় করা কঠিন। ইতিপূর্বে আমরা বহুক্ষেত্রে দেখেছি যে কর্ণানন্দের বক্তব্যকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা কঠিন। হরিদাস দাস বাবাজী প্রদত্ত তথ্যের মূল সূত্র একবার পরীক্ষা না করে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

হেমলতা দেবীর শিষ্য হিসাবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের পর গোকুল চক্রবর্তী, মণ্ডলগ্রামবাসী রাধাবল্লভ ঠাকুর, 'গোসাঞি নিবাসী' বল্লভ দাস, গ্রন্থকার যদুনন্দন, কানুরাম চক্রবর্তী, দর্পনারায়ণ, চণ্ডী সিংহ, রামচরণ, মধু বিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য, জগদীশ কবিরাজ এবং রাধাবল্লভ কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কারো কোন পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হয় নি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে মণ্ডলগ্রামবাসী রাধাবল্লভ ঠাকুরকে শ্রীনিবাসাচার্যের পুত্র এবং হেমলতার শিষ্য বলে বলা হয়েছে। আচার্যের কোন পুত্রের নাম রাধাবল্লভ ছিল না। কাজেই হরিদাস দাস বাবাজীর এই বক্তব্যকে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

গ্রন্থোক্ত শেষ দুই কবিরাজ সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। পদাবলী-সাহিত্যে জগদীশ কবিরাজের নাম এযাবৎ পাওয়া যায় নি। রাধাবল্লভ কবিরাজই বা কে? জগদীশকে রাধাবল্লভ কবিরাজের ভাই বলা হয়েছে, কিন্তু শেষোক্ত

কবিরাজের পরিচয় এবং তিনি কার শিষ্য ছিলেন সে কথা বলা হয় নি। রাধাবল্লভ নামে আচার্যের কয়েকজন শিষ্য ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যেও একজন রাধাবল্লভের উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্যের কবিরাজ শিষ্যদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এঁর কথা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার আচার্যশিষ্য এই রাধাবল্লভের ভাই জগদীশ কবিরাজের কথা বলেছেন কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র এই কয়েকটি নাম ছাড়া আচার্যের আর কোন প্রশিষ্যের নাম এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

গুণলেশসূচকের শেষ শ্লোকে কর্ণপূর কবিরাজ বলেছেন যে আচার্যের অগণিত শিষ্যপ্রশিষ্য সম্বন্ধে অনন্তদেবসদৃশ হলেও বলে শেষ করা যায় না। কবিরাজের এই বর্ণনা যে কতখানি সত্য তা তাঁর শিষ্যতালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুমান করা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর শিষ্যতালিকা দেখে মনে হয় যে কর্ণপূর কবিরাজের সময় থেকেই আচার্যের শিষ্যবর্গের তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। গুণলেশসূচকে যে শিষ্যতালিকা পাওয়া যাচ্ছে সেটিকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তিনি তাঁর পরিচিত এবং এই সূচক রচনাকালে জীবিত আচার্যশিষ্যদেরই নামের উল্লেখ করেছেন। একথা মনে হওয়ার কারণ এই যে আচার্য-পরিবারের অনেকের নাম উল্লেখ থাকলেও আচার্যপুত্র বৃন্দাবনদাস প্রমুখ কয়েকজনের নাম এই তালিকায় নেই। এছাড়া কবিরাজ খ্যাতি সম্পন্ন অনেকের নাম থাকলেও ভগবান কবিরাজ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত আচার্যশিষ্যের উল্লেখ এই তালিকায় পাওয়া যায় না।

আচার্যের-শিষ্য তালিকার আরও খানিকটা বিস্তৃতি পাওয়া যাচ্ছে অনুরাগবল্লীতে। এর লেখক তাঁর পরিচিতের গণ্ডীর বাইরে গিয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি কর্ণপূর কবিরাজের চেয়ে আরও বেশী বলতে পেরেছেন, তার কারণ, বোধহয় তিনি এর মধ্যে পুরানো নামগুলি তাঁর গুরুর নিকট পেয়ে থাকবেন। এছাড়া আচার্যের অন্যান্য প্রশিষ্যদের নিকট থেকেও কিছু নাম সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। তবে তিনি বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন তা মনে হয় না। কারণ যে সময় তাঁর গ্রন্থ রচিত হয়েছে সে সময় আচার্যের শিষ্যপ্রশিষ্যরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। এঁদের সকলের নাম সংগ্রহ করতে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় অনুরাগবল্লীর তালিকা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি এই পরিশ্রম স্বীকার করেন নি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে খণ্ডিত পুথিটি পাওয়া গিয়েছে সেটি অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেলে আচার্যের শিষ্যবৃন্দের একটি বিরাট তালিকা পাওয়া যেত বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া নরহরি চক্রবর্তীর বর্তমান অপ্রাপ্য গ্রন্থ শ্রীনিবাসচরিত্রে আচার্যের শিষ্যতালিকা ছিল বলে গ্রন্থকার নিজে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসসচেতন এই গ্রন্থকারের গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত তালিকা বর্তমানে না পাওয়া যাওয়ায় আচার্যের শাখাবর্ণনার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে আচার্য-শিষ্য-তালিকায় অনেক নাম পাওয়া গেলেও আলোচনাকালে দেখা গেল এই দুটিকে খুব নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে যে তাঁরা একই নাম দুবার দুই ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তালিকায় নানা ভুলত্রুটি থাকার জন্য এই গ্রন্থদুটিতে প্রদত্ত সকল নাম বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায় না। প্রামাণ্য গ্রন্থের তালিকার সাহায্যে এই নামগুলিকে একবার মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। অন্তত: পক্ষে এঁদের নাম সংগ্রহের সূত্র পেলেও একাজে সাহায্য হতো। কর্ণানন্দে তবু লেখক তাঁর সূত্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট হলেও খানিকটা বলেছেন কিন্তু প্রেমবিলাসে কিছুই বলা হয় নি।

প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের আচার্যশিষ্য-তালিকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। দুটি গ্রন্থে শিষ্যদের নামের তালিকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ক্রমে সাজানো। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় কোনও একজন গ্রন্থকার তাঁর তালিকার জন্য অপর গ্রন্থের তালিকার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুটি গ্রন্থ থেকে খানিকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাস থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হলো—

চৈতন্যদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস আর।
বিপ্র বলরামদাস সদাহরি নাম যার॥
উৎকলদেশী জয়রাম চৌধুরী মহাশয়॥
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য দয়াময়॥
ব্রাহ্মণ শ্রীহরিবল্লভ সরকার ঠাকুর।
কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী শাখা ভক্তিপুর॥
গৌড়দেশবাসী কৃষ্ণ পুরোহিত ঠাকুর।

আর শাখা শ্যামচট্ট যাঁর শিষ্য প্রচুর ॥
গৌড়দেশবাসী জয়রাম চক্রবর্তী ।
ঠাকুরদাস ঠাকুর যাঁর সঙ্কীর্তনে প্রীতি ॥

কর্ণানন্দে এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে—

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্যদাসে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগোবিন্দ নামে ।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোন্মাদে ॥
তন্তুবায় কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে ।
সদাপ্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে ॥
উৎকলদেশেতে জন্ম বলরাম দাস ।
বিপ্রকুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস ॥
তবে প্রভু দয়া কৈল চৌধুরী দয়ারামে ।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে ॥
দুইজনে মহা প্রীত কহনে না যায় ।
সর্ব্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর নিজ পায় ॥
তার ভক্তরাজ এক শ্রীহরিবল্লভ ।
সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্লভ ॥
প্রভু ত করিলা কৃপা হইয়া সদয় ।
যাহার ভজন রীতি কহন না যায় ॥
আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী ।
প্রভুকৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি ॥
গৌড়দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈলা ।
দুইজনার শিষ্যপ্রশিষ্য জগত ব্যাপিলা ॥
একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী ।
প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি ॥
তবে কৃপা কৈলা প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে ।
তাহার ভজন রীতি বড়ই গম্ভীরে ॥

দেখা যাচ্ছে কর্ণানন্দে যে নাম সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে প্রেমবিলাসে সেগুলিকে একই ক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তালিকার

জন্ত এই দুটির মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপরটির ওপর নির্ভর করেছে বলা কঠিন। কর্ণানন্দে প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে কর্ণানন্দকার প্রেমবিলাসের ওপর নির্ভর করেছেন এবং প্রেমবিলাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে বিস্তৃত করে নিয়েছেন মাত্র। কিন্তু প্রেমবিলাসের বিংশতি বিলাস প্রক্ষিপ্ত বলে প্রায় সকল পণ্ডিতের অভিমত। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পরে পরবর্তীকালে কোন ব্যক্তি কর্ণানন্দের বিবরণকে ভিত্তি করে এই বিলাসটি রচনা করে প্রেমবিলাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এসব সত্ত্বেও কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাস কর্তৃক প্রদত্ত শিষ্যতালিকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রথমতঃ তাঁরা প্রামাণ্য সূত্র, দিতে না পারলেও যে একেবারে মনগড়া কতকগুলি নাম দিয়েছেন একথা বলা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে কোন সূত্রের ওপর তথ্যাদির জন্ত নির্ভর করেছিলেন সে কথা অনুমান করা যেতে পারে। বিশেষতঃ বাংলার বাইরের আচার্যশিষ্যবৃন্দের নাম একমাত্র এই দুটি গ্রন্থেই পাওয়া যাচ্ছে' কোন প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া এই নামগুলি পাওয়া সম্ভব নয়।

বাংলার বাইরের যে সব স্থানের আচার্যশিষ্যের নাম এই গ্রন্থদুটিতে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উৎকল ও মথুরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব স্থানেও যে আচার্যের শিষ্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কর্ণপূর কবিরাজের রচনায়। গুণলেশসূচকের শেষ শ্লোকে তিনি বলেছেন—

> রাঢ়ং বঙ্গং সুগৌড়ং ব্রজমথ মগধঞ্চোৎকলং রাজকঞ্চ
> পারেগঙ্গং বরেন্দ্রং গিরিজমপি তথা বৃন্দকঙ্কালকঞ্চ।
> গাঙ্গেয়ং মধ্যদেশং ভুবনমিদমপি প্রাবৃতং যৎপ্রশিষ্যৈঃ
> কঃ শাখাং বক্তুমীষ্টে ফণিবরসদৃশঃ শ্রীনিবাসপ্রভোস্তু॥

কবিরাজের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান যে রাঢ়, বঙ্গ, গৌড়, ব্রজ, মগধ, উৎকল, রাজক, বরেন্দ্রভূমি, গিরিজ, বৃন্দকঙ্কাল, গাঙ্গেয় মধ্যদেশ প্রভৃতি অঞ্চল আচার্যের শিষ্য প্রশিষ্যে ব্যাপ্ত ছিল। স্থানগুলির পরিচয় সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা করলে কবিরাজের সময়েই শিষ্যপ্রশিষ্যরা দেশের কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল সে সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

রাঢ় বলতে গঙ্গার পশ্চিম তীরের অংশকে বোঝাতো। তমলুক, মেদিনীপুর এবং বর্তমান হুগলী ও বর্ধমান জেলা তৎকালীন রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত

ছিল। এছাড়া বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার একটা অংশও রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

বঙ্গ বলতে নদী ও জলবহুল পূর্ব বাংলা দেশের পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অংশকে বোঝানো হতো। মহাভারতের সময়েও পুণ্ড্র সুহ্ম প্রভৃতি পৃথক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাচীন গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল বর্তমান পশ্চিম বাংলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। অগ্রবণ ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্রজ নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন মগধ বলতে দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে বোঝাতো। এই মগধের সীমানা ছিল উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোণ, পূর্বে চম্পা নদী ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা। একসময়ে কাঁসাই (কপিশা) ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জেলা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ উৎকল নামে খ্যাত ছিল।

প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের একাংশ এবং গঙ্গা, মহানন্দা, কামরূপ ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম ছিল বরেন্দ্র।

গিরিজ সম্ভবতঃ গিরিব্রজ শব্দের অপভ্রংশ। এই গিরিব্রজ, যা পরবর্তীকালে রাজগৃহ ও বর্তমানে রাজগীর নামে পরিচিত, সর্বপ্রথম মগধের রাজধানী ছিল।

কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত রাজক এবং বৃদ্ধকঙ্কালের বর্তমান নাম জানা যায় নি। গাঙ্গেয় মধ্যদেশ বলতেও কোন্ স্থানকে বোঝায় সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে খানিকটা মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে এবিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতটিই স্বীকার করা যায়। তাঁর মতে এলাহাবাদের পূর্বদিক ও পুণ্ড্রবর্ধনের (অর্থাৎ বাংলার বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়) পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে গাঙ্গেয় মধ্য দেশ বলা হতো।

কর্ণপূর কবিরাজের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে পূর্বে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে ব্রজ পর্যন্ত এবং উত্তরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলের কিছুটা অংশ, বর্তমান পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্তটা এবং উড়িষ্যার খানিকটা পর্যন্ত আচার্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যে ব্যাপ্ত ছিল।

হরিদাস দাস বাবাজী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে আচার্য নিম্নলিখিত চৌদ্দটি 'ভূমে' বা রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছেন।

১। মল্লভূম ২। মানভূম ৩। সিংহভূম ৪। ভট্টভূম ৫। সামন্তভূম ৬। বরাহভূম ৭। তুঙ্গভূম । ব্রাহ্মণভূম ৯। শীকরভূম ১০। ধলভূম ১১। ধনভূম ১২। নাগভূম ১৩। বীরভূম ও ১৪। শবরভূম।

বাবাজী উল্লিখিত সিংহভূম, মানভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম, বরাহভূম ও বীরভূম পশ্চিমবাংলার সীমান্ত অঞ্চল বলে প্রসিদ্ধ। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল এককালে মল্লভূম নামে খ্যাত ছিল। দাস বাবাজী মল্লভূম বলতে বিষ্ণুপুরের কথা উল্লেখ করেছেন। ছোটনাগপুরের একটি জেলার নাম ছিল মানভূম। এর উত্তরে ছিল হাজারিবাগ জেলা ও সাঁওতাল পরগণা পূর্বে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর, দক্ষিণে সিংহভূম এবং পশ্চিমে রাঁচী ও হাজারিবাগ। সিংহভূম বলতে বর্তমান চাইবাসা প্রভৃতি ছোটনাগপুরের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলকে বোঝাতো। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে এর সীমানা ছিল--উত্তরে রাঁচী ও মানভূম, পূর্বে মেদিনীপুর, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ এবং পশ্চিমে রাঁচী ও গাঙ্গপুর রাজ্য। বর্তমান রামগড়কে পূর্বে ভট্টভূম বলা হতো অনুমান করা যেতে পারে। বরাহভূম পূর্বোক্ত মানভূম জেলায় অবস্থিত ছিল। ধলভূম সিংহভূম জেলার একটি মহকুমা। স্বাধীন ধলভূম রাজ্যের সামন্তরাজ্য ছিল সেরাইকেলা ও খ[illegible]ন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধলভূম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহালের অন্তর্গত ছিল। মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে সুবর্ণরেখা থেকে উত্তরে কংশাবতী নদী পর্যন্ত ভূভাগ শবরভূম নামে পরিচিত ছিল।

হরিদাস দাস বাবাজী উল্লিখিত নবম ভূম বোধহয় শিখরভূম। ভক্তিরত্নাকরে শিখরভূমের রাজা হরিনারায়ণের উল্লেখ আছে। হরিনারায়ণ রামভক্ত ছিলেন বলে আচার্য তাঁকে দীক্ষাদান করেন নি, তবে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই স্থান মল্লভূমের নিকটবর্তী ছিল।

দাস বাবাজী উল্লিখিত 'ভূম'গুলির সবকটি সম্বন্ধে পরিচয় না পাওয়া গেলেও যেগুলি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখা যায় বর্তমান বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাব বর্তমান ছিল। এর সঙ্গে কর্ণপূর কবিরাজ বর্ণিত অঞ্চলগুলি একত্র করলে উত্তর ভারতের যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাব দেখা যায় তা' সত্যিই বিস্ময়কর। এই বিরাট এলাকায় অবস্থিত আচার্যের সকল শিষ্যের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করা

একরকম অসম্ভব বলা যায়। প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের তালিকা দেখে মনে হয় কোনও একসময়ে হয়তো সকল স্থানের আচার্যের শিষ্যদের নাম সংগ্রহের একটা চেষ্টা হয়েছিল। তারই সামান্য অংশ এই গ্রন্থকারদ্বয় পেয়েছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন।

। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীনিবাসাচার্যের দান

পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। খৃষ্টজন্মের প্রায় সমসাময়িক কাল থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে নানা কবি নানা পদ রচনা করে তামিল, সংস্কৃত, মারাঠি ও গুজরাতি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন[১]। বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলীর ইতিহাস এত পুরানো না হলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা পাওয়া যাচ্ছে। এর রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বৈষ্ণব গীতিকবিতা রচনা আরম্ভ হলেও ষোড়শ শতাব্দীতে পদাবলী সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে। মুসলমান শাসনের সময়ে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার মূলে যেমন স্বয়ং চৈতন্যদেব তেমনি সে যুগের পদাবলী-সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলেও তিনি। চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে রচিত লৌকিক কাব্য চৈতন্যদেবের প্রভাবে অলৌকিকত্ব লাভ করল। চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কৃত রাধাকৃষ্ণলীলার অভিনব ব্যাখ্যাদ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পদাবলী সাহিত্য স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। সেযুগের কয়েকজনের রচনা বিশেষতঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনায় এই সুষমা লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধুমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর নন, তাঁকে সমগ্র যুগের পদাবলী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদকার বলা চলে।

গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যদের অন্যতম। সুতরাং এ যুগের পদাবলী-সাহিত্যের উৎকর্ষের গৌরব শিষ্যের সঙ্গে গুরুরও প্রাপ্য। আচার্যের শিষ্যবর্গের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দদাসই যদি পদকার হতেন তবে পদাবলী-সাহিত্যের এই উৎকর্ষের জন্য তিনি হয়তো কোন কৃতিত্ব দাবী করতে পারতেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে গোবিন্দদাস ছাড়া আরও অনেকে পদরচনা করে বাংলা সাহিত্যে

---

১. ষো. শ. প. সা.—পৃ. ১৫ঃ

স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। শুধু বাংলা ভাষায় নয়—তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষাতেও কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা সকলে আচার্যের শিক্ষা ও প্রেরণাদ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠ পদসমূহ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই এক্ষেত্রে আচার্য শুধুমাত্র শিষ্যদের গৌরবে গরীয়ান না হয়ে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বও দাবী করতে পারেন।

অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ এদেশে বৈষ্ণবধর্মের যে জোয়ার এনেছিলেন তাঁদের অবর্তমানে সেই ধারা ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বাংলাদেশে এনে প্রচার করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশে বৈষ্ণবধর্মে এমন জোয়ার এলো যার প্রবাহে শুধু সে যুগই প্রবাহিত হয় নি, তার ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। পদাবলীর ক্ষেত্রেও শ্রীনিবাসাচার্যের কৃতিত্ব একই প্রকারের। পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশে আচার্যের প্রেরণা কতখানি কাজ করেছে তা নিরূপণ করতে গেলে পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের খানিকটা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর একটি বিশিষ্ট স্থান থাকলেও পদকাররা নিছক সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পদরচনা করেন নি। এই রচনার মূলে হলো আরাধ্য দেবতার নাম, লীলা ও গুণ ভাষায় উচ্চারণ করা। সুর, তাল ও বাদ্যের সাহায্যে আরাধ্য দেবতার নাম, লীলা ও গুণ কীর্তন করার জন্য পদাবলীর সৃষ্টি। ধর্ম ও সাহিত্য এখানে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ধর্মের প্রয়োজনে কীর্তন এবং কীর্তনের প্রয়োজনে পদ। এভাবে বিকশিত বৈষ্ণবধর্মের প্রয়োজনের তাগিদে উচ্চশ্রেণীর পদাবলীর সৃষ্টি। শ্রীনিবাসাচার্য একাধারে ধর্মগুরু এবং কবি ছিলেন। সেজন্যই তিনি একদিকে যেমন সার্থক ধর্মপ্রচারক হতে পেরেছিলেন তেমনি এই ধর্মের কারণে বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দিককে আরও উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে কীর্তনের জন্য পদাবলীর প্রয়োজন। রূপ গোস্বামী কীর্তনের সংজ্ঞায় বলেছেন—নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈভাষা তু কীর্তন' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব ২'।৬৩)—অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণ' হলো কীর্তন। এই তিন শ্রেণীর কীর্তন সাধক কী পর্যায়ক্রমে অভ্যাস করবেন তা' শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন। তাঁর

মতে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নামকীর্তন করা বিধি। এরপর শ্রীকৃষ্ণের রূপকীর্তন করা ও শোনার অধিকার হয়। অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বতঃই উদিত হতে থাকলে তাঁর গুণকীর্তন করা কর্তব্য: এসব স্তর পার হওয়ার পর তাঁর লীলা গান করা ও শোনার অধিকার জন্মায়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কৃত কীর্তনের ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব নেই। ডঃ সুকুমার সেনের মতে দেবতার নাম গান করা বেদের সময় থেকেই আছে[২]। বাজনা বাদ্য নিয়ে দেবতার কীর্তিগান কালিদাসের কালেও অজানা ছিল না। মহাকবির মেঘদূত থেকে উক্তি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে তখনও এভাবে দেবতার বন্দনা করা হতো[৩]।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' বলে স্তব করলেও ভারতের অন্যত্র কীর্তন বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার রাধাকৃষ্ণের লীলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রায় আঠারোশত বৎসর আগে থেকে দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এই লীলাকীর্তনের প্রচলন ছিল[৪]। এর মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তামিল ভাষায় রচিত শিলপ্পাদিকারম সর্বাধিক প্রাচীন। এই কাব্যে রাস ও বস্ত্রহরণলীলার গান পাওয়া যায়। এই কাব্যের নায়িকা পিন্নয়ই খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে আড়বারদের রচিত পদে নপিন্নাই হয়েছেন বলে অনুমান করা যায়। তবে এখানে নায়িকার আসন আরও উর্দ্ধে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শুধু দয়িতাই নন, লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও বেশী প্রিয়। কৃষ্ণের এই প্রিয় দয়িতার রাধা নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সঙ্কলন—হালের গাথাসপ্তশতীতে।

দক্ষিণভারতে আড়বারদের রচিত নারায়ণের রূপ, গুণ ও লীলা অবলম্বনে রচিত প্রায় চার হাজার পদ পাওয়া যায়। এই পদগুলি দক্ষিণভারতের বৈষ্ণবমন্দিরসমূহে গীত হয়ে থাকে। এঁদের রচিত কয়েকটি পদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য রসের পদের ভাবের মিল দেখা যায়।

আড়বারদের সমসাময়িককাল থেকে উত্তরভারতেও রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচিত শ্লোক পাওয়া যায়। সে সময় থেকে জয়দেবের সময় পর্যন্ত এই লীলা অবলম্বনে রচিত বিক্ষিপ্ত রচনা প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু

---

২. বৈ. নি. —পৃ. ৫০। ৩. ঐ   ৪. বো. শ. সা. —পৃ. ১৫৫-৬৭

সুসংবদ্ধভাবে রচিত গ্রন্থ হিসাবে বোধহয় জয়দেবের গীতগোবিন্দই প্রথম। এই গ্রন্থকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের একটি আলোকস্তম্ভ বলে ডঃ মজুমদার অভিমত প্রকাশ করেছেন[৫]। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অবশ্য এই কাব্যখানিতে 'হরিস্মরণে সরসং মনো' অপেক্ষা 'বিলাসকলাসু-কুতূহলম্'-এর দিকটা বড় হয়ে উঠেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন[৬]। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস আলোচনা করে দেখলে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা অবলম্বনে রচিত প্রথম কীর্তনের উপযুক্ত গ্রন্থ বলে এটি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই সারাভারতে সমানভাবে আদৃত হয়েছিল। গ্রন্থের মধ্যে 'হরিস্মরণ' অপেক্ষা 'বিলাসকলাসু'র দিকটা বড় হয়ে থাকলে বৈষ্ণবরা একে গোড়া থেকেই সমাদর করতেন কি না সন্দেহ।

চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নামকীর্তনের অভ্যাস ছিল। তৎসত্ত্বেও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' বলে বন্দনা করেছেন। এখানে যে অর্থে এঁদের কীর্তনের পিতামাতা বলা হয়েছে তা' প্রাচীন পদ্ধতিতে নাম-কীর্তনের জন্য নয় লীলাকীর্তনের জন্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে ভারতের অন্যান্য অংশে গীতগোবিন্দ গীত হলেও দক্ষিণ ভারতের মত কৃষ্ণের গুণ ও লীলা অবলম্বনে পদ কীর্তনের প্রচলন বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। কারণ কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় নীলাচলে চৈতন্যদেব যখন রথযাত্রার সময় সংকীর্তনে মত্ত ছিলেন তখন প্রতাপরুদ্র বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে এমন কীর্তনকৌশল তিনি কোথাও দেখেন নি। সার্বভৌম তার উত্তরে রাজাকে জানিয়েছিলেন যে চৈতন্যদেবই এই কীর্তনকৌশলের সৃষ্টিকর্তা (৮। ৩২)।

চৈতন্যদেবের কীর্তনপদ্ধতির বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্য-চরিতামৃতে। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর নবদ্বীপে ফিরে এলেন। সে সময় থেকেই তাঁর ভাবান্তর লক্ষিত হয়। এসময় থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর নিরন্তর কীর্তন ও ভাবপ্রকাশ অব্যাহত ছিল। গয়া থেকে ফেরার প্রথম চার মাস তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন কিন্তু পরে তাও পারেন নি। এসময়ের

---

৫. ষো. শ. প. সা. —পৃ. ১৮১। ৬. শ্রীরা. ক্র.—পৃ. ১৫০

কীর্তনের সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় চৈতন্যদেব তখন নামকীর্তনের ওপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে উচ্চৈস্বরে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'—এই নাম কীর্তন করতেন। মনে হয়, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে নাম কীর্তনের যে ধারা ছিল এপর্যন্ত তিনি তাকেই অক্ষুণ্ণ রেখে "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সব জগত নিস্তার॥" —এই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু অন্তরঙ্গসঙ্গে তিনি যে গুণ ও লীলা কীর্তন করতেন তার প্রমাণও চরিতামৃতে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যলীলায় আছে যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করেন তখন ভক্তসঙ্গে অদ্বৈত আচার্য দুছত্রের পদ গান করে কীর্তন করেছিলেন। এই পদটি হলো—"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥" এই কীর্তন গান শ্রবণে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হয়। তখন তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝে মুকুন্দ চার ছত্রের "হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে" পদটি গেয়ে শোনান। চরিতামৃতে পদের উল্লেখ এই প্রথম হলেও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে মহাপ্রভু বাইরে 'হরি হরয়ে নমঃ" বলে নাম সংকীর্তন করলেও অন্তরঙ্গ সঙ্গে পদ গান করতেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন পদগানের কথা আলোচনা করে বলেছেন "আগে পদ বলিতে দুই ছত্রের গান বা গানের দুই ছত্র বুঝাইত। যেমন ধ্রুবপদ।"[৭] চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ দেখে অনুমান করা যায় সেকালে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গরা এই ভাবেই পদগান করতেন।

চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগ থেকেই নামগুণ ও লীলাকীর্তন বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেকালে বৈষ্ণবসমাজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাঁদের অন্যান্য প্রথার মত কীর্তনও জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। তবে সেকালের বৈষ্ণবরা যে পদ রচনা করতেন চরিতামৃতের এই উদ্ধৃতিগুলিও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চরিতামৃতের যে দুটি পদের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিদ্যাপতির রচনা। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বাংলায় যথেষ্ট পদ তখন না থাকায় তাঁর রচিত পদ গান করার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়ে থাকবে।

---

[৭] বা. সা. ই. —পৃ. ৩৮৫

চৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দের অধিকাংশ ছিলেন শিক্ষিত ও পণ্ডিত। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে কবি এবং গীতিকারও ছিলেন। নৃত্যগীতে দক্ষ তাঁর পরিকরদের নাম পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে। এখানে দেখা যায় যে রথযাত্রার সঙ্গে যে চার সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা চৈতন্যদেব করেছিলেন তাতে মোট চল্লিশজন গায়ক ও আটজন মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। এই চার সম্প্রদায়ের গায়ক ও নর্তক সকলেই ছিলেন তাঁর গৌড়বাসী পরিকরবৃন্দ। এছাড়া আরও তিন সম্প্রদায় কীর্তনের এই রথযাত্রার সঙ্গে ছিল। এঁদের পরিচয় এই গ্রন্থে নেই। এই রথযাত্রার সময়ে যে সঙ্কীর্তন হয়েছিল তা দেখে এবং শুনে রাজা প্রতাপরুদ্র বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন যে এ জিনিষ তিনি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেননি। মনে হয় নাম ও লীলাকীর্তনের যে ধারা চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরবৃন্দ নবদ্বীপে প্রবর্তন করেছিলেন সে জিনিষ উড়িষ্যায় প্রথম এই রথযাত্রায় করেছিলেন। লীলাকীর্তনে তাঁদের এই নিজস্ব ধারায় রাজা বিস্মিত হয়ে থাকবেন।

লীলাকীর্তনের জন্য যে রকম পদের প্রয়োজন তা' পাওয়া যেত গীতগোবিন্দে, এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। চৈতন্যদেবের ভাবে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দ পদরচনাতেও প্রবৃত্ত হন। নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দের মধ্যে যাঁরা পদকার হিসেবে পরবর্তীকালেও স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, মুরারি গুপ্ত, মাধব ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত ও রামানন্দ বসু প্রধান। এঁদের প্রভাবে সমসাময়িক আরও কবি পদরচনা করতেন, তাঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ-পরিকর গৌরীদাস, বলরাম দাস আদি কবির নাম করা যেতে পারে।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দের রচিত যত পদ এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা চৈতন্যদেবের লীলা অবলম্বনে যত পদ রচনা করেছেন সে তুলনায় রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যা তুলনায় কম। গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুতে তাঁদের ভণিতায় প্রকাশিত গৌরাঙ্গ এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মোট পদসংখ্যা যথাক্রমে ২৮৯ ও ৩০। অবশ্য এই ২৮৯টি পদের সবকটিই মহাপ্রভুর পরিকরদের রচনা কি না বলা কঠিন। বিশেষতঃ নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের

ভণিতার পদসম্বন্ধে একথা বলা চলে। এঁদের ভণিতায় প্রকাশিত পদগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তুর বিচারে মনে হয় পরবর্তী কালের একাধিক পদকার নানা কারণে তাঁদের নিজস্ব রচনায় এই দুই বিখ্যাত পদকারের নাম ভণিতায় ব্যবহার করেছেন। সেগুলি আসল রচনার সঙ্গে মিশে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আছে একই নামে নানা যুগে নানা পদকারের আবির্ভাব। বলরাম, বংশীদাস প্রমুখ নামে নানা যুগে একাধিক পদকার ছিলেন, এঁদের মধ্যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকার বংশীদাস প্রভৃতির রচনা পৃথক করা দুঃসাধ্য না হলেও কঠিন। তবে আদি পদকারদের রচনা পরবর্তী পদকারদের রচনা থেকে পৃথক করলেও দেখা যাবে এঁদের রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদসংখ্যা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী।

নবদ্বীপলীলার পরিকরদের রচনায় গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদের সংখ্যাধিক্যের কারণ নানাবিধ হতে পারে। প্রথমতঃ শিবানন্দ, নরহরি, মুরারি প্রমুখ পরিকরবৃন্দ চৈতন্যদেবকেই পরম উপাস্যরূপে নিরূপণ করেছিলেন। তাঁদের মতে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব অভিন্ন হলেও তাঁদের আনন্দ ছিল চৈতন্যদেবের উপাসনায়। প্রবোধানন্দের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে" এই গৌরপারম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের প্রকটকালেই এই মতবাদ গৌড়ে, বিশেষত: নবদ্বীপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের অপর পরিকর বংশীবদনও মহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপিত করে সেবার্চনা করতেন। এবিষয়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুমতিলাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

চৈতন্যদেবের সকল পরিকরই তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলতেন এবং বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হিসেবে তাঁরা নাম ও লীলাকীর্ত্তনও করতেন বলে অনুমান করা যায়। গৌরাঙ্গের সেবার্চনার অঙ্গ হিসেবে তাঁর নাম ও লীলাকীর্ত্তনও বোধ হয় তাঁদের সাধনার অঙ্গ ছিল। মনে হয় তাঁরা আরাধ্য-দেবতা চৈতন্যদেবের লীলাকীর্ত্তন ও লীলাপ্রচারের উদ্দেশ্যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করতে আরম্ভ করেন। চৈতন্যদেবের ভাব ও লীলা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে তাঁদের রচনা প্রাণস্পর্শী হয়েছে। তাঁদের কবিত্বশক্তিও উপেক্ষা করার মত নয়। তাঁরা স্বভাবকবি ছিলেন বলেই তাঁদের দেখা ও অনুভূত ভাবকে সহজ ও অল্প কথায় এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেগুলি বাংলা সাহিত্যে আজও অম্লান হয়ে আছে।

বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্তৃক রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন এদেশে প্রচার হওয়ার পর গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদগুলোর সমাদর কমে নি বরং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই রচনাগুলির সমাদর বেড়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসাচার্যের চেষ্টায় এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে পদ রচিত হয়। সংখ্যায় কম হলেও গোবিন্দদাসের রচিত অনেক পদ আজও সাহিত্যরসিকের মর্মস্পর্শ করে থাকে। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ স্বীকৃতি না দিলেও পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর পদগুলির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের খেতরীর মহোৎসবের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। খেতরীর এই মহোৎসবের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ সমেত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপন এবং এদেশের সঙ্কীর্তনের বিধিবদ্ধ ধারা প্রতিষ্ঠা এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্থাপনের বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা এবং উৎসাহী ছিলেন নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী। এদেশের বৈষ্ণবসমাজের তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রভাবশালিনী মহান্ত, যাঁকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা পর্যন্ত মান্য করতেন। আবার চৈতন্যদেবের সেবকদের দলও এদেশে যথেষ্ট প্রভাবশালী। বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সঙ্গে এদেশে এই দুই প্রভাবশালী মতবাদের সমন্বয় সাধনই এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে অনুমান করা হয়।

খেতরীর উৎসবের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সঙ্কীর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারা নির্ধারণ করা। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলাকীর্তনের পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে গৌরাঙ্গের লীলা কীর্তন করার প্রথা এখানেই প্রথম এদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকলে স্বীকার করে নেন। রাধাকৃষ্ণলীলার বিশেষ ভাবের রস উপলব্ধি করার জন্য গৌরাঙ্গের সেই সেই ভাবের পদ আস্বাদন করা হয় বৃন্দাবনলীলার ভাবকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য। গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে পদ রচনার সময়ে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী রচয়িতারা পূর্ববর্তী রচয়িতাদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গৌরাঙ্গলীলার তুলনায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদের সংখ্যাল্পতার নানা কারণ থাকতে পারে। এর অন্যতম কারণ বলা যায় পূর্বসূরীর রচনার অভাব। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী যুগে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত বহু শ্লোক রচিত হয়ে থাকলেও গাওয়ার উপযুক্ত পদের সংখ্যা অল্প ছিল। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকেই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদের আরম্ভ বলা যেতে পারে। জয়দেবের পর

পাওয়া যায় বিদ্যাপতির রচিত পদসমূহ। চৈতন্যদেব তাঁর নবদ্বীপলীলায় বিদ্যাপতির পদ কীর্তন করতেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তখন গীতগোবিন্দের পদ কীর্তন করতেন বলে উল্লেখ নেই। তবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ সে সময়ে সারাভারতে সমাদর লাভ করেছিল। কাজেই আশা করা যায় গৌড়ের বৈষ্ণবসমাজও এই রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-পরিকরদের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদসমূহে এই পূর্বসূরীদের কোনও প্রভাবই লক্ষ করা যায় না। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনের কয়েকটি পদের অলঙ্কারহীন সরল ভাষায় প্রাণের স্বতস্ফূর্ত আবেগ চণ্ডীদাসের রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এযুগের রচনায় শ্রীকৃষ্ণের লীলার কয়েকটি বিষয়ের প্রাধান্যই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। যেমন দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি। এছাড়া সখ্যরস, বাৎসল্যরসের রচনাও কিছু পাওয়া যায়। সে তুলনায় মধুররসের রচনা সামান্যই পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে মধুররসের রচনার যে আধিক্য দেখা গিয়েছিল তার পেছনে ছিল বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনার প্রভাব। এঁরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক হলেও বয়সে তাঁরা নবদ্বীপের পরিকরদের চেয়ে ছোট ছিলেন। এঁরা সকলেই চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পরিকর হলেও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে নবদ্বীপ-পরিকরদের কোনও সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। গোস্বামীরা বৃন্দাবনে নিভৃতে বসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তার খবর পেলেও সে সব রচনার সঙ্গে গৌড়বাসী এই পরিকরবৃন্দ পরিচিত ছিলেন না। সেজন্যই গোস্বামীদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে পর্যন্তও এদেশে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদের ভাববৈচিত্র্য বেশী দেখা যায় না।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদের সংখ্যাল্পতার অপর কারণ হলো পদকারের অভাব। নরহরি প্রমুখ গৌরপারম্যবাদীদের রচিত এই বিষয়ের কোনও পদ পাওয়া যায় নি। একমাত্র মুরারি গুপ্তের সামান্য কয়েকটি এবং বংশীবদনের ভণিতায় কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এই বংশীবদন মহাপ্রভুর সমসাময়িক কি না বলা কঠিন। তবে নিত্যানন্দ-পরিকর গৌরীদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, বলরামদাস, যদুনাথ, কবিচন্দ্র প্রমুখ পদকাররাই এযুগে কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে বেশীর ভাগ পদ রচনা করেছেন। গোষ্ঠী হিসাবে গৌরপারম্যবাদীরা বড় হওয়ায় এবং

তাঁদের মধ্যে পদকার বেশী থাকায় তাঁদের রচনার আধিক্য কৃষ্ণলীলার তুলনায় বেশী হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনার প্রভাব পড়ার আগে পর্যন্ত এদেশের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ রচনায় নিত্যানন্দ-শিষ্যরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই ধারার শেষ পদকার ছিলেন জ্ঞানদাস। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যের জন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে এঁর যুগকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র যুগ বলে অভিহিত করেছেন। জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী গ্রন্থে ডঃ মজুমদার জ্ঞানদাসের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জ্ঞানদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য হলো পদসংখ্যায় আর তার বিষয়বৈচিত্র্যে। তাঁর পূর্ববর্তী সকল পদকারই বিভিন্ন লীলার কোনও একটিকে অবলম্বন করে বেশীর ভাগ পদ রচনা করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাস গৌরাঙ্গলীলা থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক পদ রচনা করেছেন। তবে সর্বক্ষেত্রে তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর কবিত্বের চরম বিকাশ হয়েছে একথা অবশ্য বলা চলে না।

জ্ঞানদাসের রচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এর আগের পদকারদের ওপর এঁদের রচনার এত প্রভাব লক্ষ করা যায় নি। পূর্ববর্তী যুগের পদকারদের ওপর বিদ্যাপতির প্রভাব না থাকার কারণ থাকতে পারে। তাঁরা রাধার বয়ঃসন্ধি, সখীশিক্ষা বা নবোঢা অবস্থার ওপর পদরচনা করেন নি বলা চলে। কিন্তু এই সব বিষয়বস্তু অবলম্বনে জ্ঞানদাসের অনেক পদ আছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এসব পদরচনায় বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডীদাসের প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় বেশী দেখা যায়। ভাব ও ভাষায় এঁদের দুজনের রচনায় সাদৃশ্য এত বেশী যে জ্ঞানদাসের বহু পদ চণ্ডীদাসের রচনা থেকে পৃথক করা কঠিন। জ্ঞানদাসের রচনায় রামানন্দ বসুর রচনার প্রভাবও লক্ষ্য করার বিষয়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যে রচনাবলীর দ্বারা গৌড়বাংলার পদকারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেগুলি পদাবলী নয়। বৃন্দাবনে বাংলা ভাষায় কোনও পদাবলী রচিত হয় নি। সমস্ত গ্রন্থই তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর প্রথম জীবনের রচনাও সংস্কৃত ভাষায়। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেছিলেন শেষ বয়সে। এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর রচিত পদগুলিকে

এদেশের বৈষ্ণব মহাজনরা পদাবলী সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই পদগুলিও কবিরাজের প্রথম জীবনের রচনা নয় বলেই মনে হয়। ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায় যে এদেশের পদকারদের রচনা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দেওয়া হতো। গোবিন্দ কবিরাজের রচনা বৃন্দাবনে নিয়মিত পাঠানোর প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় রচিত এসব পদাবলী বৃন্দাবনে খ্যাতিলাভ করার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত রচনার সময় এই পদগুলি রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের ভাব অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা আস্বাদন করার পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশদান। যে ছয়জন গোস্বামী একাজে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। এরপরই উল্লেখ করতে হয় এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর নাম, যিনি তাঁর পিতৃব্যদের অবর্তমানে এই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পথনির্দেশ করেন। তাঁর পিতৃব্যদের মতন তিনিও শেষজীবন পর্যন্ত এবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, যেগুলো অদ্যাবধি প্রামাণিক বলে স্বীকৃত।

এই তিন গোস্বামীর মধ্যে সনাতন গোস্বামী রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তুলনায় কম। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হলো বৃহৎ ভাগবতামৃতম্। এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডের প্রথমটিতে মধুর রসকে প্রধান বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বৃন্দাবনলীলার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অপর গ্রন্থ বৈষ্ণবতোষণী ভাগবতের দশম খণ্ডের ব্যাখ্যা। এছাড়া তাঁর অপর গ্রন্থের নাম হলো লীলাস্তব বা দশমচরিত। এই গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতনের রচনাবলী থেকে দেখা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মধুর রসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সনাতনের তুলনায় অনেক বেশী। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, গীতাবলী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং পদ্যাবলী প্রধান। এছাড়া তিনি অষ্টাদশ ছন্দ, উৎকলিকাবল্লরী, গোবিন্দবিরুদাবলী, অষ্টকালিকা শ্লোকাবলি প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, অষ্টাদশ ছন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ স্তোত্রসমৃদ্ধ। বিদগ্ধমাধব ও

ললিতমাধব গ্রন্থদুটি নাটক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদুটি ভক্তিরস-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং পদ্যাবলী রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণিত শ্লোকের সমষ্টি।

বাংলার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব বেশী। ডঃ শুকদেব সিংহ তাঁর 'শ্রীরূপ ও পদাবলী-সাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পদকারদের ওপর শ্রীরূপের প্রভাব কতখানি।

শ্রীরূপ ও সনাতন অপেক্ষা শ্রীজীবের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশী। ভক্তিরত্নাকরে মোট কুড়িটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাকরণ, বৈষ্ণবকাব্য, রসশাস্ত্র, আরাধনাপদ্ধতি, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অন্তর্ভুক্ত। তিনি শুধু গ্রন্থকার হিসাবেই বিখ্যাত নন, সেযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনদের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর মতামত সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। শ্রীনিবাসাচার্যের সময় থেকে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। পদকারদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদ নিয়মিত তাঁর কাছে পাঠানো হতো বলে ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করা আছে। কাজেই তাঁর রচনার প্রভাবও বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করার পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধকদের নির্দেশ দেওয়া। এসব গ্রন্থের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃতও একটি। রাধাকৃষ্ণের এই নিত্যলীলা অষ্টপ্রহর ধরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান। শ্রীরূপ এই বিষয় নিয়ে অষ্টকালিকা শ্লোকাবলী রচনা করেছিলেন। শোনা যায় তিনি এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে রচনা করার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নির্দেশ দিলে তিনি গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহরের লীলা ধ্যানের পক্ষে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা সহায়ক বলে এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। অষ্টপ্রহরের এই লীলাকীর্তনের জন্য যেসব পদ বাংলাভাষায় রচিত হয়েছিল সেগুলো অষ্টকালীয় লীলাকীর্তনের পদ বলে প্রসিদ্ধ। আচার্য গোবিন্দদাসের এই পদসমূহ পদাবলী-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। সে যুগে আরও যাঁরা এবিষয়ে পদরচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানদাস ও শেখর অন্যতম। আচার্য কর্তৃক এই গ্রন্থ বৃন্দাবন থেকে আনীত

হওয়ার পর এবং তাঁরই প্রেরণায় এই গ্রন্থের ভাবালম্বনে এই পদসমূহ রচিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

জ্ঞানদাসের যুগের শেষের দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। জ্ঞানদাসের মতন কবি, যিনি প্রথম যুগে পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও স্বীয় প্রতিভাবলে পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তাঁকেও এই প্রভাবে প্রভাবিত হতে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদেশে বৃন্দাবনের মহাজনদের দর্শন ও রচনা প্রচারে শ্রীনিবাসাচার্য কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন। এদেশের বৈষ্ণব-জগতে সে সময়ে নিত্যানন্দের শিষ্যপ্রশিষ্যদের প্রাধান্য ছিল। জাহ্নবা দেবী ও বীরভদ্রের প্রভাব দেখে অনুমান করতে পারা যায় যে এঁরা সকলেই শ্রীনিবাসাচার্য দ্বারা প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দর্শনকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আচার্যের জীবনী আলোচনাকালে ইতিহাসের তথ্য দিয়ে আমরা এসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি, বর্তমানে পদাবলী-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে আসছি।

পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানদাসের পরবর্তী যুগকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার মতন এযুগের তিনি পনেরোজন কবির রচনাকে তাঁর গ্রন্থে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৮] এঁরা হলেন—শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীর হাম্বীর, নৃসিংহ দেব, শ্রীনিবাসপুত্র গোবিন্দগতি, গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য বল্লভদাস, বসন্তরায়, প্রথম উদ্ধবদাস, গদাধরদাসের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী, রঘুনন্দনশিষ্য রামশেখর এবং নরোত্তম। উৎকলবাসী শ্যামানন্দ বা কানাই খুঁটিয়ার পক্ষেও বাংলায় পদরচনা করা কঠিন বা অসম্ভব নয়।

শ্রীনিবাসাচার্য স্বয়ং পদকার হিসাবে পদাবলী-সাহিত্যে পরিচিত। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় তাঁর সঙ্কলিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালায় আচার্য রচিত তিনটি পদ সংগ্রহ করেছেন। এই তিনটি পদই পদকল্পতরু থেকে সংগৃহীত। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে আচার্যের রচিত পাঁচটি পদ পাওয়া যায় বলে তিনি তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনে' উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি পদের মধ্যে "বদন চান্দ কোন্ কুন্দর কুন্দিল গো" পদটি

---

[৮] ষো. শ. প. সা.—পৃ. ৯৭

ভক্তিরত্নাকর ও অনুরাগবল্লীতে পাওয়া যায়, অপর দুটি পদ আপাততঃ পদকল্পতরু ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি। চতুর্থ পদ "অনুক্ষণ কোণে থাকি" ভণিতাহীন। পদটি রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী'র ষষ্ঠ কোরকে এবং মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীর অষ্টম মঞ্জরীতে আচার্যের রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে' ও 'পদকল্পতরুতেও পদটি সঙ্কলিত হয়েছে, রচয়িতার নাম উল্লেখ না করে। পঞ্চম পদ- 'ধনি রঙ্গিন ভোর' ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সং পুথিতে আবিষ্কার করেছেন।

আচার্য রচিত "বদন চান্দ কোন কুন্দর কুন্দিল গো'[৯] পদটি বহুপ্রচারিত। এই পদটির অনেক পাঠান্তরও লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ সাহিত্যের পদাবলী-সাহিত্যে কয়েকটি গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে ডঃ মজুমদার মহাশয় এটিকে উদ্ধৃত করেছেন[১০]। রূপানুরাগের এই পদটি আচার্যের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা চলে। 'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' পদটি দ্বারা মুরারি গুপ্তকে যদি পদাবলী সাহিত্যে স্থায়ী আসন দেওয়া যায় তবে শুধুমাত্র এই পদটির জন্য আচার্য পদকার হিসাবে পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেতে পারেন।

"বদনচান্দ কোন কুন্দর কুন্দিল গো", পদটিকে আচার্যের প্রথম রচনা বলা যেতে পারে, কারণ প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে ফেরার আগেই তিনি এই পদটি রচনা করেছিলেন বলে অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

"অনুক্ষণ কোণে থাকি" পদটি আচার্যের দ্বিতীয় রচনা বলে অনুরাগবল্লীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

প্রার্থনায় পদদুটি ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর গুরু গোপালভট্টের উদ্দেশ্যে রচিত। পদরচনায় আচার্য নিজেও যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা এই পদ দুটি পাঠ করলে বোঝা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে আচার্যের পঞ্চম রচনা যেটি পাওয়া গিয়েছে সেটি সম্ভোগের। ভাষা ব্রজবুলি। পাঁচটি কলিতে সংক্ষেপে রাধা ও কৃষ্ণের সম্ভোগের অলঙ্কারবর্জিত যে সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা' একমাত্র শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীনিবাসাচার্যের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা

---

৯. ষো. শ. প. সা. পৃ.—৯৯। ১০. ঐ —পৃ. ৩৮-৯

প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে এগুলি তাঁর ভক্তশিষ্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।[১১] কিন্তু তাঁর অপর গ্রন্থ—ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে আচার্যের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এজাতীয় কোন উক্তি করেন নি। মনে হয় পরবর্তী যুগে আচার্যের রচনা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ এসে থাকবে, যদিও সে সম্বন্ধে তিনি কোন যুক্তি দেন নি। শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে যখন তাঁর রচনা সম্বন্ধে স্বীকৃতি আছে এবং একটি ভণিতাহীন পদও তাঁর রচনা বলে উদ্ধৃত করা হয়েছে তখন এবিষয়ে সন্দেহ থাকার কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন যে আচার্যের সংস্কৃত রচনাও কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাঁর ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাষ্যের টীকার কথা তৎকালীন বহু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। হরিদাস বাবাজী মহাশয় এটি প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি আচার্য রচিত ষড়গোস্বাম্যষ্টকম্ ও শ্রীমন্নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্ প্রকাশ করেছেন। কাজেই আচার্যের সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকার কারণ থাকতে পারে না।

শ্রীনিবাসাচার্যের বিরাট কবিশিষ্য-গোষ্ঠি থেকে পদাবলী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান কবা যেতে পারে। গোবিন্দদাসের মতন অপূর্ব কবিপ্রতিভাসম্পন্ন পদকার থেকে আরম্ভ করে কবিরাজ উপাধিধারী কুড়িজন সমেত প্রায় পঁয়ত্রিশজন পদকারকে শিষ্য হিসাবে পাওয়া একজন গুরুর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। এঁরা শুধু যে নিজ প্রতিভাবলেই বড় পদকার হতে পেরেছেন তা নয়—আচার্যের শিক্ষা ও পথনির্দেশও তাঁদের অনেকখানি সহায়তা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই কবিশিষ্য-গোষ্ঠির সৃষ্টি ও তাঁদের কৃতিত্বের কিছুটা অংশ আচার্যেরও প্রাপ্য। এই কবিগোষ্ঠিকে দেওয়া তাঁর শিক্ষা ও পথনির্দেশনা সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করলে তাঁর এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারা যাবে।

শ্রীনিবাসাচার্যের গৌড়ে গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থসমূহ প্রচারের পর পদাবলী-সাহিত্যে তাঁর কতখানি প্রভাব পড়েছিল তার খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে ডঃ শুকদেব সিংহ রচিত ‘শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য’ গ্রন্থখানি পাঠ করলে। এই গ্রন্থে তিনি রূপ গোস্বামীর বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকের উল্লেখ করে তার সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দী ও পরবর্তী যুগের পদকারদের পদ উদ্ধৃত করে এঁদের ওপর

---

[১১] বা. সা. ই. —পৃ. ৪৫৯

রূপ গোস্বামীর প্রভাব দেখিয়েছেন। এগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি উল্লিখিত যুগের প্রায় পঞ্চাশজন পদকারের ওপর রূপ গোস্বামীর দশটি গ্রন্থের প্রভাব প্রমাণ করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাবই বেশী। বিভিন্ন ভাব, অনুভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর রস আস্বাদন করাই হলো ভক্তের লীলাকীর্তনের উদ্দেশ্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উদাহরণ সমন্বিত বিশ্লেষণ আছে। কাজেই বিধিবদ্ধ লীলাকীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত পদসমূহে এই গ্রন্থের সর্বাধিক প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আচার্যশিষ্য গোবিন্দদাসের ওপর রূপ গোস্বামীর সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সিংহ তাঁর গ্রন্থে গোবিন্দদাসের প্রায় ষাটটি পদের উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রায় পঁচিশটিতে উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাব বর্তমান।

উজ্জ্বলনীলমণির পরই রূপ গোস্বামীর যে গ্রন্থের প্রভাব পদকারদের মধ্যে বেশী দেখা যায় সেটি হলো বিদগ্ধমাধব। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পূর্বরাগ থেকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত বিবৃত করে এই নাটকটি রচিত। সতেরোজন পদকারের ওপর এই গ্রন্থের প্রভাবকে ডঃ সিংহ তিনভাগে ভাগ করেছেন। —প্রথম শ্রেণীতে দেখা যায় এই গ্রন্থের শ্লোক অনুসরণ করে পদ প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার অনুসরণে পদ প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীতে এই গ্রন্থের কতকগুলি মৌলিক চরিত্র নিয়ে পরবর্তীকালে বহু পদ রচিত হয়েছে।

শুধু রূপ গোস্বামীর রচনাই নয়, এই যুগের পদকারদের ওপর অন্যান্য গোস্বামীদের রচনার প্রভাবও অনুরূপ গবেষণায় প্রমাণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ জীব গোস্বামী রচিত মাধবমহোৎসবের কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার অভিষেক ও তৎপরবর্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাব্য নয়টি উল্লাসে বিভক্ত। আচার্যশিষ্য মোহন রচিত তিনটি রাধার অভিষেকের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হয়েছে। শ্রীজীবের এই রচনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই মোহন এই পদগুলি রচনা করেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা অবলম্বনে পদ রচনা এযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অষ্টপ্রহরে রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ করা বৈষ্ণব সাধকদের সাধনার অঙ্গ। সেজন্য তাঁদের এই লীলাকে নিশান্ত থেকে নিশা পর্যন্ত আট প্রহরে ভাগ করে প্রতি প্রহরের লীলা অবলম্বনে যে পদ রচিত হয় তাই হলো অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ। পদ্মপুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরূপ বর্ণনা আছে।

পরবর্তীকালে কবিকর্ণপূর রচিত কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, এবং রূপ গোস্বামীর স্মরণমঙ্গল এই ভাব নিয়ে রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই ভাব অনুসরণ করে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত রচনা করেছিলেন। এসম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ আছে রূপ গোস্বামী একাদশ শ্লোকে অষ্টকালিক শ্লোকাবলী রচনা করে তারই ভিত্তিতে গোবিন্দলীলামৃত রচনা করতে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদ্মপুরাণের বিবরণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় অভিমত প্রকাশ করেছেন[১২]। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এযুগের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদসমূহ রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবদের সাধনার সুবিধার জন্য আচার্য কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই হয়তো গোবিন্দদাস কবিরাজ এই রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামী এবং অন্যান্যদের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও তাঁদের প্রচারিত দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এযুগের রচনার মধ্যে দেখা যায়। আচার্যের পূর্ববর্তী যুগের পদাবলীর মধ্যে দেখা যায় পদকার শ্রীকৃষ্ণের ও রাধিকার সখারূপে তাঁদের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পদসমূহে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। এখানে রাধাকৃষ্ণের সমপর্যায়ের সখাসখীর অনুভূতি এসব রচনায় বর্তমান। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সাধনার ধারা ভিন্ন। তাঁদের মতে সখী নিত্যসিদ্ধা এবং রাধার সমপর্যায়ের। কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই সখীদের সহবাস ঘটিয়েও থাকেন। কিন্তু সকলেই নিজেদের এই পর্যায়ের সাধক বলে দাবী করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের পরবর্তী পর্যায়ের মঞ্জরী ভাবে সাধন সিদ্ধা হবার চেষ্টা করতে হয়। এই ভাবে তাঁরা শ্রীরাধা ও তাঁর সখীদের সেবিকারূপে নিজেদের কল্পনা করেন এবং তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখেন। আচার্যশিষ্য ও এযুগের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এসব পদকারদের রচনায় এই মঞ্জরী সাধিকার অনুভূতির ভাবই প্রবল। আচার্য কর্তৃক গোস্বামীদের দর্শনের শিক্ষার ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতের সঙ্গে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় পার্ষদদের

---

[১২] ষো. শ. প. সা.—পৃ. ১৭৭

প্রধান পার্থক্য হলো গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের পূজার সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু গৌড়ীয়েরা চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে তাঁর পূজাকে সমর্থন করতেন। ফলে গৌড়ে গৌরাঙ্গের অর্চনাও ছিল। আচার্য কর্তৃক বৃন্দাবনের দর্শন এদেশে প্রচারিত হওয়ার আগেও এই ভাব প্রবল ছিল। ফলে এখানকার পদকারদের মধ্যে গৌরাঙ্গস্তব রচনার আধিক্যও দেখা যায়। কিন্তু আচার্যশিষ্যদের মধ্যে এর প্রবণতা খুবই কম। প্রবাদ আছে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণের পর গোবিন্দদাস এবিষয়ে পদরচনা আরম্ভ করেন কিন্তু আচার্যের নির্দেশে পরে আর রচনা করেন নি। এই প্রবাদ সত্য না হলেও তাঁর রচনার সংখ্যাল্পতা থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিরুৎসাহ করেছিলেন অথবা গোস্বামীদের দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হয়ে এযুগের পদকাররা এ জাতীয় রচনায় আর বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। এযুগের গৌরাঙ্গস্তবে দেখা যায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা যত, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণবেশে বা শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখার ভাব ততটা নেই।

পদাবলী-সাহিত্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করে দেখলে এতে ২টি সুস্পষ্ট ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে নবদ্বীপে তাঁর পরিকরবৃন্দ কর্তৃক রচিত পদাবলী সাহিত্য। এই পর্যায়ের পদাবলীর বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী পরবর্তী পর্যায়ের পদাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে কৃষ্ণলীলার চেয়ে গৌরাঙ্গলীলার প্রাধান্য বেশী। নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দের ওপর চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ প্রভাব ও গৌরপারম্যবাদ মতের প্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল।

চৈতন্যযুগের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় যে এসময়ে রচিত পদে প্রাণের আবেগ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সহজ সরল ভাষায় পদকাররা তাঁদের প্রাণের আবেগ এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা এযুগেরও পাঠকের হৃদয় সহজে স্পর্শ করে। উদাহরণস্বরূপ মুরারি গুপ্তের "ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরাঙ্গ ধর" (প.ক ত. ২১৩৫), গোবিন্দ ঘোষের "হেদেরে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও" (প.ক.ত. ১৬২২), মাধব ঘোষের "গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া" (প.ক.ত. ২২৮৮) প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পদটিতে কীর্তনের সময়ে চৈতন্যদেবকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে দেখে শচী দেবীর আকুলতা স্বল্পকথায় এত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর রচনাতেই পাওয়া সম্ভব। অপর দুটি পদে পাই

মহাপ্রভুর নদীয়া ছেড়ে যাওয়ার বিরহবেদনার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। বলা বাহুল্য এসব রচনায় ভাষার কৃত্রিমতা নেই, আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা নেই কিংবা রসশাস্ত্রের প্রভাবও দেখা যায় না। শুধু গৌরাঙ্গলীলাই নয়, বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে তাঁরা যেসব পদ রচনা করেছেন সেক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ মুরারি গুপ্তের "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও" (প.ক.ত. ৭৫১), মাধব ঘোষের "নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন" (প.ক ত. ৬৬০), রামানন্দ বসুর "তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" (প ক.ত. ১৪৫), বংশীবদনের 'আলো সই কি হৈল মোরে প্রেমজ্বালা" (প ক.ত. ১২১) প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র উল্লিখিত পদগুলিই নয়, এই সব পদকারের সমস্ত পদেই কবির সহজ প্রাণের আবেগকে সরল ভাষায় প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাবধারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কয়েকজন পদকার, বিশেষতঃ আলোচ্য যুগের নবদ্বীপের মহাজনদের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নরহরিশিষ্য লোচন দাস, নিত্যানন্দশিষ্য বৃন্দাবনদাস প্রমুখ পদকারদের রচনার কথা বলা যেতে পারে।

পূর্বোক্ত দুটি ধারার দ্বিতীয়টির আরম্ভ হলো শ্রীনিবাসাচার্যের যুগ থেকে। বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি এনে এদেশে তিনি প্রচার করার পর হতে পূর্বোক্ত ধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারা পদাবলী-সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। এযুগের পদাবলীর বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এসময় থেকে গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে রচিত পদের চেয়ে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যা অনেক বেশী। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনার প্রভাবে মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অবলম্বন করে এযুগে পদরচনা আরম্ভ হওয়ায় রচনার বিষয়ের বৈচিত্র্যও পূর্বযুগ থেকে অনেক বেশী। রচনাশৈলীর দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায় এযুগের রচনায় ভাষার কৃত্রিমতা ও অলঙ্কারপ্রাচুর্যে রচনার মধ্যে পূর্বযুগের স্বতস্ফূর্ততার পরিবর্তে কৃত্রিম ভাব বেশী। উভয় যুগের গৌরাঙ্গলীলা ও কৃষ্ণলীলার পদের তুলনা করে এই পার্থক্য দেখা যেতে পারে।

গৌরাঙ্গলীলার পদ বিচারের জন্য চৈতন্যদেবের পরিকর গোবিন্দ ঘোষের ও পরবর্তী যুগের আচার্যশিষ্য গোবিন্দদাসের একই প্রসঙ্গের দুটি পদের তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে। গৌরাঙ্গের অভিষেক উপলক্ষ্যে গোবিন্দ ঘোষের "স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যাসনে" (গৌ.প.ত.

পৃ. ১৫০) রচনায় অলঙ্কারবর্জিত ভাষার সরলতা লক্ষ্য করার বিষয়। বর্ণনায়ও যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। পদকারের একান্ত প্রিয়জনের একটি সুখস্মৃতি স্মরণের তৃপ্তি পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। সে তুলনায় একই বিষয়ে রচিত গোবিন্দ দাসের "আজ শচীনন্দন-নব-অভিষেক" (গৌ.প.ত. পৃ. ১৪৯) ভাষা ও বর্ণনার দিক থেকে অনেক কৃত্রিম। কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় রামানন্দ বসুর "তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" (প.ক ত ১৪৫) পদটির সঙ্গে এই প্রসঙ্গেরই গোবিন্দদাসের "সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি" (প.ক.ত. ১৩৯) পদটির ভাষা, বর্ণনা ও অলঙ্কারেব তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রথমটিতে সহজ সরল ভাষায় পদকার যে আবেগ ফুটিয়ে তুলেছেন কৃত্রিম ভাষা ও অলঙ্কারের ফলে সেটি দ্বিতীয় পদে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। এছাড়াও এই পদটিতে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত বিদগ্ধমাধবের প্রত্যক্ষ প্রভাবও বর্তমান।

শুধুমাত্র ভাষা ও অলঙ্কারের দিক থেকেই নয় তত্ত্বগতভাবে বিচার করলেও দেখা যায় রাগানুরাগ, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্য ও মঞ্জরীভাবের সাধনার ধারা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন আচার্যের শিক্ষা ও প্রেরণায় সে ধারা তাঁর যুগের পদাবলী রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া ছিল গোস্বামীদের রচনাবলী। তাঁদের প্রণীত তত্ত্ব ছাড়াও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত এযুগের পদাবলী একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল যা পূর্ববর্তী রচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র আচার্যের শিষ্যদের রচনাতেই নয়, গৌড়বাংলার তৎকালীন অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোষ্ঠী, যেমন নিত্যানন্দ, গদাধর, নরহরি প্রমুখ মহাজনদের শিষ্যদেরও প্রভাবান্বিত করেছিল। গোস্বামীদের রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে আচার্যের শিষ্যদের ও সমসাময়িক পদকারদের ওপর এসবের প্রভাব বিচার করে দেখা যেতে পারে।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গৌড়বাংলা এবং বৃন্দাবনে তাঁর পরিকরবৃন্দ কৃষ্ণলীলা প্রচার করলেও এঁদের মধ্যে তত্ত্বের দিক থেকে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দ মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে তাঁদের সাধনার ধারা স্থির করেছিলেন[৭]। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি নবদ্বীপলীলায় চৈতন্যদেবের ছিল কৃষ্ণভাব। কাজেই তাঁর নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ তাঁকে কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ বলে গণ্য করতেন। তাঁদের এই মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ

পেয়েছে প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃতের ৫৮তম শ্লোকে। এই শ্লোকে তিনি বলছেন "যদি কোন মুরারিভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ সাধন-ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম সাধন করেন তবে মঙ্গল বটে। তিনি তা সাধন করুন ; কিন্তু আমার পক্ষে অপার প্রেমসুধাসিন্ধু স্বরূপ শ্রীগৌরহরির ভক্তিরসে যে অতিরহস্য প্রেমবস্তু আছে তাই আদরের সঙ্গে ভজনীয়।" নবদ্বীপের মহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর নরহরি ও তাঁর শিষ্য লোচনের রচনায় দেখা যায় তাঁরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গৌরনাগরবাদে বিশ্বাসী। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুকে ভাগবতের অন্যতম অবতার—অর্থাৎ হরির অংশ বলে স্বীকার করতেন। কবিকর্ণপূরের মতে মহাপ্রভু ছিলেন 'দ্বিভুজবিষ্ণু।" বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন। গৌরনাগরবাদকে স্বীকার না করলেও রাগানুগা মতানুসারে তিনি মহাপ্রভুর রাধাভাবের বণনা দিয়েছেন।

মহাপ্রভুর রাধাভাবের প্রাধান্য দেখা যায় নীলাচল লীলায়। নীলাচলে মহাপ্রভুর এই ভাব লক্ষ্য করেই স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় এক নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন। মহাপ্রভুকে নমস্কার করে তিনি বলছেন— "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হলাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্ ॥" (রাধা স্বরূপত কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন চৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি।) এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের আরম্ভের এই শ্লোকটিতে—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্‌জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥" (চির অনর্পিত সেই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে রসাল নিজস্ব প্রেমসম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য করুণাবশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণপুঞ্জের মত উজ্জ্বল দেহকান্তিবিশিষ্ট সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্বদা দীপ্তি পেতে থাকুন।)

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে স্বীকার করলেও

তাঁদের রচনায় তাঁকে কখনই উল্লেখ করে প্রাধান্য দেন নি, বরং তাঁর মধ্যে প্রেমের যে স্ফুরণ তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন তা অবলম্বন করে বৃন্দাবনের মধুর লীলাকে বিশ্লেষণ করে সেই মাধুর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। এর জন্য তাঁরা প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই ভাগবত অবলম্বনে সনাতনের রচিত বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থের পূর্বভাগে মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং শেষভাগে গোবর্ধনধারণ, কালীয়দমন ও রাস সমেত বৃন্দাবনের নিত্যলীলার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সনাতনের এই বক্তব্যকে শ্রীরূপ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে প্রাচীন অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে শ্রীরূপের অবদান অতুলনীয়। রসতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং মঞ্জরীভাবের সাধনায় পথ নির্দেশনায় তাঁকে অগ্রদূত বলা যেতে পারে। এছাড়া কৃষ্ণলীলার নব নব পাত্রপাত্রী সৃষ্টি ও বৃন্দাবনলীলার সামাজিক পটভূমিকা নির্দেশনাও তাঁরই অবদান বলা যেতে পারে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থদ্বয় হলো শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভগবৎতত্ত্বচিন্তা ও রস পরিকল্পনা বিধিবদ্ধভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচিত হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শৃঙ্গার রসকে অবলম্বন করে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থখানি রচিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ পরমব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে অখিল রসামৃতমূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রস শব্দের দুটি অর্থ—আস্বাদ্যবস্তু ও আস্বাদক। তিনি দুভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীরূপ দেখিয়েছেন যে শ্রবণ কীর্তন দ্বারা ভক্তদের মনে কৃষ্ণরতি ও ভক্তিভাবের উদয় হয়। এই ভক্তিভাব বা কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাব-এর সহায়তায়। ভক্তের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী এই কৃষ্ণরতি আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করে। এই পাঁচটি স্থায়ীভাব আবার তাদের অনুকূল বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সহায়তায় পাঁচটি রসে পরিণত হয়। ভক্ত এইসব রসের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি করতে পারেন বলে তিনি রসস্বরূপ।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণকে রসিকবররূপে প্রমাণ করেছেন।

গ্রন্থের আরম্ভে নায়ক ভেদে প্রকরণ দেখিয়েছেন যে উজ্জ্বল বা মধুর রসের বিষয়ালম্বন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রকারভেদে নায়ক ছিয়ানব্বই প্রকারের। শ্রীরূপ দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ শুধু নায়কশ্রেষ্ঠই নন—ব্রজলীলায় তাঁর এই ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কের সকল গুণই বিদ্যমান। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপ শ্রীরাধাকে নায়িকা নির্দিষ্ট করে শ্রীরূপ তাঁর বহুবিধ ভেদ এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনদের মতে কৃষ্ণভজনার মূলে ভক্তি। এই ভক্তিকে তিনভাগে ভাগ করা চলে—সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম ভক্তি। শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা সাধনীয় ভক্তির নাম সাধনভক্তি। সাধনভক্তির আবার দুটি ভাগ আছে—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রশাসন দ্বারা অনুরাগহীন যে ভক্তি তাকে বৈধী ভক্তি বলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে
গায়॥" [১৩]

এই ভক্তির নিয়ত অনুশীলন ও সাধুসঙ্গে ভজনায় যে অনুরাগ জন্মায় তাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। এর লক্ষণ—

"ইষ্টে গাঢ তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার
প্রকৃতি॥" [১৪]

বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ কীর্তন ও মনে রাত্রিদিন ব্রজের কৃষ্ণের সেবা করে "কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি।" আবার এই "প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম। যাহা হৈতে বশ হন ভগবান।' রাগানুগা ভক্তির নিয়ত অনুশীলনে প্রথমে ভাব ভক্তি ও পরে প্রেম ভক্তির উন্মেষ ঘটে। সেজন্য বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমহাজনদের নির্দেশিত এই রাগানুগা ভজন পদ্ধতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকদের আদর্শ এবং এজন্যই পদাবলী সাহিত্যেও রাগানুগা ভজন পদ্ধতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আচার্যের পূর্ববর্তী যুগে বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে যে সব পদরচনা হয়েছিল তার সঙ্গে আচার্যের যুগের পদাবলীর অন্যতম পার্থক্য হল এখানে। এই ভজন-পদ্ধতির প্রভাব দেখতে পাওয়া

---

[১৩] চৈ. চ. ২।২২

[১৪]. ঐ

যায় পরবর্তী পদকারদের পদের ভণিতাসমূহে। পূর্ববর্তী যুগের পদকারদের রচনায় এই প্রভাব নেই। উদাহরণস্বরূপ পূর্ববর্তী যুগের মাধব ঘোষ রচিত শ্রীরাধার দশা বর্ণনার পদের ভণিতার সঙ্গে পরবর্তী যুগের গোবিন্দদাসের পদের ভণিতার তুলনা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমোক্ত পদকারের ভণিতায় আছে—

এতদিনে নবমি দশা পরিপূরল
শ্বাস বহে উধমন্দ।
মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব
বুলি ও ব্যাধিক অন্ত॥ (প. ক. ত. ১৯২৮)

কিন্তু গোবিন্দদাসের ভণিতায়—

ভাগ্যে জিবয়ে অব তুয়া রস-আসে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দ দাসে॥ (প. ক. ত. ১৯২২)

প্রথম ভণিতায় দেখা যাচ্ছে পদকার সাধারণ মন্তব্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু শেষোক্ত ভণিতায় পদকারের ভক্তি ও ভক্তের ভগবৎ কীর্তনের আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আচার্য শিষ্যের ক্ষেত্রেই নয়—তৎকালীন অন্যান্য পদকাররাও যে এই ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় যদুনন্দন, উদ্ধবদাস, বসন্ত রায় আদি পদকারদের ভনিতায়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটী পদে রাধানাম শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আকুতি বর্ণনাশেষে যদুনন্দন লিখছেন "আঁখিতে দেখিতে করে সাধ এ যদুনন্দন মন কান্দ" (প. ক ত ৭৭)। আবার শ্রীরাধার পূর্বরাগের বর্ণনাশেষে তাঁর মন্তব্য—"কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ। শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥" (প ক ত ১৮৫)। ঝুলনযাত্রার বর্ণনার শেষে উদ্ধবদাসের কামনা—"উদ্ধবদাস চিত মন আশ দুহুঁক বিলাস দরশন কাননে" (প. ক. ত. ১৫৬৫) আবার হোরী লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর ইচ্ছা—"গোবিন্দগুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধবদাস হোরি রস তরঙ্গিয়া" (প.ক.ত. ১৪৩৮)। নরোত্তম-শিষ্য বসন্ত রায়ের পদের ভণিতায়ও দেখা যায় "রায় বসন্ত মন সেবই অনুখন ঐছন চরণ কমল মধু আশে।" (প. ক. ত. ২৪৪৬) আবার 'দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর। রায় বসন্ত তহিঁ জয় জয় বোল।" (প. ক. ত ২৯২৪)। এখানে উদ্ধৃত প্রতিটি ভণিতায় পদকারের অন্তরের ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এযুগের অনেকের ভণিতায় এই প্রভাব দেখা গেলেও সকলের রচনায় এই ভক্তিভাব প্রকাশ পায় নি। জ্ঞানদাস ও রায় শেখরের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত পদের ভণিতায় এজাতীয় উচ্ছ্বাসের অভাব থাকলেও গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনায় তাঁদের ও পূর্ববর্তী সকল পদকারের ভণিতায় যে আনুগত্য ও ভক্তির ভাব দেখা যায় তাকে স্বতস্ফূর্ত বলাই সঙ্গত।

সাধারণ ভাবে উক্তির উপরোক্ত প্রকাশ ছাড়াও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রভাবে ভক্তিরসের অন্যান্য প্রভাব আচার্যের যুগের পদকারদের ওপর বর্তমান। তবে এই গ্রন্থে বর্ণিত পাঁচটি রসের মধ্যে বৃন্দাবন লীলায় শান্ত ও দাস্য রসের স্থান নেই। বৃন্দাবনের তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে মমতাযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের দাসগণ নিজেদের নন্দের ভৃত্য বলে জানেন বলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের সখা সম্বন্ধ। কাজেই এই দুটি রস বৃন্দাবন লীলা বর্ণনায় বাদ দেওয়া আছে। ফলে বৈষ্ণবপদকারেরাও এই দুটি রস নিয়ে কোনও পদ রচনা করেন নি। বাকী তিনটি অর্থাৎ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদেরই পদাবলীতে সংখ্যাধিক্য বেশী, তার মধ্যেও মধুর রসের পদের সংখ্যা অন্যান্য রসের তুলনায় অনেক বেশী।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সখাদের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের পূর্ববর্তী পর্যায়ের পদকারদের পদেও এই ব্রজসখাদের বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। নিত্যানন্দের প্রভাবই এর কারণ বলা যেতে পারে। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দকে বলরামরূপে বন্দনা করেছেন। নিত্যানন্দের ছিল সখ্যভাব। তাঁর দ্বাদশ সঙ্গী দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত। কাজেই তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যভাবের প্রাবল্য বেশী। এজন্যই তাঁর অন্যতম শিষ্য বলরামের রচনায় সখ্য ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। বলরাম দাস ছাড়াও পূর্ববর্তী পদকারদের মধ্যে বাসু ঘোষ ও বংশী, এবং আচার্য-সমসাময়িক অন্যান্য পদকারদের মধ্যে জ্ঞানদাসের সখ্যভাবের পদও কিছু পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের মহান্তদের প্রভাব সম্পন্ন কবিদেরও পূর্ববর্তী রচয়িতাদের সখ্যরসের পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। আচার্য ও তৎপরবর্তী যুগের পদকারেরা নিঃসন্দেহে বৃন্দাবনের মহাজনদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এঁদের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শ্রীরূপ সখাদের শ্রেণীভাগ করে তাঁদের সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয় নর্মসখা—এই চার ভাগে ভাগ করেছেন।

এঁদের মধ্যে সুহৃৎদের সখ্য বাৎসল্যরসমিশ্রিত, তাঁরা বয়সে বড়, অস্ত্রধারী এবং শ্রীকৃষ্ণের রক্ষক। এঁদের মধ্যে বলভদ্র বা বলরাম প্রধান। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং তাঁদের আচরণে দাস্যরস বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সেবা তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের যে সব সখা বয়সে তাঁর সমান এবং সখ্যকেই যাঁরা একমাত্র অবলম্বন করেছেন তাঁরা প্রিয়সখা। এঁদের কাজ হলো ক্রীড়াকৌতুকে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করা। প্রিয়নর্মসখাবৃন্দ অপর তিন সখাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা বিশেষ ভাবশালী এবং রহস্যপরায়ণ।

সখ্যরস প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে শ্রীরূপ তিনভাগে ভাগ করেছেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। পৌগণ্ডের মধ্যে আবার আদি পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বনমধ্যে গোচারণ, বাহুযুদ্ধরূপ খেলা ও নৃত্যশিক্ষা, মধ্যপৌগণ্ডে ভাণ্ডীরবনে খেলা ও পর্বতোত্তলন এবং অন্ত্যাপৌগণ্ডে প্রিয় নর্মসখাদের সঙ্গে রহস্যালাপ এবং গোকুলবালিকাদের শোভার প্রশংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। শেষোক্ত প্রশংসার মধ্যে মধুররসের সংমিশ্রণের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

পদাবলীর পদবিশ্লেষণে দেখা যায় যে সখ্যরসের পদের মধ্যে গোষ্ঠবিহারই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে গোষ্ঠাস্টমী যাত্রার পদ রচয়িতা চৈতন্যদাসের পদ বিচারে তাঁকে নিঃসন্দেহে বৃন্দাবনের মহান্তদের প্রভাবসম্পন্ন পরবর্তী যুগের পদকার বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে কারণ পদকল্পতরুর এই পর্যায়ের তিনটি পদের ভণিতাতেই তাঁর ভক্তিভাব ফুটে উঠেছে। এই ভাব পরবর্তী কালের অন্যান্য পদকার ঘনরাম দাস, যাদবেন্দ্র, নবচন্দ্র দাস প্রভৃতি পদকারের রচনায়ও দেখা যায়। এঁদের তুলনায় বংশীদাস, বলরাম আদি পদকারের পদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বংশীদাসের "বলরাম তুমি নাকি আমার প্রাণ লৈয়া বনে যাইছ" (প. ক. ত. ১১৭৭), "ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে" (প. ক. ত. ১১৯৪) প্রভৃতি পদে এবঃ বলরামের "যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া" (প. ক. ত. ১২০৬), "পালজড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়" (প. ক. ত. ১২০৭) "চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া" (প. ক. ত. ১২০৮) প্রভৃতিকে সাধারণভাবে বর্ণনামূলক পদ বলা চলে। ভণিতাতেও পরবর্তীকালের বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা নেই, আছে সাধারণ মন্তব্য। জ্ঞানদাসের রচনা "সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া" (প. ক. ত. ১১৯০), "বাঁকুয়া

পাঁচনী হাতে রাঙ্গিয়া রাখল সাথে” প্রভৃতি পদেও অনুরূপ ভক্তিভাবের অভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলরাম দাস ভণিতায় “শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম” পদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই পদের ভণিতায় দেখা যাচ্ছে—

‘বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়।” (প. ক. ত. ১২১৮)

এই ভণিতায় পদকর্তার একাত্মতার যে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে সন্দেহ হয় ইনি পরবর্তীকালের বলরাম দাস।

এপর্যন্ত যতগুলি পদ বিচার করা গেল তাতে বৃন্দাবন-গোস্বামীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুপস্থিত। কিন্তু এই প্রভাব সুস্পষ্টভাবে গোবিন্দ দাসের পদসমূহে বর্তমান। ভণিতায় যেমন, তেমনি পদের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যেমন “গো-খুর-ধূ-লি উছলি ভরু অম্বর” (প. ক. ত. ১৩১৮)। “সুন্দর শ্যামর অঙ্গ” (গো. দা. প. ১৫৪), “সন্ধ্যাসময় গৃহে আওল যদুপতি” (গো. দা. প. ১৫৫) প্রভৃতি পদে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া আছে গোষ্ঠলীলার পদে মধুর রসের সংমিশ্রণ। “গৌরী আরাধন ছলে চলু কাননে” (গো. দা.প.১৫১) “কালিয় অঞ্জন কান কুটীল হাস” (গো. দা.প ১৫২) পদ দুটিতে মধুর রসের প্রাধান্য দেখা যায়। পদকল্পতরুতে ধৃত অজ্ঞাত পদকারের রচনা “হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে চন্দন রাগ” পদটিতে অনুরূপভাবে মধুররসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এছাড়া গোবিন্দদাসের ও অন্যান্যের পদের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো কৃষ্ণের বর্ণনায় রাজসিক বেশ। এটি নিঃসন্দেহে রূপগোস্বামীর প্রভাব এবং পূর্ববর্তী রচনায় এটির অভাব লক্ষ্যণীয়। গোবিন্দদাসের “গোঠে বিজই ব্রজরাজকিশোর” (গো. দা. প. ১৫০), “সুন্দর শ্যামর অঙ্গ” (গো. দা. প.) ১৫৪) প্রভৃতি পদে, চৈতন্যদাসের “নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ” (প ক.ত. ১১৭০), “ডাকিয়া তখন নিজ প্রজাগণ (প.ক.ত. ১১৭১). “তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই” (প.ক.ত. ১১৭২) প্রভৃতি পদের বর্ণনায় রাজসিকতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বংশীদাস প্রমুখ পদকারের রচনায় এই রাজসিকতার কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।

বাৎসল্যরসকে শ্রীরূপ ভক্তিবৎসল রস বলে অভিহিত করেছেন। এই রসের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন বিভাবাদির দ্বারা পুষ্ট হলে বাৎসল্য রস বাৎসল্য ভক্তি রসে পরিণত হয়। এই রসের আলম্বন হিসেবে তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের নির্দিষ্ট করেছেন। এঁদের মধ্যেও যশোদা এবং নন্দ প্রধান। এপর্যন্ত শ্রীরূপের বিশ্লেষণে কোন মৌলিকত্ব পাওয়া যায় না কারণ ভাগবতেও এই বর্ণনা আছে। তবে মথুরাপ্রবাসী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যশোদার চিন্তা, বিষাদ প্রভৃতি বিশ্লেষণ তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল। এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় পুরুষোত্তম দাসের পদ, “রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতি” (প. ক. ত. ১৭৫৫), “গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরি” (প ক. ত. ১৭৫৬) এবং “সেবই জনক ব্রজরাজ' (প. ক. ত. ১৭৫৭) পদগুলিতে। ডঃ সুকুমার সেন এই পদকর্তাকে নিত্যানন্দশিষ্য পুরুষোত্তম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[১৫] নিত্যানন্দশিষ্য পুরুষোত্তম আচার্যের সমসাময়িক ব্যক্তি বলে মনে হয় না। খেতরীর উৎসবে যে পুরুষ্যোত্তম উপস্থিত ছিলেন তাঁকে জাহ্নবা দেবীর সঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি, কাজেই ইনি নিত্যানন্দ-শিষ্য নন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। তাছাড়াও এই পদ সমূহের ভণিতায় বৃন্দাবন নির্দেশিত বৈষ্ণবজনোচিত দীনতাও বর্তমান। কাজেই সন্দেহ হয় ইনি নরোত্তমশিষ্য পুরুষোত্তম হতে পারেন।

বংশীদাসের বাৎসল্যরসের কয়েকটী পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে “ধাতু প্রবালদল নবগুঞ্জাফল” (প. ক. ত. ১১৫৪), “হের দেখ বাছার রুচির করতল আঁখি” (প. ক. ত. ১১৫৫), “ভাল নাচে রে নাচে রে নন্দদুলাল” (প. ক. ত. ১২৫৬) পদগুলির রচয়িতাকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য-পরিকর বংশীদাসের বলে অভিহিত করেছেন[১৬]। কিন্তু পদবিচারে এই পদগুলিকেও চৈতন্যপরিকরের রচনা বলে স্বীকার করা যায় না। ভাষা ও বর্ণনায় রাজসিকতা ও ভক্তিভাব এবং ভণিতায় ভক্তের দীনতা—এসব বৈশিষ্ট্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। অপরপক্ষে চৈতন্যপরিকর বংশীদাসের রচনায় সে যুগের বৈশিষ্ট্য—অলঙ্কারবর্জিত সহজ সরল ভাষা, আবেগের স্বতস্ফূর্ততা প্রভৃতি গুণগুলি বর্তমান। এই দুই রচনার তুলনায় মনে হয় বাৎসল্য লীলার এই পদগুলো আচার্যশিষ্য বংশীদাসের হওয়া সম্ভব।

---

[১৫] H. B. L. পৃ ৫৯-৬১।

[১৬] ষো.শ.প. সা. পৃ. ৩৮-৩৯

মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা আছে শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মহাভাবরূপ স্থায়িভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ দেখিয়েছেন যে এই স্থায়ী ভাব ক্রমশঃ রস হয়ে, শৃঙ্গার, মধুর বা উজ্জ্বল রসে পরিণত হয়। এই শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে শ্রীরূপের পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকরাও বহু আলোচনা করেছেন। তাঁদের এই বিশ্লেষণ প্রাকৃতজনগণের পক্ষে প্রযোজ্য। এই শৃঙ্গাররস অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলায় আরোপ করে ভক্তিরসে রূপান্তরিত করানোর কৃতিত্ব শ্রীরূপের।

পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকের অনুসরণে শ্রীরূপও শৃঙ্গার রসকে দুভাগে ভাগ করেছেন, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। এই বিপ্রলম্ভ আবার চারভাগে বিভক্ত—পূর্ব-রাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগ জন্মাতে পারে তিন ভাবে—সাক্ষাৎ দর্শনে, চিত্রপটের সাহায্যে অথবা স্বপ্নদর্শনে। এছাড়া শ্রবণজনিত পূর্বরাগও আছে। শ্রবণজ পূর্বরাগ আবার চারভাগে বিভক্ত—ভাটমুখে বন্দনাগানে, দূতীমুখে, সখীমুখে এবং গীতাদি শ্রবণে।

পূর্বরাগ তিন শ্রেণীর—প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ। সমর্থা রতিতে জাত পূর্বরাগকে প্রৌঢ় বলে। এই প্রৌঢ়ের লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা। এই শ্রেণী বিভাগে শ্রীরূপের কোনও মৌলিকত্ব দেখা যায় না, কারণ এপর্যন্ত তিনি পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকদের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন।

শ্রীরূপের মৌলিকত্ব দেখা যায় বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় বিভাগ—মানের শ্রেণীবিভাগ। মানকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন—সহেতু ও নির্হেতু। সহেতু মান আবার তিন প্রকারের—শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট। শ্রুত মান দু-প্রকারের—প্রিয়সখীর এবং শুকাদির মুখ থেকে শ্রবণ এবং তজ্জনিত মান। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন ও স্বপ্ন—এই তিন অনুমানেও মান হওয়া সম্ভব।

এপর্যন্ত যত প্রকার শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হলো তার প্রায় সব শ্রেণীকে অবলম্বনে করে পদ পাওয়া যায়। কিন্তু সহেতু মানের তৃতীয় কারণ দর্শনকে অবলম্বনে বিশেষ কোনও পদ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষে অন্য বিলাস বর্ণনায় ভক্তিরস ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনার জন্যই বোধ হয় পদকর্তারা এই শ্রেণীকে এড়িয়ে গিয়েছেন। নির্হেতু মানের বেলায়ও দেখা যায় পদকাররা শ্রীরূপকে প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করেন নি। তবে কারণাভাসে নির্হেতু মান অনেকেই বর্ণনা করেছেন।

শ্রীরাধার নির্হেতু মানের পর মানোপশম-প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লিখেছেন যে নির্হেতু মান স্বয়ং উপশান্ত হয়, নায়কের নায়িকাকে আলিঙ্গন, চুম্বন এবং নায়িকার মৃদুহাসি ও অশ্রুপাতে এই মানের স্থায়িত্ব। এই নির্হেতু মানের পর শ্রীরূপ রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মিলন বিবৃত করেছেন। পদাবলী সাহিত্যে এই মিলনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

সহেতু মানের উপশমের প্রথম উপায় সাম। প্রিয় বাক্যের দ্বারা মানের উপসমকে সাম বলা হয়। মান উপশমেব দ্বিতীয় উপায়—সখীগণ কর্তৃক উপালম্ভ প্ররোগ। সহেতু মান উপশমের তৃতীয় উপায় হলো ছলভরে ভূষণাদি প্রদান—যাকে দান বলা হয়। মান উপশমের পরবর্তী উপায় হল দৈন্য স্বীকার করে চরণদ্বয়ে নতি স্বীকার। মান উপশমের সর্বশেষ উপায় হলো আকস্মিক ভয় প্রভৃতি সমাবেশে রসান্তর। এই রসান্তর আবার যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বক—এই দুইভাগে বিভক্ত। মান উপশমের অন্যান্য উপায় হলো দেশ বা পরিবেশ, কাল এবং মুরলীধ্বনি।

বিপ্রলম্ভের তৃতীয় বিভাগ প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রিয়জন কাছে থাকলেও অহেতুক বিচ্ছেদভয় থেকে যে আর্তি প্রকাশ পায় তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। বিপ্রলম্ভের চতুর্থ বিভাগ প্রবাস। মিলনের পরবর্তী কালে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দেশান্তরাদির জন্য যে ব্যবধান হয় তাকে প্রবাস বলা হয়েছে। শ্রীরূপের মতে এই প্রবাস দ্বিবিধ—বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্যানুরোধে দূরে গমনের ফলে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস হয়। এই প্রবাস আবার দুভাগে বিভক্ত—কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর। সুদূর প্রবাস আবার তিনভাগে বিভক্ত—ভাবী, ভবন ও ভূত প্রবাস। পূর্বরাগের মত প্রবাস-বিপ্রলম্ভেও দশ দশা হয়। পূর্বরাগের দশ দশার চেয়ে প্রবাস-বিপ্রলম্ভের দশ দশা অনেক তীব্র।

বিপ্রলম্ভের আলোচনার পর শ্রীরূপ সম্ভোগের বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন দিক দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এই সম্ভোগকে মুখ্য ও গৌণ—এই দুভাগে ভাগ করা যায়। জাগ্রদাবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর। এ গুলোও আবার সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান—এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

শ্রীরূপের রসশাস্ত্রের এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগে পদাবলী সাহিত্যের বিকাশলাভ ঘটেছিল। রূপ গোস্বামী নির্দেশিত মধুর রসের প্রতিটি ধাপ অবলম্বন করে পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণের মিলন

বিরহের ভাব নিয়ে বৃন্দাবনলীলার কীর্তনে পদাবলী-সাহিত্য ভাবে ভাষায় রসে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। তার তুলনা পাওয়া কঠিন। চিরকালের মানবমনের মধুর ভাব এই রসশাস্ত্র ও দর্শনের সংস্পর্শে এসে যে অলৌকিকত্ব লাভ করেছে তার মাধুর্য আজও অম্লান এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও এরকমই অম্লান থাকবে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রচনার উৎকর্ষের কারণ হিসাবে বৃন্দাবনের এই দর্শন ও রসশাস্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনের দর্শন ও রসশাস্ত্র প্রচারের পূর্ব ও পরের যুগের কাব্যের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে পৃথক করা কঠিন। কারণ পূর্ববর্তী যুগের রচনার মধ্যেও পূর্বরাগ, মান, বিরহ প্রভৃতি নিয়ে রচিত পদ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো যে বৃন্দাবনের রসশাস্ত্র প্রচারের পর রচিত হয়েছে তা নয়। তৎসত্ত্বেও এসব ভাব নিয়ে কাব্য রচিত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে প্রথমতঃ রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণ শ্রীরূপের রচনার বহু পূর্বেই আমাদের দেশে আলঙ্কারিকরা করেছেন বস্তুতঃ শ্রীরূপের বিশ্লেষণ এঁদের রচনার ওপর ভিত্তি করেই করা। দ্বিতীয়তঃ আলঙ্কারিকরা যে রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করেছেন তা মানব হৃদয়ের চিরকালের অনুভূতি। তাঁরা সেগুলোকেই নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন মাত্র। কাজেই কোন কবি যদি তাঁর হৃদয়ানুভূতি থেকে কোনও পদ রচনা করে থাকেন তা তিনি সজ্ঞানে রসশাস্ত্র বিচার করে করেছেন একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। এই বক্তব্য অবশ্য পূর্ববর্তী কবিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরবর্তী কবিরা যে যত্ন নিয়ে গোস্বামীদের দর্শন ও রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং এসব গ্রন্থদ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার প্রমাণ এসব যুগে রচিত প্রায় প্রতি পদেই পাওয়া যায়।

ভাবের দিক থেকে পার্থক্য না থাকলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচার করলে এই দুই যুগের মধুর রসের পদের পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের পদসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষা ও বর্ণনা-রীতি পরবর্তী যুগ থেকে ভিন্ন। গৌরাঙ্গ-পদাবলীর মতন পূর্ববর্তী যুগের কৃষ্ণলীলার রচনাতে ভাষার সরলতা লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাও মোটামুটি অলঙ্কারবর্জিত। লৌকিক মধুর রসের ছায়াও পূর্ববর্তী রচনায় দৃষ্ট হয় যেটা পরবর্তী রচনায় নেই বলা চলে। এযুগের পদের নায়কনায়িকারা যেন আমাদের পরিচিত মানবমানবী, আমাদের অতি কাছের লোক। কিন্তু পরবর্তী-যুগের নায়কনায়িকারা আমাদের অনুভূতির আধার হলেও তাঁরা যেন

রাজ্যের অধিবাসী। তাঁদের আচরণ ও বেশভূষা বর্ণনায় পদকাররা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তাকে লৌকিক বলার চেয়ে অলৌকিক বলাই বোধহয় সঙ্গত। পূর্ববর্তী রচনার নায়কনায়িকারা আমাদের মনে যে সহানুভূতির সৃষ্টি করে পরবর্তী রচনায় তার তীব্রতা হয়তো অতটা নয়। এখানে মানবিক বেদনা, সহানুভূতির চেয়েও যে অনুভূতি আসে তাকে অতীন্দ্রিয় বলে বর্ণনা করলে বোধহয় অন্যায় হয় না। এই অলৌকিকত্ব যেখানে কবি-মনের স্পর্শ বা সহানুভূতি দিয়ে রচিত হয় নি সেখানে রচনা খানিকটা কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই দুই যুগের কয়েকটি পদ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমে মুরারি গুপ্তের রচিত “সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও” (প.ক.ত. ৭৫১)—অনুরাগের এই পদটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পদটির ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে এমন একটি সরলতা আছে যা সহজেই পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অলঙ্কারের প্রয়োগও অতি সামান্য। কিন্তু পদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। রাধার মনোবেদনা এখানে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা যে কোনও প্রেমিকার অনুরাগের তীব্রতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। পদটির ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে এমন একটি সরলতা আছে যা সহজেই পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অলঙ্কারের প্রয়োগও অতি সামান্য। কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। রাধার মনোবেদনা এখানে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা যে কোন প্রেমিকার অনুরাগের তীব্রতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এসঙ্গে গোবিন্দদাসের অনুরাগের পদ “কাঁহা কুমুদিনি কাঁহা উয়ল হিমকর।” (গো. দা. প. ২৬৮) কিংবা “শুনইতে অনুখণ যছু না গুণগণ” (ঐ ২৭১) প্রভৃতিতে দেখা যায় ভাষা ও ভাবের পারিপাট পূর্বোক্ত পদের তুলনায় অনেক বেশী। গোবিন্দদাসের প্রথমোক্ত পদে অলঙ্কারের প্রয়োগও বেশী। উপমা উপমেয়ের আড়াল থেকে রাধাকে খুঁজে বার করা কঠিন। দ্বিতীয়টিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ কম হলেও ভাব ও ভাষায় এমন এক মার্জিত ভাব আছে যা রাধার প্রাণের আবেগকে মুরারি গুপ্তের রাধার বক্তব্যের মত স্বচ্ছ ও প্রাণস্পর্শী করে তুলতে পারে নি। ফলে গোবিন্দদাসের রাধার তুলনায় মুরারি গুপ্তের রাধা যেন আমাদের অনেক কাছের মানুষ—অনেক নিকটবর্তী।

পূর্ববর্তী পদকারদের মধ্যে শ্রীরাধার পূর্বরাগ নিয়ে বেশ কয়েকটি পদ

পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ বসুর "তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" (প ক. ত. ১৪৫) এবং বংশীদাসের "এই তো গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি" (প.ক ত. ১১৮) প্রভৃতি পদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটিতে স্বপ্নদর্শনে রাধার পূর্বরাগ এবং দ্বিতীয়টিতে প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ দশার অন্যতম—নবম দশার বর্ণনা। এই দুটি পদেরই ভাব ও ভাষার সরলতা ও বক্তব্যের সুস্পষ্টতা লক্ষ্য করার বিষয়। রামানন্দের রাধা যেন লজ্জাশীলা বাঙালী ঘরের বধূ, লোকভয়ে ভীতা রমণী। স্বপ্নে শ্যামসুন্দরের দেখা পেয়ে মোহিতা মুগ্ধা, তবুও তার সঙ্কোচের সীমা নেই। বংশীদাসের রাধিকাও যেন আমাদের পরিচিতা। তার মূর্চ্ছাব্যাধির কারণ সখীরা জানলেও তার গৃহবাসীদের জানা নেই। সেজন্যই রাধিকার মূর্চ্ছার কারণ যে স্বয়ং শ্যামসুন্দর সে কথা তারা জানলেও প্রত্যক্ষভাবে তাকে দায়ী না করে প্রচ্ছন্ন ভাবে "কালিয়া কোঙরের" নাম করে কোনও অজ্ঞাত দেবতার কথা বোঝানোর প্রয়াস চলছে। এই দুই পদের কোনও ক্ষেত্রেই রাধিকাকে আমাদের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে কোনও বাধা নেই বলে পদকারদ্বয় সহজেই তাঁদের নায়িকার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। কিন্তু এসব পদের তুলনায় পরবর্তী কালের পদে ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্যের যথেষ্ট প্রকাশ থাকলেও এতটা মর্মস্পর্শী হয় নি। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের যে কোনও পদের তুলনা করলে দেখা যাবে যে রাধিকা যেন এ লোকের অধিবাসী নন। রামানন্দ বা বংশীদাসের রাধিকার সংসার এবং পরিজন আছে কিন্তু গোবিন্দদাসের বৃন্দাবনের জগতে শুধু রাধাকৃষ্ণ এবং সখীবৃন্দ ছাড়া আর যেন কেউ নেই, দু'একটিমাত্র পদে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, রাধা বা কৃষ্ণের বর্ণনায় যে রাজসিকতা আছে তার ফলে তাঁরা পূর্ববর্তী রচয়িতাদের রাধা বা কৃষ্ণের মতন যেন আমাদের কাছের মানুষ নন—অনেক দূরবর্তী অন্য জগতের অপরূপ রূপলাবণ্যপূর্ণ দেবদেবী। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের "মত ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত" (যুগো, প. ভা. যু, ১৮৬), "সজল জলধর অঙ্গ মনোহর" (গো দা. প, ১৮৭), "মরকত দরপণ বরণ উজোর" (গো. দা. প. ১৮৮) প্রভৃতি পদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসতত্ত্বের প্রভাব একমাত্র আচার্য-শিষ্যবর্গের মধ্যেই যে দেখা যায় তা নয়। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের অনেক

পদকারের মধ্যেও এই প্রভাব বর্তমান। যদুনন্দনের "কদম্বের বন হৈতে" (প.ক.ত. ১৪২)’ "নিরমল কুলশিল কাঞ্চন গোরি।" (প.ক.ত. ১৭০), শেখরের "তুহুঁ মনমোহন কি করে তোয়" (প.ক.ত. ১৬০), পরমানন্দের "কানুক নিদয় বচন শুনি" (প.ক.ত. ১৮৩), রাধামোহনের "ঘোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি" (প.ক ত. ১৬৫) প্রভৃতি পদে পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হতে পারে। ভাবে, ভাষায় প্রভৃতিতে এই রচনাগুলি মুরারি, রামানন্দের চেয়ে গোবিন্দদাসের রচনার অনেক নিকটবর্তী। তবে আচার্যের যুগের সকলের রচনাতেই যে এ প্রভাব বর্তমান তা বলা যায় না। জ্ঞানদাস সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর পূর্বরাগের পদে "কেনে গেলাম জল ভরিবারে" (প.ক.ত. ১২০), "আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে" (প.ক.ত- ১২৩) প্রভৃতি পদে মুরারি আদি পদকারের সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। ভাষা ও বর্ণনার দিক থেকে জ্ঞানদাসের "সহজে নুনিক পুতলি গোরি" (প.ক.ত. ৪১), "অপরূপ তুয়া মুরলি ধনি" (প.ক.ত. ৪২) প্রভৃতি পদগুলি তাঁর সমসাময়িক পদকারদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মবিচারে এগুলিতে বিদ্যাপতির প্রভাব বেশী দেখা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যাপতির রাধা মাধব ঐশ্বর্যশালী হলেও তাঁরা এজগতের লোক। জ্ঞানদাসের রাধাকৃষ্ণও অনুরূপভাবে কোন সময়েই অলৌকিক লোকের নন।

গোস্বামীদের বর্ণিত রসতত্ত্ব ছাড়া তাঁদের নির্দেশিত সাধনতত্ত্বও পরবর্তী পদকারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্মরণ রাখতে হবে যে এসব পদকাররা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক এবং কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যতটা পদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার চেয়েও বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কাব্য রচনাকে তাঁদের সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে। গোস্বামীদের রসতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে শ্রবণকীর্তনের উপযোগী বাংলা পদের তখন বিশেষ অভাব ছিল। এসব সাধক কবিরা সেই অভাব পূর্ণ করার জন্যও পদরচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। কাজেই এঁদের রচনাতে গোস্বামী-নির্দেশিত সাধনতত্ত্বের প্রভাব থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

চৈতন্যপরবর্তী-যুগে বৈষ্ণবীয় সাধনপদ্ধতিতে মঞ্জরীভাবের সাধনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অনুরাগবল্লীতে এসম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারও এসম্বন্ধে আলোক

পাত করেছেন।১৭ এই উপাসনা-পদ্ধতিতে সাধক নিজেকে ব্রজের নিত্য-সিদ্ধা কোনও সখীর অনুগতা কিশোরীরূপে চিন্তা করেন। তাঁর একমাত্র কাজ ভোগবাসনা রহিত হয়ে সখীদের নির্দেশে রাধাকৃষ্ণের সেবা করা। উজ্জ্বলনীলমণির সখীপ্রকরণে শ্রীরূপ সখীদের কাজের যে তালিকা দিয়েছেন তার সঙ্গে এই মঞ্জরীদের সেবায় বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাস সম্ভব কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ; কিন্তু মঞ্জরীদের সঙ্গে তাঁর কোন বিলাস সম্ভব নয়। কাজেই সখীদের যেখানে সঙ্কোচ, মঞ্জরীদের সেখানে নিঃসঙ্কোচ সেবার অধিকার আছে। সেজন্য কেলিবিলাসের সময় সখীরা উপস্থিত থাকতে পারেন না কিন্তু মঞ্জরীদের ঐ সময়েও তাঁদের পাদসংবাহন, চামরব্যজন প্রভৃতি করার অধিকার আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক এর সাধনার ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের রচিত পদেও তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্যের যে পাঁচটি পদ পাওয়া গিয়েছে তার দুটি পদে এই মঞ্জরীভাবের সাধনার উল্লেখ আছে। তাঁর রচিত "প্রেমক পুঞ্জরি গুণ গুণমঞ্জরি" (প.ক.ত. ৩০৭২) পদে তিনি তাঁর গুরু গোপাল ভট্টের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোর কিশোরী পদ সেবন সম্পদ
তুয়া সনে মীলব মোয়॥

অনুরূপভাবে অপর পদ "তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি" (প.ক.ত. ৩০৭৩) পদেও তাঁর প্রার্থনা, গুরু আচার্যকে তাঁর অনুগত করে 'ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের' সেবা কবার সুযোগ দান করুন। অনুরূপভাবে নরোত্তম ঠাকুর বহু পদে তাঁর এই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত "হরি হরি হেন দিন হইবে আমার" (প.ক ত. ৩০৫৯), "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর" (প. ক.ত. ৩০৬০, "রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে" (প.ক.ত. ৩০৬১), "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ" (প.ক.ত. ৩০৬৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মঞ্জরীভাবের সাধনার প্রভাব তৎকালীন পদকারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দদাসের প্রায় প্রতিটি পদের ভণিতাতেই তাঁর সেবার ভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। "নিশি-অবশেষে

---

১৭. যো.শ.প.সা. — পৃ. ১৭২-৭৫

জাগি সব সখিগণ" (প.ক.ত. ২৪৭২) পদে দেখা যায় নিশান্তে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের পর মুখ ধোওয়ার জলের ঝারি নিয়ে কবি অপেক্ষা করছেন। "নিজ গৃহে শয়ন করল বর কান" (প.ক.ত. ২৭৬১) পদে দেখা যায় প্রভাত বেলাই কানাই যখন গোষ্ঠে যাচ্ছেন তখন তাঁর সঙ্গে গোবিন্দ দাস "মটুকি লই ধায়।" আবার "সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন" (প.কত. ২৭৭০) পদটিতে দেখা যায় নন্দকিশোরের ভোজনান্তে রাধা যখন ভোজনে বসেছেন তখন গোবিন্দদাস "ঝারি লই ঠাড়হি চামর ঢুলাওত থোরি।"

প্রত্যক্ষ ভাবে সেবার ভাব প্রকাশ ছাড়া গোবিন্দদাসের রচনায় পরোক্ষ প্রকাশও দেখতে পাওয়া যায়। "ঝর ঝর জলধার ধার" (প.ক.ত. ১৭৪১) পদে দেখা যাচ্ছে রাধার সেবিকারূপে গোবিন্দদাস মাধবের সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে শীঘ্রই রাধার কাছে যেতে বলেছেন। আবার "টারল হৈসন শিশিরক অন্ত" (প ক.ত. ১৭১৮) পদে দেখা যাচ্ছে শ্রীরাধার সেবিকা গোবিন্দদাস কানুর কপটতায় বিরক্ত। এই বিরক্তি মঞ্জরীভাবের সাধকের পক্ষেই সম্ভব। এখানে যেকটি পদ নিয়ে আলোচনা করা হলো এই শ্রেণীর অজস্র পদাবলী পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাসের পদে মঞ্জরীভাবের সাধনার যে লক্ষণ দেখা গেল তার প্রভাব সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য কবিদের ওপরেও দেখতে পাওয়া যায়। "নাগর নাগরি চেলি বিলাস" (প.ক.ত. ২৬৪২) পদে দেখা যাচ্ছে "শ্বসজল পূরল দুহুঁজন গায়। বীজন বীজয়ে শেখর রায়।" "ছোড়া দূরতে আওত নাগর রায়" (প.ক.ত. ২৬৮৩) পদে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হতে এলে "রতন আসনে বসিলা সভে। শেখর সভারে সেবয়ে তবে॥" আবার "রতনমঞ্জরী যতন করি।" (প.ক.ত. ২৭০০) পদে দেখা যায় খাওয়া-শেষে 'সুখদ পালঙ্কে শুতল রাই। শেখর সে সব ভুঞ্জল খাই" অনুরূপভাবে মাধবদাস, রাধামোহন, উদ্ধবদাস আদি পদকারের পদেও এই মঞ্জরীভাবের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়॥

মঞ্জরীভাবের সাধনার প্রভাব পূর্ববর্তী রচনায় পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্ত, বংশীদাস. আদি পদকাররা শ্রীরাধার নানা বর্ণনার শেষে কোন পদেই নিজেদের তাঁর অনুগত সাধিকার মনের পরিচয় দেন নি। বংশীদাসের পদে দেখা যায় তিনি দর্শক হিসেবে এসব লীলা প্রত্যক্ষ করছেন এবং ভণিতায় মন্তব্য করেছেন। লীলায় সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেবিকার ভূমিকা নেওয়ার নিদর্শন একমাত্র পরবর্তী যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য।

মঞ্জরীভাবের সাধনার যে বৈশিষ্ট্য শ্রীনিবাসাচার্যের যুগের ও পরবর্তী কালের বহু পদের মধ্যে বর্তমান, তা সমসাময়িক কয়েকজনের পদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিচারে এটি কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। তিনি নিত্যানন্দ গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাঁদের রচনায় সখ্যভাবের প্রাবল্য দেখা যায় ; কাজেই জাহ্নবা দেবীর শিষ্য হিসাবে তাঁর রচনায় এই প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে পরকীয়া তত্ত্বের প্রাধান্য নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। পদাবলী সাহিত্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে এই পরকীয়া-তত্ত্বের প্রভাব কতখানি বর্তমান। পদাবলী সাহিত্যের প্রথম থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চণ্ডীদাস, মুরারি, বংশী প্রমুখ আচার্য-যুগের পূর্ববর্তী কালের পদসমূহে পরকীয়া মনোভাবের প্রাবল্য বেশী। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের "আজুক শয়নে ননদিনী সনে" (প.ক ত. ৭৪১), "আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ" (প.ক ত ৭২৪), মুরারি গুপ্তের "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও" (প ক.ত. ৭৫১), রামানন্দ বসুর "তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" (প ক ত ১৪৫), বংশীদাসের "এই ত গোকুলবাসী" (প ক ত. ১১৮ প্রভৃতি পদে পরকীয়া ভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ বর্তমান। পরবর্তী যুগের জ্ঞানদাসের পদেও এই প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ "কেনে গেলাম জল ভরিবারে" (প ক ত. ১২০), "আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না" (প ক ত. ১২৩। প্রভৃতি পদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সকল পদ বিচার করলে দেখা যায় শাশুড়ী ননদিনী সম্বলিত এই রাধা যুবতী। একদিকে সংসার অপরদিকে শ্যাম—এই দুদিক নিয়ে তাঁর দ্বন্দ্ব পূর্বরাগের এই পদগুলোতে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের পূর্বরাগের পদগুলি বিচার করলে দেখা যাবে এর ব্যতিক্রম আছে। গোবিন্দদাসের এবং তৎকালীন পদকারদের রচনায় দেখা যায় সেখানে রাধার সংসারের বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। নিত্যলীলার এই জগৎ শুধুমাত্র রাধা, কৃষ্ণ এবং সখীবৃন্দের—এই জগতে আর কেউ নেই। অবশ্য গোবিন্দদাসের "গোরখ জগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে" প্রভৃতি কয়েকটি পদ এর ব্যতিক্রম।

দেখা যাচ্ছে পরবর্তী যুগের পদসমূহের বক্তব্য পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বেশ অস্পষ্ট। পূর্ববর্তী যুগের যে কোনও পদ বিচার করলে পদকারের মানসপ্রতিমা ও তার পরিবেশ আমাদের মনেও পরিষ্কার মূর্ত হয়ে ওঠে কিন্তু পরবর্তী পদকারদের ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য নয়। পূর্বরাগ বা আক্ষেপানু-

রাগের কোন পদেই তাঁরা তাঁদের মানস-প্রতিমাকে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেন নি। এঁকে এবং এর পরিবেশকে তাঁরা নানাভাবে বাস্তব জগতের বাইরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এক জায়গায় তাঁদেরও ধরা দিতে হয়েছে সেটি হলো অষ্টকালীয় নিত্যলীলার বর্ণনায়। সেখানে তাঁরা নায়কনায়িকাদের কোন্ পরিবেশে দেখেছেন সেটি বিচার করলে তাঁদের বক্তব্যকে ধরা সহজ হবে।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদকার হিসাবে গোবিন্দদাসের পর শেখরের নাম করতে হয়। আচার্য-পরবর্তী কালে যে একজন শেখর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শেখর ভণিতায় এমন সব পদ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি বিচার করলে আচার্য-পরবর্তী যুগের সমস্ত লক্ষণই তার মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই সব শেখর-ভণিতাযুক্ত পদের কয়েকটিতে পর্তুগীজ শব্দের নিদর্শন মেলে, যা শ্রীনিবাস আচার্যের আগে থাকা সম্ভব নয়!

শেখরের পদে রাধার মধ্যে আত্মীয়পরিজনবেষ্টিত একটি কিশোরীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে তাও অনুপস্থিত। কৃষ্ণের পরিবার-পরিজনের যে আভাস পদসমূহে পাওয়া যায়, রাধার পরিজনের সে রকম উল্লেখ নেই। নন্দগৃহে রাধার রন্ধনের উল্লেখও নেই। নিত্যলীলার বর্ণনাতেও তিনি সমাজবিহীন পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

শেখর ও গোবিন্দদাসের নিত্যলীলার পদসমূহ বিচার করলে মনে হয় তাঁরা রাধা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণাকে সমর্থন করতেন না। রাধাকৃষ্ণ-গতপ্রাণ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দর্শনতত্ত্বে পরকীয়া মত সম্বন্ধে নানা তর্ক আছে। শ্রীরূপ ও শ্রীজীব পরকীয়া তত্ত্ব সমর্থন করতেন কি না সন্দেহ। তবে মনে হয় গোস্বামীরা গোবিন্দদাসের সমাজবিহীন অলৌকিক পরিবেশের পক্ষপাতী ছিলেন বলে তাঁর পদের রসাস্বাদনে অধিক আগ্রহী ছিলেন। প্রকটলীলায় স্বকীয়া কিংবা পরকীয়া—এর কোনও একটিকে অবলম্বন না করলে মধুর রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পরকীয়া তত্ত্বকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করতে হয়েছিল। কিন্তু এই সমর্থনে ভবিষ্যতে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে দেখেই সেই সঙ্গে পরকীয়া তত্ত্ব একমাত্র ব্রজের লীলাতে রাধাকৃষ্ণ এবং সখীদের দ্বারা সম্ভব একথা তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছেন এবং অপ্রকটে স্বকীয়া এবং প্রকটে পরকীয়াবাদের মত প্রচার করেছেন। তৎসত্ত্বেও জটিলতা থেকে যাওয়ার

সম্ভাবনায় শ্রীরূপ তাঁর ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামারূপিণী রাধার বিবাহের কথা বলেছেন। শ্রীজীবও গোপালচম্পূর উত্তর চম্পূতে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেখিয়েছেন।

পুরাণ ও উপাখ্যান বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাকে অবলম্বন করলেও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে তাঁদের রাধাকৃষ্ণের জন্য একটি স্বতন্ত্র জগতের কল্পনা করেছিলেন তার প্রমাণ হলো এই লীলায় বিভিন্ন নূতন চরিত্রসৃষ্টি। রাধার সখীদের পরিচয় বয়স সবই শ্রীরূপ বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। এই অষ্টসখীর মধ্যে ললিতা ও বিশাখার নাম পূর্বেও পাওয়া যায়। সখীদের মতন কৃষ্ণ-সখাদেরও অনেক নূতন নাম পাওয়া যায়। সুহৃদ শ্রেণীর সখাদের মধ্যে সুভদ্রা, সণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, বলভদ্র প্রভৃতি প্রধান। সখাদের মধ্যে বিশাল, বৃষভ ওজস্বী প্রভৃতি, প্রিয়সখাদের মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, ভদ্রসেন প্রভৃতি এবং প্রিয়নর্মসখাদের মধ্যে সুবল, অর্জ্জুন, বসন্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব সখাদের সঙ্গে শ্রীরূপ একজন বিদূষকের কল্পনাও করেছেন। তাঁর নাম মধুমঙ্গল। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃবধূ কুন্দলতা ও সন্দীপন-মাতা পৌর্ণমাসীর চরিত্রও শ্রীরূপের নিজস্ব সৃষ্টি।

গোবিন্দদাসের পদসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি একমাত্র সুবল ও মধুমঙ্গলের চরিত্র ছাড়া অপর কোনও চরিত্রের ব্যবহার তাঁর পদে করেন নি। "আনাই ছল করি সুবল করে ধরি" (প ক.ত. ২৫৭৮) এবং "আওত রে মধুমঙ্গল ভালি" (প.ক.ত. ২৫৪২) পদ দুটি বিচার করলে দেখা যায় তিনি বৃন্দাবন-গোস্বামীদের সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও এসব চরিত্রের ব্যবহার না করার একমাত্র কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরচনার আসল উদ্দেশ্য ছিল রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা। এই বর্ণনার সময় তিনি সর্বপ্রকারে বাহুল্য বর্জন করে তাঁর আরাধ্য দেবদেবীর লীলা বর্ণনার দিকেই সর্বদা তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে যখনই সখীদের প্রসঙ্গ এসেছে তখন প্রত্যেকের পৃথকভাবে বর্ণনা দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করেন নি। শেখরের একটি পদের সঙ্গে তাঁর একটি পদের তুলনা করলে তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীহরণের চিত্রে শেখর তাঁর "ইঙ্গিতে বুঝিয়া নাগর আসিয়া ধরিল রাইয়ের করে" (প.ক ত. ২৬৩১) পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুরলীর জন্য রাধার সখীদের কাছে খোঁজ করছেন। দেখা যাচ্ছে তিনি প্রথমে রাধাকে ধরলেন, রাধা ললিতাকে দেখিয়ে দিলেন। ললিতা বললেন

বিশাখা নিয়েছেন। এভাবে তিনি এক সখী থেকে অপর সখীর কাছে ঘুরছেন। এই দীর্ঘ বর্ণনায় এঁদের লীলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া গেলেও পদে সখীরা রাধাকৃষ্ণের প্রায় সমান গুরুত্ব পাওয়ায় নায়কনায়িকার চরিত্রকে খানিকটা খর্ব করা হয়েছে। এর সঙ্গে গোবিন্দদাসের এই প্রসঙ্গের পদে দেখা যায় "সখিগণে কানু পুছত কত বার। কোন চোরায়ল মুরলি হামার" (প.ক.ত. ২৬৩২)। উত্তরে 'বিনোদিনি রাই' বললেন "কাহঁা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই।" শ্রীকৃষ্ণ তখন উপায়ান্তর না দেখে আবার সখীদের অনুনয় করছেন। দেখা যাচ্ছে এখানে গোবিন্দদাসও শেখরের মতন একই বিষয়বস্তু এইভাবে বললেও বর্ণনায় সখীরা নেপথ্যে থাকায় কানাই ও রাধার চরিত্র বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, অথচ শেখর এই ঘটনার যা বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে তিনিও বিচ্যুত হন নি। গোবিন্দদাসের রচনার এই বৈশিষ্ট্য প্রায় সকল পদেই পাওয়া যায়। তাঁর লক্ষ্য একমাত্র এই দুই চরিত্র বলে তিনি চরিত্র-বর্ণনা দিয়ে তাঁর পদকে ভারাক্রান্ত করেন নি।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস ভণিতায় "রাই কানু পাশা খেলে" (প ক ত. ২৬৬৯) পদটির কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে, এটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় রচিত হলেও এটি যে কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনা নয় তা পদটিকে বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁর "গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ" গ্রন্থে এটির উল্লেখ করেন নি। এখানে রাই ও কানাই-এর সখাসখীদের বর্ণনা দেওয়া আছে। মনে হয় এটি গোবিন্দ চক্রবর্তী কিংবা পরবর্তীকালের কোনও গোবিন্দদাসের রচনা হ'তে পারে।

গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের সখাসখীদের বিস্তৃতভাবে ব্যবহার না করলেও সে যুগের এবং পরবর্তী যুগের পদকারগণ তাঁদের পদসমূহে এঁদের অবলম্বন করে বহু সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বোধহয় শেখরই এসব চরিত্রের সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় রন্ধনাদিলীলায় এবং গোষ্ঠলীলায় কুন্দলতার চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার গোষ্ঠহরণ, বংশীহরণ, ও পাশাখেলার বর্ণনায় কানাই রাই-এর সখাসখীদের অবলম্বনে লীলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। পদকল্পতরুর ২৭০০ সংখ্যক পদে রতনমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী আদি মঞ্জরী সখীদের উল্লেখও পাওয়া যায়।

শেখর ছাড়া উদ্ধবদাস, মাধবদাস, যদুনন্দন ও বলরামের ভণিতায় কিছু

পদ পাওয়া যায় যেখানে গোস্বামীদের কল্পিত এসব সখাসখীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাত্রপাত্রী ছাড়াও বৃন্দাবন-গোস্বামীরা বিশেষতঃ শ্রীরূপ রাধাকৃষ্ণের যে সামাজিক পটভূমিকা কল্পনা করেছেন তার প্রভাবও পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'গোবিন্দদাসের পদাবলী-সাহিত্য ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে এই পটভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় শ্রীরূপ নন্দকে একজন সামন্ত রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণকে রাজপুত্র হিসাবে কল্পনা করেছেন। রাধার পিতা বৃষভানুও একজন রাজা, সুতরাং রাধাও রাজনন্দিনী। গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণ বর্ণনায় এই রাজসিক প্রভাব খুবই বেশী। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় "অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির" (প ক ত ২৪২৪), "অভিনব নীল-জলদ তনু ঢর ঢর" (প ক ত. ২০), "কানর কুসুম কোমল কাঁতি" (প ক.ত ২৪১৪) প্রভৃতি পদে এবং রাধার রূপ বর্ণনায় "শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন" (প.ক.ত ১০৫৫), "ধনি কানড়ছাঁদে বাঁধে কবরী" (প ক ত. ২৪৬৮) এবং অভিসারের বর্ণনায় "কঞ্জ চরণযুগ যাবক রঞ্জন" (প ক.ত. ১০৩০). "মেঘ যামিনি চলল কামিনি" (প ক.ত ৯৯৩) প্রভৃতি পদে অলঙ্কারাবৃত রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা পাওয়া যায়। শেখরের "উলালী ঢুলালী সোহাগ আগলি" (প.ক.ত. ২৫৬১), যদুনন্দনের "সৌন্দর্য-অমৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গবিন্দু" (প ক ত ২৫৯১), মাধবদাসের "শারি পঢ়ত অতি অনুপ' (প.ক.ত. ২৬৫৭) প্রভৃতি পদে অলঙ্কার ও সাজসজ্জার বর্ণনা এই রাজসিকতাকে স্মরণ করায়।

শ্রীরূপের কল্পিত রাজসভার বণনা পাওয়া যায় গোবিন্দদাসের "মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর" (প ক ত ২৬৯৩), মাধবদাসের "উপনন্দ অভিনন্দ নন্দের ডাহিনে" (প.ক ত. ২৬৯৪), শেখরের "গুণিগণ করে আজ লইয়া বিবিধ তান" (প.ক.ত. ২৬৯৬) প্রভৃতি পদে। শেখর রূপ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন পরিচারকের নামও পদে ব্যবহার করেছেন। 'সুগন্ধি ওদন বিবিধ বাঞ্জন" (প.ক ত ২৫৫৮), "সেবায় সেবকগণ আনন্দে আকুলমন" (প.ক.ত. ২৬৯৭) প্রভৃতি পদে শ্রীকৃষ্ণের সেবক, রজক প্রভৃতির নাম ও তাদের সেবার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।

শ্রীরূপের রচনার পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া সাক্ষাৎ প্রভাবও পদাবলী-সাহিত্যে বর্তমান। ডঃ শুকদেব সিংহ তাঁর "শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্যে" এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কমপক্ষে আটচল্লিশজন পদকারের ওপর শ্রীরূপের বিভিন্ন রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। তার মধ্যে

দেখা যায় বিদগ্ধমাধব, গীতাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাব পদকারদের ওপর সর্বাধিক। পদকারদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদ সর্বাধিক—প্রায় ষাটটি পদের উল্লেখ করে তার ওপর শ্রীরূপের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এবিষয়ে গোবিন্দদাসের পর ঘনশ্যাম, যদুনন্দন ও নরহরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করতে হয়। গোবিন্দদাসের পর এঁদের পদই তিনি সর্বাধিক উল্লেখ করেছেন।

তবে সবক্ষেত্রে তাঁর এই উদ্ধৃতিকে শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানদাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্ঞানদাসের সাতটি পদ তিনি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করলেও এর সব কটির ওপর শ্রীরূপের প্রভাব নেই। উদাহরণস্বরূপ ডঃ সিংহ কর্তৃক উদ্ধৃত জ্ঞানদাসের "কেনে গেলাম জল ভরিবারে" (প ক.ত. ১২০), "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা" (প.ক.ত. ১৪৪) এবং "ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ" (প ক.ত. ১৬৫৭) পদ তিনটির কথা বলা যেতে পারে। এগুলিতে শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের কোনও লক্ষণ বর্তমান নেই। বিশেষতঃ শেষোক্তটির ওপর ভাগবতের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান।

ডঃ সিংহ তাঁর গ্রন্থে পরবর্তী যুগের মধুর রসের প্রভাব পূর্ববর্তী যুগের জনপ্রিয় বিষয়বস্তু বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদের ওপর দেখাতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ "হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়নে বন্দন রাগ" পদটির উল্লেখ করেছেন। পদটি নিঃসন্দেহে তাঁর উক্তিকে সমর্থন করছে কিন্তু এটি যে জ্ঞানদাসের তার প্রমাণ তিনি কোথায় পেলেন বোঝা গেল না। কারণ তিনি পদকল্পতরু থেকে পদটি উদ্ধৃত করলেও সেখানে এটিকে অজ্ঞাত পদকারের রচনা বলে ধরা হয়েছে। এটি জ্ঞানদাসের রচনা বলে তিনি প্রমাণ করতে পারলে নিঃসন্দেহে এই পদকারের ওপর পরবর্তী কালের প্রভাব প্রমাণ করতে পারা যায়।

তবে ডঃ সিংহ জ্ঞানদাসের একটি পদে শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। পদকল্পতরুর ৫৩৫ সংখ্যক পদ "শুন সখি বচন মনহি অনুমান" পদটি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে এর ওপর শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের প্রভাব বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের নাগরীবেশের বর্ণনা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই এই পদটী রচিত হয়েছে। তবে জ্ঞানদাস শ্রীরূপকে পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। শ্রীরূপের বর্ণনায় আছে শ্রীকৃষ্ণ নাগরীবেশে নিকুঞ্জে ছিলেন আর শ্রীরাধা তাঁর উদ্দেশ্যে সেখানে

এসেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ নাগরীবেশে রাধার উদ্দেশ্যে কুঞ্জে এসেছিলেন।

শুধু রূপ গোস্বামীর রচনাই নয়, এযুগের পদকারদের ওপর অন্যান্য গোস্বামীদের রচনার প্রভাব থাকা সম্ভব। তবে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে জীব গোস্বামীর রচনার কথা বলা যায়। মাধবমহোৎসবে রাধার অভিষেক ও পরবর্তী উৎসবকে তিনি নয়টি উল্লাসে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। আচার্য-শিষ্য মোহন রচিত তিনটি রাধার অভিষেকের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হয়েছে। শ্রীজীবের এই রচনার প্রভাবেই প্রভাবিত হয়ে মোহন এই পদগুলি রচনা করেছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আচার্য ও তৎপরবর্তী যুগের রচনার অপর বৈশিষ্ট্য হলো ষড়গোস্বামীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাসূচক পদসমূহ। এই সব পদ থেকে অনুমান করা যেতে পারে তাঁরা গৌড়বাংলার পদকারদের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই প্রভাবের স্বীকৃতিই স্বরূপই এ সব পদ রচিত হয়েছে। এদেশের বৈষ্ণবদের হৃদয়ে চৈতন্যদেবের অন্যান্য পরিকরদের মতন এঁদেরও বিশেষ সম্মানের স্থান করে দেওয়ার কৃতিত্ব সর্বাংশে শ্রীনিবাসাচার্যের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আচার্য-পূর্ববর্তীযুগে গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যাধিক্য ছিল। আচার্য ও তৎপরবর্তী যুগে বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে পদের আধিক্য হলেও গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বনে পদরচনা একেবারে লোপ পায় নি। তবে ভাবে ভাষায় ও বর্ণনায় এই পদসমূহ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে পৃথক ছিল। এই দুইযুগের পদসমূহ নিয়ে আলোচনা করে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা যেতে পারে।

আচার্য্যপূর্ববর্তীযুগে যে গৌরাঙ্গলীলার পদের সংখ্যাধিক্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যয়ে গৌরপদতরঙ্গিণীর পদগুলিতে। এই গ্রন্থের সব পদই গৌরাঙ্গলীলার পদ। পূর্ববর্তী যুগের মুরারির ভণিতায় এই গ্রন্থে মোট ৯টি পদ পাওয়া যায়। এছাড়া পদকল্পতরুতে আছে দুটি পদ। সেদুটি অবশ্য গৌরাঙ্গলীলা নিয়ে নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুরারি ভণিতায় প্রাপ্ত এই দুটি গ্রন্থে মোট ৯টি পদের মধ্যে ৭টিই গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক। গোবিন্দ ঘোষের ভণিতায় ৬টি পদ গৌরাঙ্গতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে

এঁর ভণিতায় প্রাপ্ত সাতটি পদের চারটিই গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে অর্থাৎ মাধব ঘোষ ভণিতায় এই দুটি গ্রন্থে প্রাপ্ত মোট আটটি পদের পাঁচটি গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ।

রামানন্দ রায় ভণিতার পদ বাদ দিলে পদকল্পতরুতে রামানন্দ বসু ভণিতায় মোট আঠারটি পদ আছে । গৌরপদতরঙ্গিণীতে রামানন্দ ভণিতায় পদ পাওয়া যায় মোট চৌদ্দটি । এই চৌদ্দটির এগারোটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে ধৃত হয়েছে । অর্থাৎ রামানন্দ ভণিতার মোট একুশটি পদের চৌদ্দটিকেই গৌরাঙ্গলীলার পদ হিসেবে ধরা যেতে পারে ।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে নরহরি ভণিতায় মোট তিনশত তিরাশিটি পদ ধৃত হয়েছে । এক নামের ভণিতায় এত পদ গৌরপদতরঙ্গিণী বা পদকল্পতরু —দুই গ্রন্থের কোনটিতেই নেই । নরহরি ভণিতায় পদকল্পতরুতে আছে মোট পঁয়ত্রিশটি পদ । এর মধ্যের চব্বিশটি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে । অর্থাৎ নরহরি ভণিতায় মোট তিনশত চুরানব্বইটি পদের তিনশত তিরাশিটি পদই গৌরলীলার পদ । নরহরি ভণিতা নিয়ে অবশ্য সমস্যা আছে । নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তী এই দুই পদকারের মধ্যে প্রথমোক্তজন চৈতন্যপরিকর এবং আচার্যপূর্ববর্তীযুগের ব্যক্তি । দ্বিতীয়জন—নরহরি চক্রবর্তী—আচার্যপরবর্তী যুগের পদকার । এঁদের দুজনের পদ পৃথক করার কাজ আজও সম্পন্ন হয় নি । এছাড়া আরও কোনও এক বা একাধিক পদকার নরহরি ভণিতায় পদরচনা করেছিলেন কি না তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি । কাজেই এক্ষেত্রে আচার্যপূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের রচনা বোঝা কঠিন হলেও এই ভণিতায় গৌরাঙ্গলীলার পদের প্রাধান্যের এবং সংখ্যাধিক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে ।

অনুরূপভাবে দেখা যায় বাসু ঘোষের ভণিতায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোট একশত সাঁইত্রিশটি পদ ধৃত হয়েছে । এই ভণিতার পদকল্পতরুর পদসংখ্যা মোট পঁচানব্বই । তন্মধ্যে তিয়াত্তরটি পদ গৌরপদতঙ্গিণীতে পাওয়া যায় । অর্থাৎ এই ভণিতায় প্রাপ্ত মোট একশত উনষাটটি পদের মোট একশত সাঁইত্রিশটি পদই গৌরলীলা বিষয়ক ।

আচার্য-পূর্ববর্তী অন্যান্য পদকারদের মধ্যে শিবানন্দ সেন, গৌরীদাস, পরমানন্দ গুপ্ত ও শঙ্কর ঘোষের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । পূর্বোক্ত পদকারদের তুলনায় এঁদের ভণিতায় পদসংখ্যা কম । তন্মধ্যে গৌরাঙ্গলীলার

পদ অন্যান্য পদের তুলনায় বেশী। একমাত্র বংশীদাস ও বলরামদাসের ভণিতায় পদকল্পতরুর তুলনায় গৌরপদতরঙ্গিণীতে কম সংখ্যক পদ ধৃত হয়েছে। এই দুই নামে দুই যুগে একাধিক পদকর্তা ছিলেন কাজেই এঁদের পদ সম্বন্ধে সঠিকভাবে .কানও মন্তব্য করা কঠিন।

আচার্য পূর্ববর্তী পদকারদের পদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁদের হৃদয়ানুভূতিকে সহজ সরল ভাষায় সংক্ষেপে কয়েকটি ছত্রে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে প্রত্যেকের প্রায় প্রতিটি পদই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয় তাঁদের হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি অল্প কয়েকটি কথায় এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সেগুলি সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। সে তুলনায় পরবর্তীযুগের রচনা দীর্ঘ, ভাব ও ভাষায় জটিলতার লক্ষণ বর্তমান। ফলে এযুগের সকল পদকারের সব পদই রসোত্তীর্ণ হয় নি। এই দুই যুগের দুটি পদ নিয়ে তুলনা করলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

আচার্য পূর্বর্তীযুগের পদকারদের মধ্যে রামানন্দ বসু অন্যতম। চৈতন্যদেবের নৃত্যাদি লীলা বিষয়ক তাঁর কয়েকটি পদ আছে যেগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও অনুভূতির লক্ষণ বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত পদটিকে বিচার করা যেতে পারে—

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ॥
গোবিন্দ মাধব বসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়ারসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥

—(গৌ. প. ত. —পৃ. ৭৩ ও ভ. র. ১২ / ৩৪২৬-২৯)

এই পদে শুধু যে চৈতন্যদেবের কীর্তন সঙ্গীদের নামই পাওয়া যায় তা নয়। কীর্তনের সময় তাঁর ভাবাবস্থার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অপর কারুর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পদটি পড়লে কীর্তনরসে বিভোর চৈতন্যদেবের চিত্রটি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই চিত্রটি আরও পরিস্ফুট হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের বিবরণে। ভাবে বিভোর চৈতন্যদেবের মনের আনন্দ পরিষ্কার হয়েছে প্রথম ছত্রে। দ্বিতীয়

ছত্রে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ করে কীর্তন করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। ভাবাবেগেও তিনি যে নাম কীর্ত্তন করছেন তার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর কম্পিত অধরে। এই বিবরণের পুনরাবৃত্তি তিনি অপর একটি পদেও করেছেন। "নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি' (প ক ত. ২০৮২) পদের সপ্তম ও অষ্টম ছত্রে দেখা যায়—

হরি নাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥

তিনি যে সর্বদা নাম জপ করতেন তা একমাত্র তাঁর 'কম্পিত ওষ্ঠাধর' থেকে বোঝা যেত। কিন্তু এই 'বিরল লক্ষণ' সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি শ্লোকে।[১৮]

রামানন্দ বসুর এই শ্লোকটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের নৃত্যলীলার নিম্নোক্ত পদের তুলনা করলে পরবর্তীযুগের গৌরাঙ্গলীলার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

দেখত যেকত গৌর-চন্দ বেঢল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন উজর কারি কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমুদ-বন্ধু হেরি উছল রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি উদিত দিনহিঁ রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত মত্ত-করিবর-ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হাসিত ধরনি খসত গোহক পুলক-পাঁতিয়া॥
অসিম-মহিমা-কো কহুঁ ওর নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেম-অমিয়া হরখি ধরখি তরখিত সহি মাতিয়া।
যো রসে উত্তম অধম ভান বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥

(প. ক. ত ১০৬৩)

গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের পরবর্তীযুগের কবি, কাজেই তাঁর রচিত পদে পদে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রভাব আশা করা যায় না। সেজন্য তাঁর কল্পনা অনুভূতিকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর

---

[১৮] ষো. শ. প. সা.—পৃ. ৩৪

অসামান্য কবি প্রতিভার বলে তাঁর বক্তব্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেও পূর্বোক্ত পদের তুলনায় চৈতন্যদেবের চিত্রটি খানিকটা নিষ্প্রভ মনে হয়। চৈতন্যদেবের বর্ণনায় গোবিন্দদাস ইতিহাসের চেয়েও তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার ওপর যে বেশী নির্ভর করেছেন তার আরও প্রমাণ হিসাবে "সহজেই কাঞ্চন গোরা" (প.ক.ত. ২০৮৪) পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পদে চৈতন্যদেবকে কিশোর বয়স্ক ও নটবর বেশধারী বলে কল্পনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁকে একাত্ম করে কল্পনার ফলেই গোবিন্দদাস এই পদটি এভাবে রচনা করেছিলেন সন্দেহ নেই। তবে লক্ষ্য করার বিষয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকাররা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলে স্বীকার করলেও কোন পদেই তাঁদের দেখা চৈতন্যদেবকে এভাবে কল্পনা করেন নি।

হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কবি কল্পনার সাহায্যে কোনও মনোভাবের প্রকাশ পার্থক্যের আভাস রামানন্দের ও গোবিন্দদাসের দুটি পদের তুলনামূলক বিচারে দেখা গেল। এখানেও গোবিন্দদাসের কবিত্ব তাঁর পদকে এতটা কৃত্রিম করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পদকারের রচনায় বেশ কৃত্রিমতার আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্তের রচিত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর শচীমাতার বিলাপের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে। পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে মায়ের মন একে শোকার্ত হয়ে আছে। তাঁর শান্তিপুরে অবস্থানের খবর পেয়ে সেখানে তিনি গিয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের আবাসে কীর্তনের সময় পুত্রের ভাবাবেশ দেখে তিনি আকুল হয়ে ভক্তবৃন্দকে সম্ভাষণ করে বলেছেন—

ধর ধর ধরে রে নিতাই গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোঁসাই দেখিও নিতাই আমার আঁখির তারা।
না জানে কি ক্ষণে নাচিতে কীর্তনে পরাণে হইব হারা॥
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস ভূমিতলে পড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলি ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্তন হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি দেখ মায়ের দশা॥ (গৌ প.ত.পৃ ২৪৭)

এই পদটিতে মায়ের অন্তরের ব্যাকুলতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা একমাত্র কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশেই সম্ভব। এই পদটি বিচার করলে কোনও সন্দেহ থাকে না যে মুরারি সে সময়ে সেখানে

উপস্থিত ছিলেন এবং মায়ের আকুল আবেদন তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেজন্য মায়ের ভাষা ও আকুলতাই ছন্দোবদ্ধভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই পদটির সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের নিম্নোক্ত পদটির তুলনা করলে দেখা যাবে পরবর্তীযুগে কল্পনার আশ্রয়ে পদ কত নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প শুনে শচী চৈতন্যদেবের কাছে বিলাপ করে বলেছেন—

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া।
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন। অধর সুন্দর কুন্দ মুকুতাদশন।
অমিয়া বরিলে যেন সুন্দর বচন। না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন।
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর।
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রাখি সংকীর্তন কর তুমি রঙ্গে।
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার। জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম্মের বিচার।
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িয়া। কেমন জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা।।
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা।।
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু। তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু।।
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ বৃন্দাবনদাস।।

—(গৌ.প.ত.—পৃ. ২৪৫)

এই পদের ভাব, ভাষা ও বর্ণনায় যে কৃত্রিমতা আছে পূর্বোক্ত পদের সঙ্গে তুলনা করলে তা সহজেই চোখে পড়বে। পরবর্তী সকল পদকারের রচনাতেই যে এরকম কৃত্রিমতা আছে তা বলা যায় না। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি বর্ণনা প্রেমদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে—

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া।।
দিবানিশি পীয়ে গোরা নাম সুধাখানি। কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি।।
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে। দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে।।
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরনী। গৌরাঙ্গ বিরহে কাঁদে দিবস রজনী।
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহে কত কথা। প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা।।

—(গৌ.প.ত.—পৃ. ১৪৪)

এখানে বিয়োগ ব্যথাতুরা স্ত্রীর যে চিত্র স্বল্পকথায় পদকার ফুটিয়ে তুলেছেন তা সমসাময়িক যে কোনও পদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। এমনকি বাসু ঘোষের ভণিতায় "কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া"

(গৌ প.ত —পৃ. ২৫২) পদটিও এর তুলনায় অনেক নিষ্প্রাণ মনে হয়। এই পদটি বাসু ঘোষের স্বরচিত না হওয়াও সম্ভব। এই পদ ছাড়াও জয়ানন্দের বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যার পদগুলির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে রচিত পদগুলি পূর্ববর্তী যুগের রচনার তুলনায় অনেক নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম হয়েছে।

এই দুই যুগের রচনার মধ্যে অপর পার্থক্য হলো বিষয়বৈচিত্র্যে। পূর্ববর্তী যুগের রচনার বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে এযুগের পদকারেরা গৌরাবতারের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, গৌরাঙ্গের রূপ, ভাবাবেশ ও প্রলাপ, সন্ন্যাসের পূর্ব ও পরবর্তী কালের অবস্থা, বাসু ঘোষ ও নরহরি ভণিতায় নাগরীভাবের পদ পাওয়া যায়। এবিষয়ে মুরারির পদ মাত্র একটি এবং নরহরি ভণিতায় পদসংখ্যা খুবই বেশী। এর সবগুলিই সরকার ঠাকুরের নিজস্ব রচনা কি না তা অনুসন্ধানের বিষয়।

পরবর্তীযুগে গৌরাঙ্গলীলা নিয়ে রচিত পদ সমূহে বিষয়বৈচিত্র্যের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী যুগের বিষয়বস্তু ছাড়াও এসব বিষয়ের মধ্যে চৈতন্যদেবের পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার রসোদ্গার, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, মান, বিরহ, অষ্টকালীয় লীলা প্রভৃতি বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাবে কৃষ্ণলীলার বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গৌরপদতরঙ্গিণীর পূর্বরাগ ও অনুরাগের পদ সংকলনে দেখা যায় এবিষয়ের মোট ২৭টি পদ ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে জ্ঞানদাস ভণিতায় তিনটি, বাসু ঘোষের ভণিতায় চারটি ও নরহরি ভণিতায় পাঁচটি পদ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে জ্ঞানদাস ভণিতায় পদগুলি ভাব ও বক্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে দুর্বল বলে মনে হয়। নরহরি ভণিতার একটি পদের সঙ্গে তুলনা করলে এই দুর্বলতার স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। এই গ্রন্থের আলোচ্য উচ্ছ্বাসের পূর্বের উচ্ছ্বাস ভাবাবেশ ও প্রলাপের সর্বশেষ পদে দেখা যায় নবদ্বীপ লীলায় চৈতন্যদেব কৃষ্ণভাবে বিভোর।

> কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
> ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে॥
> যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি।
> ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি॥
> সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ।

মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে ।
অনিমেষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে ॥
ভাব বুঝি গদাধর রহে বামপাশে ।
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে ॥ (গৌ.প.ত.—পৃ. ১১৮)

এখানে ভাবাবেশে রাধা বলে ডাকা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে মুরলীর সন্ধান করা এবং গদাধর পণ্ডিতের বাম পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে একটা সংগতি লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু আলোচ্য জ্ঞানদাসের পদগুলির প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের রাধাভাব । বর্ণনা প্রসঙ্গে পদকার বলছেন—

সোনার গৌরাঙ্গ চাঁদে ।
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি হা নাথ বলিয়া কাঁদে ॥
গদাধর মুখে ছল ছল চোখে তাহার নিশ্বাস ছাড়ি ।
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর থির নয়নে নেহারি ॥ (গৌ.প.ত পৃ. ১৮৮)

এখানে চৈতন্যদেবকে রাধাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু শেষ ছত্রের "জ্ঞানদাস কহে, রাধার পীরিতে, সতত সে রসে ভোরা" বক্তব্যে পদকার 'রাধার পীরিতে' বলতে কি বলতে চাইছেন বোঝা কঠিন । "রাধার পীরিত" বলতে সোজা বাংলায় রাধার জন্য কৃষ্ণপ্রেম বোঝায় । সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে এই বক্তব্যের অসংগতি দেখা যায়, আবার "রাধার ন্যায় পীরিতি' বুঝতে গেলে কবি কল্পনা হয় । জ্ঞানদাসের মতন একজন উচ্চদরের কবির বক্তব্যকে কবিকল্পনার দ্বারা বুঝতে হবে—এটা আশা করা যায় না ।

এই পদটির চেয়ে দ্বিতীয় পদের অসংগতি আরও বেশী । বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে—

আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
পদনখে থাকি থাকি কি জানি কি লিখি ॥
কি ভাবে ভাবিত সদা নাহি বুঝি গোরা ।
পুরুব পীরিতিরসে বুঝি হৈল ভোরা ॥
দীন নয়নে অবনত মাথে রহে ।
থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাঁড়াইলা বাম পাশে ।
জাম বাসে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে ॥ (গৌ প ত পৃ ১৮৮)

এখানে প্রথম চার ছত্রের বর্ণনা স্পষ্টতই রাধাভাবের। এক্ষেত্রে গদাধরের বাম পাশে দাঁড়ানোর কোন অর্থ হয় না।

এই পদদুটির রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। প্রথমত নিত্যানন্দ ও তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যভাবের প্রাধান্য আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। সেক্ষেত্রে মনে হয় নিত্যানন্দ গোষ্ঠীভুক্ত জ্ঞানদাস এই পদদ্বয়ের রচয়িতা হতে পারেন না। তাছাড়া ভাবের ও বর্ণনার যে অসংগতি দেখা যাচ্ছে তা জ্ঞানদাসের মতন একজন কবির রচনায় আশা করা যায় না। মনে হয় এই পদ দুটি অন্য কোনও পদকারের রচনা। ভুলক্রমে জ্ঞানদাসের ভণিতায় প্রচলিত হয়ে গিয়েছে অথবা পরবর্তীযুগের কোনও পদকার ইচ্ছাকৃত ভাবে জ্ঞানদাসের ভণিতায় এই পদদুটি প্রচার করেছেন। জ্ঞানদাস নামে যখন অপর কোনও পদকারের পরিচয় এযাবৎ পাওয়া যায় নি তখন এই দুই সন্দেহই থেকে যায়।

পূর্বরাগ ও অনুরাগের উচ্ছ্বাসে বাসু ঘোষের ভণিতায় যে সব পদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে “না জানিয়' না শুনিয়া পিরীতি করিলুঁ গো” এবং ‘আজ প্রেমক নাহিক ওর” পদদুটির কৃষ্ণলীলার রাধার পূর্বরাগের ও অনুরাগের পদ, এছাড়া “বিরলে বসিয়া একেশ্বরে” পদটিতে পূর্বরাগ বা অনুরাগের কোনও লক্ষণ নেই। “দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে” পদটিতে পদকারের গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আকুলতার প্রকাশ মাত্র। “আরে মোর গোরা দ্বিজমণি” পদটিতে গোরার নবদ্বীপলীলার কৃষ্ণভাবের বর্ণনা।

নরহরি ভণিতায় যে পাঁচটি পদ আছে তার সকল পদই নিঃসন্দেহে চৈতন্যদেবের রাধাভাবের বর্ণনা। “দেখি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ॥” পদটিতে চৈতন্যদেব—

বিভোর হইয়া গোপীভাবে। কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি। উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ। হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥

(গৌ.প.ত.পৃ. ১৯২)

কিংবা অপর পদে—

রামানন্দ স্বরূপের সনে। বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি। খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে। বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল। বধির সমান মোরে কৈল॥ (ঐ)

চৈতন্যদেবের রাধাভাবের সুস্পষ্ট বর্ণনা। সরকার ঠাকুরের চিন্তা ধারার

সঙ্গে এই বক্তব্যের কোনও মিল নেই। মনে হয় এগুলি নরহরি চক্রবর্তী কিংবা অন্য কোনও পদকারের রচনা।

তবে এসব পদের বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী যুগের পদকারদের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এই প্রসঙ্গে রাধামোহনের পদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর রচিত "কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর" (গৌ.প.ত. পৃ. ১৮৯) "কানু কানু করি কাতরে কাঁদই" (ঐ) প্রভৃতি পদে চৈতন্যদেবের রাধাভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

পরবর্তীযুগের রচনায় এই বৈশিষ্ট্য অভিসার প্রভৃতি পদেও দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আচার্য শিষ্য মোহনের রচিত পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে। "বিরলে বসিয়া গোরা রায়" পদে দেখা যায় তিনি "সহচরগণে কহয়ে বচনে রহিতে নারিএ ঘরে। নন্দের নন্দন পাই দরকার তবে সে পরাণ ধরে"॥ এরপর দেখা যাচ্ছে তিনি সাজসজ্জা করে তনু "বসনে ঝাঁপয়ে" অভিসারে চলেছেন (গৌ.প.ত.পৃ. ১৯৩)।

অভিসারের বর্ণনা রাধামোহনের একাধিক পদে পাওয়া যায়। "লাখবান হেমচম্পক জিনি গোরাতনু" পদে রাধার অভিসারের বর্ণনানুরূপ চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে (গৌ.প.ত. —পৃ. ১৯৩)। এছাড়া "কান পাতি গোরহরি" (গৌ.প ত. ১৯৩) "ব্রজ অভিসারিণী ভাবে ভাবিত" (গৌ.প ত —পৃ. ১৯৪), "গোরাচাঁদ রাধার ভাবেতে ভোরা" (ঐ) প্রভৃতি পদেও এইভাব সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে বিরহ ভাবের পদেও এই প্রভাব লক্ষণীয়।

পূর্ববর্তী পদকারদের ভণিতায় কিছু পদ গৌরপদতরঙ্গিণীর এই উচ্ছ্বাসে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এঁদের রচনা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো পরবর্তীযুগের পদকারের রচনা বলে ধরে নেওয়া হলে এবং পরবর্তীযুগের পদকারদের রচনা বিশ্লেষণ করলে এযুগের পদে চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাভাবের প্রভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুটি কারণে এই যুগের পদকারদের ওপর এই প্রভাব আসতে পারে।

প্রথমতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার প্রভাব। অন্ত্যলীলায় তিনি মহাপ্রভুর রাধাভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের তরজার পর তাঁর এই দশার বৃদ্ধি প্রাপ্তি বর্ণনা করে বলছেন—

সেই দিন হৈতে আর দশা হৈল । কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ।।
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে । রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ।।
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন । উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ।। (৩।১৯)

চৈতন্যদেবের এই ভাবের প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায় বাসু ঘোষ, রামানন্দ বসু, শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ পূর্ববর্তীযুগের পদকারদের রচনায়। বাসু ঘোষের—

বরণ কাঞ্চন দশবাণ । অরুণ বসন পরিধান ।।
অবনত মাথে গোরা রহে । অরুণ নয়ানে ধারবহে ।।
ক্ষণে শির করতলে রাখি । ক্ষণে ক্ষিতিতল নখে শিখি ।।
কান্দিয়া আকুল গোরা রায় । সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায় ।।
বাসুদেব ঘোষ গুণ গায় । নিশি দিশি আন নাহি ভায় ।।
(গৌ প.ত.পৃ ১৯৯)

পদটিতে স্পষ্টভাবে রাধাভাবের উল্লেখ না থাকলেও চৈতন্যদেবের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর বিরহ দশার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় শঙ্করের নিম্নোক্ত পদটিতে—

যে যে মোর গৌরকিশোর । মূরছি মূরছি পড়ে ভকতের কোর ।।
সোনার বরণ তনু হইল মলিন । দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ।।
বচন না নিকসয়ে চাঁদবদনে । অবিরত ধারা বহে থির নয়নে ।।
কাঁদে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া । পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মিলিঞা ।।
— (গৌ.প.ত.—পৃ. ২০৪)

এই বিবরণেও চৈতন্যদেবের বিরহদশার যে চিত্র পাওয়া যায় তা' বাসুদেব ঘোষের বিবরণের অনুরূপ। এর একটু বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে রামানন্দের একটি পদে—

আরে মোর গৌরকিশোর ।
সহচর কন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর ।
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
ভস্তক দোসর ভেল দেহ ।

স্থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া ।। (গৌ.প.ত.—পৃ. ২০৪)

এখানে নবমীদশা, মথুরার উল্লেখ এবং 'হা নাথ' বলে ক্রন্দনে রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গোবিন্দদাসের চৈতন্যদেবের বিরহের পদগুলিও এই ভাবের অনুসরণে রচিত। তবে তাতে রাধাভাব যেন আরও প্রকট। "কাহে পুন গৌরকিশোর" (গৌ.প.ত —পৃ ২০২) পদটিতে মহাপ্রভুর যে চিত্র পাওয়া যায় সেটি বিরহিণী রাধারই চিত্র। এই পদে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেব—

অবনত মাথে লিখিত মহীমণ্ডল নয়নে গলায় ঘন লোর ।।
কনক বরণ তনু ঝামর ভেল জনু জাগয়ে নিদ নহি ভায়।
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন ছলছল লোচনে চায় ।।
খেনে খেনে বদন পাণিতলে ধারই ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।

এখানে চৈতন্যদেবের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা যে কল্পিত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্বোক্ত পদকারদের পদের সঙ্গে তুলনা করলে। বাসু ঘোষের একটি পদে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেব যখন বিরহযাতনায় অস্থির ছিলেন তখন তাঁর প্রিয় সহচরদের দেখলেও 'উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ।' ভক্তগণ তাঁর মনোভাব বুঝতে পারছেন না, সেজন্য হায় হায় করছেন। এটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি অন্যমনস্ক ভাবে মাটিতে আঁচড় কাটছেন আবার বিরহ যন্ত্রণায় আকুল হয়ে কাঁদছেন—এই দুই ঘটনা একসঙ্গে হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। মনে হয় গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের রাধাভাবের বর্ণনা দিতে গিয়েই তাঁর বর্ণনায় এই আধিক্য এনে ফেলেছেন। এই বর্ণনা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে পরবর্তী পদকারদের রচনায়। রাধামোহনের "সহজে গৌর প্রেমে গর গর" (গৌ প.ত.—পৃ. ১৯৮) পদের শেষে তিনি বলছেন "কৃষ্ণভানুসুতা রসে পহুঁ ভোর"। নরহরির "আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়" (ঐ) পদেও চৈতন্যদেবের এই ভাবকে "রাধাভাবে হৈল হেন" বলে উল্লেখ করছেন। প্রসাদের "কি লাগি আমার গৌররায়" (গৌ প.ত.– পৃ. ১৯৭-৮) পদেও চৈতন্যদেবের এই ভাবকে "রাধার ভাবে বিভাবিত মন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবই কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার প্রভাব বলে ধরে নেওয়া বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় বর্ণিত চৈতন্যদেবের এই দশার বর্ণনাকে রাধাভাবের বর্ণনার সঙ্গে এক করে নেওয়ার আরও একটি কারণ আছে। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে আচার্য পরবর্তীযুগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পদের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার জন্য এই লীলায় বিচিত্র ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৌরাঙ্গলীলার পদ রচিত হচ্ছিল। ফলে রাধার বিরহলীলা মূলক পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরবর্তীযুগে চৈতন্যদেবের এই ভাবকে রাধাভাবের সঙ্গে এক করে নেওয়া হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই বিরহ যন্ত্রণা ঐতিহাসিক সত্য হলেও পরবর্তীযুগে তাকে পদকারদের বর্ণনার সুবিধের জন্য রাধার বিরহের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া হয়েছিল। এটা শুধু বিরহমূলক পদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়—অন্যান্য বিষয়ক পদ—যেমন অভিসার, মান ইত্যাদি বিষয়ক পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এছাড়া চৈতন্যদেবের লীলার আরও একটি দিক নিয়ে পববর্তীযুগে বহু পদ রচিত হয়েছে। সেটি হলো নাগরীভাবের পদ। নরহরি শিষ্য লোচনদাসেব এবিষয়ে পদের সংখ্যা সর্বাধিক। নরহরি ভণিতায়ও এবিষয়ে প্রচুর পদ পাওয়া যায়। এর সবগুলিই সরকার ঠাকুরের রচনা না হওয়া সম্ভব। তবে এই গোষ্ঠীর প্রচারের প্রয়োজনে এই পদসমূহ পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। “জীব না জীব না সই” এবং “জ্বালার উপর জ্বালা সই” এই দুটি আক্ষেপানুরাগের পদ ছাড়া লোচনদাসের কৃষ্ণলীলার অপর কোনও পদ আজও পাওয়া যায় নি। লক্ষ্য করার বিষয় এই পদ দুটিতেও নাগরীভাবের প্রাধান্য বর্তমান।

পদাবলী সাহিত্যের বিশ্লেষণে দেখা গেল আচার্য ও পূর্ববর্তী যুগের দুটি ধারার সুস্পষ্ট চিহ্ন এই সাহিত্যে বর্তমান। পূর্ববর্তীযুগের পদকার চৈতন্যদেবের পরিকরদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। চৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব ভাবাবেশেব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে তাঁদের হৃদয়ের আকুলতা তাঁরা ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। এই পদসমূহ তাঁদের আবেগের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে ভাষা ও বক্তব্যে সহজ সরলতার ভাব সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় তাঁরা চৈতন্যদেবের যে যে লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন পদে শুধুমাত্র সেই লীলা অবলম্বনেই তাঁদের পদ রচনা করেছেন।

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে তাঁদের রচিত পদ সংখ্যা পরবর্তীযুগের তুলনায় খুবই কম। এখানেও দেখা যায় তাঁরা চণ্ডীদাসের অনুসরণে পদরচনায় বিশেষ

দক্ষতা দেখিয়েছেন। সেসঙ্গে চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণলীলায় কয়েকটি দিক তাঁদের রচনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্তের পূর্বরাগের পদ, বংশীর বাৎসল্য রসের পদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের পর বংশী শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শচীমাতার আকুলতার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। হয়তো একারণেই তাঁর পক্ষে বাৎসল্যের পদরচনা করা সম্ভব হয়েছিল।

চৈতন্যসমসাময়িক যুগের পদরচনার এই ধারা শ্রীনিবাসাচার্যের যুগেও অব্যাহত ছিল কয়েকজন পদকারের মধ্যে। এঁদের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আচার্য যুগে বর্তমান থাকলেও বয়সে পরিণত হওয়ার জন্য হয়তো তাঁর ওপর আচার্যের যুগের কোনও প্রভাব পড়ে নি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের ধারাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। তাঁর রচিত দুএকটি পদে পরবর্তী যুগের যে প্রভাব আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি, সেগুলো তাঁর রচনা হলেও স্বীকার করতে হবে শেষ বয়সে বৃন্দাবন গোস্বামীদের রচনার সামান্য প্রভাব তাঁর ওপর হয়তো পড়েছিল। তবে এযাবৎ যে দুএকটি পদে এই প্রভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি তাঁর রচনার পরিধির তুলনায় এত সামান্য যে এর দ্বারা তাঁর ওপর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনার প্রভাব সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

আচার্য পূর্ববর্তী যুগের এই স্বতঃস্ফূর্ত রচনা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর রচনা দেখা যায়। চৈতন্যদেবকে অবলম্বনে গৌরপারম্যবাদ সে যুগে এদেশে প্রসারলাভ করেছিল। নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁর গোষ্ঠী এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সরকার ঠাকুরের ভণিতায় নাগরীভাবের অনেক পদ পাওয়া যায়। এই পদগুলির সবই তাঁর রচনা কিনা সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে এই রচনার ধারা শ্রীনিবাসাচার্যের যুগেও অব্যাহত ছিল নরহরি শিষ্য লোচনদাসের রচনায়। জ্ঞানদাসের মতন তিনিও আচার্যের সময়ে পরিণত বয়স্ক হওয়ায় হয়তো বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি বলে অনুমান করা যায়।

পদাবলী সাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হয় শ্রীনিবাসাচার্যের যুগে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তাঁর প্রায় অর্ধশত শিষ্যই পদকার ছিলেন। এছাড়া ও সেযুগের নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গ, গদাধর দাসের শিষ্য

যদুনন্দন প্রমুখ একাধিক পদকার আচার্য প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পদাবলী সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়েছিলেন যে কোনও সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। বৃন্দাবনলীলার বিভিন্ন দিক অবলম্বনে পদাবলী সাহিত্যের যে নূতন নূতন ধারার সৃষ্টি আলোচ্য যুগে হয়েছিল তার মূলে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনা থাকলেও এগুলো এদেশে প্রচার এবং এই ভাবধারা অবলম্বনে পদরচনার উৎসাহ দানে শ্রীনিবাসাচার্যের যে ব্যক্তিগত অবদান আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গোবিন্দদাসের মতন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পদকার থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য পদকার সমেত এতবড় কবি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা দেখে বোঝা যায় তিনি সে যুগের শিক্ষিত সমাজের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

পদাবলী সাহিত্যের বিকশিত এই নূতন ধারা পরবর্তী শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। আচার্যের শিষ্য প্রশিষ্য এমনকি তাঁর বংশের অধস্তন কয়েক পুরুষ তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অসংখ্য সার্থক পদ রচনা করেছেন।

উপসংহার

আচার্যের জীবনীর জন্য প্রধানতঃ কর্ণপূর কবিরাজ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তীর রচনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কারণ প্রথমটি সমসাময়িককালে আচার্যশিষ্য কর্তৃক রচিত এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি যে অনেক প্রামাণ্য সূত্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে রচিত গ্রন্থের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রমাণ আছে। তৎসত্ত্বেও আচার্যের জীবনী এবং তাঁর সমসাময়িককালের অনেক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি এবং কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, তার কারণ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত বিবরণের সমর্থনে আরও প্রামাণিক তথ্যের অভাব। কর্ণপূর কবিরাজ কয়েকটি কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আচার্যের প্রথমবার নীলাচল গমন এবং প্রথমবার বৃন্দাবন গমনের কথা বলা যায়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবকাল আমাদের জানা আছে বলে আচার্যের প্রথমবার নীলাচল গমনের সময় এবং তা থেকে তাঁর সম্ভাব্য বয়স সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আচার্যের প্রথমবার বৃন্দাবন গমন সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য কবিরাজ সরবরাহ করেছেন তার বিচার বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য তারিখ নির্ণয় করলেও একাজ সহজসাধ্য হতো যদি গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের তিরোধানকাল সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেত।

বাংলার ইতিহাসের দিক থেকে ষোড়শ শতাব্দী অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এসময়ে শ্রীনিবাসাচার্য ছাড়া আরও অনেক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশ জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এঁদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা গেলে শুধু তাঁদেরই নির্ভরযোগ্য জীবনী রচনা করা সম্ভব হতো তা নয়। শ্রীনিবাসাচার্য এবং অন্যান্যদের জীবনের ঘটনাবলীরও নির্ভরযোগ্য কাল নির্ণয় করা হয়তো সম্ভব হতো। এই প্রসঙ্গে জাহ্নবীদেবীর কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে যেটুকু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি খেতরীর উৎসবের পর প্রথমবার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তাঁর কোনও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে যদি এই সম্বন্ধে তথ্যাদি ও কাল নির্ণয় করা সম্ভব

হতো, তবে খেতরীর তারিখ সম্বন্ধে অনুমানের প্রয়োজন হতো না। গোবিন্দদাসের দীক্ষাকাল সম্বন্ধে আমাদের অনুমান এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ মিলে গিয়েছে। মনে হয় তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই সূত্রগুলো প্রকাশিত হলে গোবিন্দদাস ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে হয়তো নির্ভরযোগ্য আরও তথ্য পাওয়া সম্ভব হতো এবং সেই সঙ্গে আচার্যের জীবনের ও খেতরীর মহোৎসবের কাল নির্ণয়ের কাজ সহজ সাধ্য হতো। শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনের কয়েকটি কাল সম্বন্ধে পুলিন বিহারী দাস যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে তাঁর প্রাপ্ত পুথিটিও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি প্রকাশিত হলে আচার্যের জীবনী সম্বন্ধে হয়তো আরও আলোকপাত করা সম্ভব হতো।

তবে এসম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। বর্তমান শতাব্দীতে শ্রীনিবাসাচার্য সম্বন্ধে যখন নূতন করে আলোচনা আরম্ভ হলো তখন তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল বর্তমানে আরও কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যের সাহায্যে আচার্যের জীবনী এবং তাঁর সমসাময়িককাল সম্বন্ধে কিছু বেশি আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় প্রকাশিত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ করার বাজ এবং তাঁর সমসাময়িক অপ্রকাশিত গ্রন্থাদির উদ্ধার করার কাজ অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে শ্রীনিবাসাচার্য ও তাঁর সমসাময়িককাল সম্বন্ধে আরম্ভ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে।

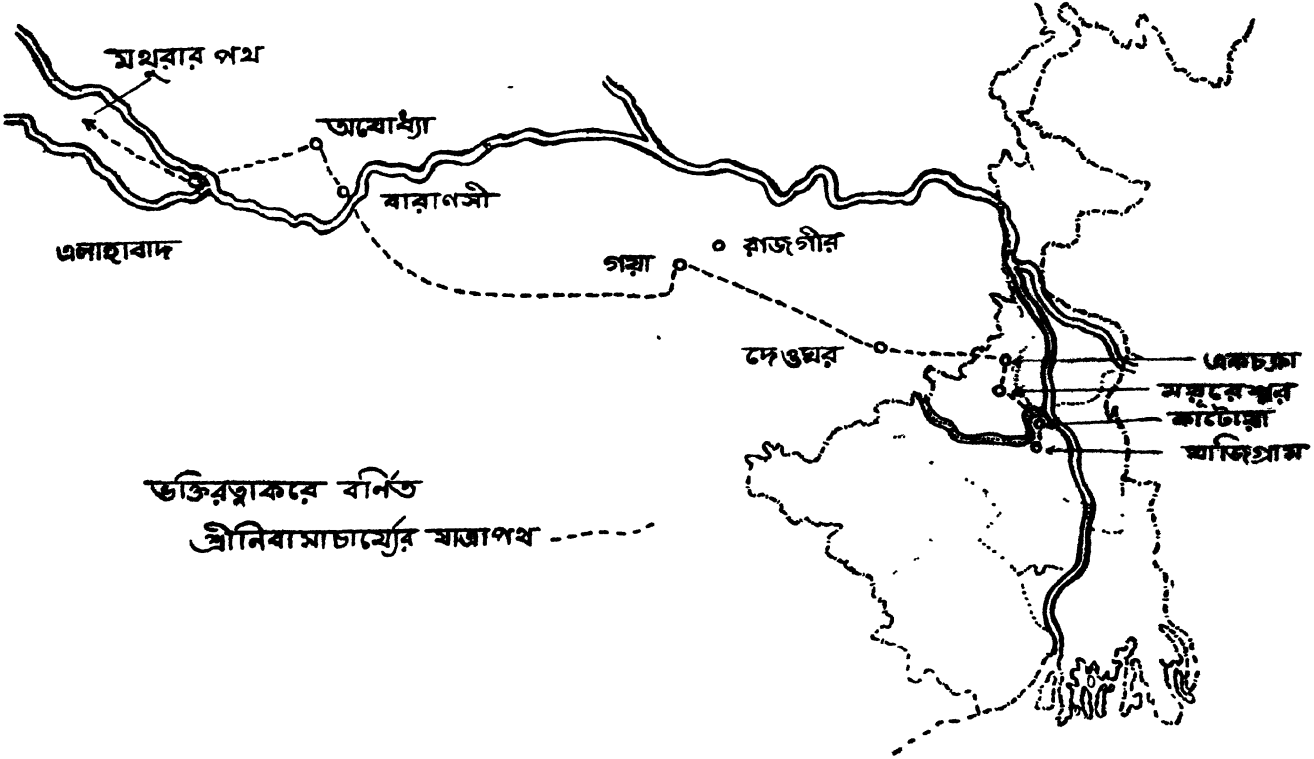
মথুরার পথ
অযোধ্যা
বারাণসী
এলাহাবাদ
রাজগীর
গয়া
দেওঘর
একচক্রা
ময়ূরেশ্বর
কাটোয়া
যাজিগ্রাম
ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত
শ্রীনিবাসাচার্য্যের যাত্রাপথ

গ্রন্থপঞ্জী

পুথি

অনুরাগবল্লী	পুথি সং ৬১০০ বিশ্বভারতী
আচার্যপ্রভুর পরিবার তালিকা	৫২৮৪ ঐ
পদমেরু	৯৫০ ঐ
প্রেমবিলাস	৩২৪৫ ঐ
শ্রীনিবাসের জন্মকথা	৩১৮২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীনিবাসশাখাগণনিরূপণং	জি ৫৬৩৮ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলা গ্রন্থ

আর্যশাস্ত্র (পত্রিকা)	শ্রীমদ্ভাগবত
কর্ণপূর কবিরাজ	শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক (শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগ্রন্থমালা দ্রঃ)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত)
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর	শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব
জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিণী
জয়ানন্দ	চৈতন্যমঙ্গল (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান
নরহরি চক্রবর্তী	ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন সং)
ঐ	নরোত্তমবিলাস (রাখালদাস কবিরত্ন সম্পাদিত)
ঐ	(রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত)
ননীগোপাল গোস্বামী	চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

নগেন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বকোষ অভিধান
নরেশচন্দ্র জানা	বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী
নিত্যানন্দ দাস	প্রেমবিলাস (যশোদালাল তালুকদার সম্পাদিত)
নীলরতন সেন	বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয়
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙালীর ইতিহাস
পঞ্চানন মণ্ডল	পুঁথি-পরিচয়
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	নবজ্ঞানভারতী
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	ভারতকোষ
	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা
বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে	হিন্দুস্থানীর সঙ্গীত পদ্ধতি
বিমানবিহারী মজুমদার	জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী
ঐ	চৈতন্যচরিতের উপাদান (২য় সং)
ঐ	গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ
ঐ	পাঁচশত বৎসরের পদাবলী
ঐ	ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য
বৃন্দাবন দাস	শ্রীচৈতন্যভাগবত (সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত)
বৈষ্ণবদাস	পদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত)
মনোহর দাস	অনুরাগবল্লী (মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ২য় এবং ৩য় সংস্করণ)
যদুনন্দন দাস	কর্ণানন্দ (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত)
রবীন্দ্রনাথ মাইতি	চৈতন্য-পরিকর

রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলা দেশের ইতিহাস—২য় খণ্ড
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙ্গালার ইতিহাস
রাধাগোবিন্দ নাথ	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা
রামগোপাল দাস	রসকল্পবল্লী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও প্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত)
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ
শুকদেব সিংহ	শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য
শৈলেন্দ্র ঘোষ	গৌড় কাহিনী
সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
ঐ	বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ
সুখময় মুখোপাধ্যায়	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম
ঐ	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া
ঐ	কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গীয় শব্দকোষ
হরিদাস দাস	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন
ঐ	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ
ঐ	শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা

ইংরাজী গ্রন্থ

Bell, R C. S.	Orissa District Gazetteer
De, S. K.	Early History of Vaisnava Faith & Movement in Bengal
Dey, N. L.	Geographical Dictionary of Ancient & Medieval Bengal

Hunter, W W.	Annals of Rural Bengal
Govt. of India	Imperial Gazetteer of India
Majumdar R. C.	History of Bengal
Majumdar R. C. & A. D. Pusalker	History & Culture of Indian People
Sen, D. C.	The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal
Sen, S.	History of Brajabuli Literatur
Tarkatirtha, R M	Our Heritage

[illegible]

[illegible]